বিদ্রোহী ভারত

(দ্বিতীয় পর্ব)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৫৬

তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৫৭

চতুর্থ মুদ্রণ : ১৩৫৮

পঞ্চম মুদ্রণ : ১৩৬০

পরিবেশক :

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি :

প্রকাশ করেছেন :

লেখকের পক্ষে সবুজ সাহিত্য আয়তন

ছেপেছেন :

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসের পক্ষে

৩১১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা—৭

বেঁধেছেন : ঝর্ণা ট্রেডিং কোং পক্ষে

শ্রীহরিভূষণ পাকড়াশী

১৮বি, হরিতকী বাগান লেন, কলিঃ—৬

মূল্য : তিন টাকা আট আনা

কিছুকাল পূর্বেই বিদ্রোহী ভারত (২য় পর্ব) নিঃশেষিত হয়েছিল কিন্তু নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠেনি। বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানি কিছুটা সংশোধিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত করতে বাধ্য হয়েছি এবং বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারের জন্য এই সংস্করণে বইটির মূল্যও কিছু কমিয়ে দেওয়া হলো। এই পর্বে : সিপাহী আন্দোলনের শেষাংশ, ওয়াহাবি আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, এবং সেই উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ ও নরম এবং গরমদলের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে ভারতে অগ্নি-যুগ। অগ্নি-যুগের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধ, গদর বিপ্লব, দিল্লী-বেনারস-লাহোর ষড়যন্ত্র, বিপ্লবী রাসবিহারী, বালেশ্বর সমরে বাঘা যতীনের আত্মদান, পাঞ্জাবে অশান্তি. রেশমী ষড়যন্ত্র, জালিনওয়ালাবাগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ভারতে রক্ত-বিপ্লব-আন্দোলন ও তার পরিণতির বর্ণনাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

'বিদ্রোহী ভারতের' (১ম ও ২য় পর্ব) অতি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় পর পর তিনটি সংস্করণই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে কতখানি প্রীতির চক্ষে জনসাধারণ 'বিদ্রোহী ভারত'কে গ্রহণ করেছেন।

তিনটি পর্বে বিদ্রোহী ভারত সমাপ্ত।

'বিদ্রোহী ভারত' ঠিক অপরিণত বয়স্কদের জন্য লেখা নয়, তবু আমার লেখা বই যে সব ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয় তারাও হয়ত এই বই পড়ে আনন্দ পাবে। দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর ব্যাপী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার বা অবিচারের প্রতিবাদে ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে যে বিপ্লবের বহ্নি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সেই বিপ্লব জনমতকে কোন্ পথে নিয়ে গেছে, সে কথা আজ আমাদের প্রত্যেকেরই জানবার সময় হয়েছে।

তা'ছাড়া সত্যিকারের ইতিহাস যা এতকাল আমরা, আইন ও বিদেশী শাসকের হুমকির চাপে প্রকাশ করতে সাহস পাইনি প্রকাশ্যে, কেবল অন্তরেই গুমরে মরেছি বেদনার গ্লানিতে, তাকেও আজ সত্যিকারের রূপ দেওয়ার সময় যে, এসেছে একথা নিশ্চয়ই আজ প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন।

প্রথম পর্বে কাল্পনিক উপাখ্যানের জের টেনে এনে তার মধ্য দিয়েই ২য় ও ৩য় পর্বের ঐতিহাসিক আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি, এই জন্যই যে, দীর্ঘ একটানা ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে যাতে করে পাঠকপাঠিকারা সামান্য চিন্তা ও বিশ্রামের সময় পান। তাছাড়া সত্যকে যতই আমরা বাইরে হ'তে আবরণ দিয়ে ঢেকে দিই না কেন, তার আসল ও সত্যিকারের রূপটা আপনা আপনিই চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠে, এই আমার স্থির বিশ্বাস সেই দিক দিয়ে আশাকরি পুস্তকের মর্যদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবু যেন কেউ বিদ্রোহী ভারতকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে ভুল না করেন। কারণ আসলে বিদ্রোহী ভারত আমাদের পৌনে দুইশত বৎসরের লাঞ্ছনার রক্তাক্ত কাহিনী এবং সেটাই তার সত্যকারের পরিচয়।

সবুজ সাহিত্য আয়তন
৩।১, মোহন বাগান লেন,
ক লি কা তা : ৪

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

যে যুগ চলে গেল,

সে যুগের কাহিনীকে তুলে দিলাম

যে যুগ আগত ঐ—

সেই যুগের হাতে।

যে রাত্রি পোহায়ে গেল,

সেই ফেলে আসা রাত্রির স্মৃতি

এনে দিলাম তুলে,

আজিকার এ নব প্রভাতে॥

চৌদ্দই আগষ্টের আর খুব বেশী দেরী নেই

প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের দাসত্বের লৌহ-শৃংখল মোচন হবে ১৪ই আগষ্ট। নয়া দিল্লিতে রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, মুমূর্ষু ভারতের মৃত জাতি স্বপ্ন দেখছে। অত্যাসন্ন সেই মহোৎসবের আনন্দে দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে যেন জেগেছে রোমাঞ্চ। কবরের মাটিতে জীবনের অংকুরোদ্গম !… ঘোষিত হয়েছে : প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্বের ভার নেবেন পণ্ডিতজী। হিন্দুস্থানের পণ্ডিতজী! এখনো কিন্তু লীগ গভর্ণমেণ্ট বাংলা দেশের বুকে লৌহমুষ্টিতে শাসনের রজ্জুটা টেনে রেখেছে। শেষ ছোবলের অদ্ভুত জিঘাংসা। দানবীয় বৃত্তির শেষ স্বাক্ষর।…

সত্যিই তা'হলে বাংলা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হবে। আর পৃথক ভাবে সরকারী দায়িত্ব হাতে আসবে চৌদ্দই আগষ্টের পর।

সৃষ্টিধর (মাষ্টারদা) দ্বিপ্রহরের পর রৌদ্রে রাসবিহারী এ্যাভিন্যু দিয়ে হেঁটে চলেছেন। গায়ে খদ্দরের হাফ্ সাট, মাথায় গেরুয়া রংয়ের একটা গান্ধি ক্যাপ, পরিধানে খদ্দরের মোটা ধুতি। পায়ে পেশোয়ারী চপ্পল। চপ্পলের তলায় বোধহয় লোহার পেরেক বসান, পাথরে বাঁধানো কঠিন ফুটপাতের 'পরে শব্দ তোলে ঠং ঠং···!

এখনো অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সা'পুর ত আর এখানে নয়, সেই টালিগঞ্জের ব্রিজ ছাড়িয়ে আরো অনেকটা গেলে তারপর ডাইনে বেঁকে চলতে হবে। সেও কম পথ নয়। দিদি রোগশয্যায়।

সকাল বেলা অভিজিৎ মেসে এসে সংবাদ দিয়ে গিয়েছে। অভি, অভিজিৎ। অভিজিৎ মাষ্টারদার ঠিকানাটা জানত না। বীরেশ্বরের কাছেই নাকি মাষ্টারদার ঠিকানা জানতে পেরেছে।

অভিজিৎ বলে গিয়েছে: ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন, আর বেশী দিন নেই।

তবু রক্ষে নীলাঞ্জনের ফাঁসীর সংবাদ দিদি এখনো জানেন না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তাই এখনো দিদি নাকি আক্ষেপ করেন, মধ্যে মধ্যে, 'নীলেটার সংগে বোধ হয় আর দেখা হল না।'

অভিজিৎকে প্রায়ই প্রশ্ন করেন: হাঁরে, দেশ স্বাধীন হতে চলল শুনছি। সবাইকে ছেড়ে দিলে, তা নীলুকে কি এখনো তারা ছাড়বে না?···এ তবে কেমনতর দেশ স্বাধীন হবে রে? আমার নামে একটা দরখাস্ত লিখে দে পণ্ডিতজীর কাছে!···সে হয়ত জানেও না এখানে তার দিদি মৃত্যুশয্যায়, তারই পথ চেয়ে চেয়ে দিন গুনছে! যে অভিমানী ছেলে! জানিত তাকে।

অভি একটা দরখাস্ত লিখে আনে: এই নাও দিদি দরখাস্ত!

দে ভাই! কলমটা আন্, সই করে দিই! কোথায় সই করবো বলত? চোখেও ছাই আজকাল কি আর তেমন দেখতে পাই।

কম্পিত হাতখানি তুলে কোন মতে এঁকেবেঁকে দিদি সইটা করে দেন: আজই কিন্তু পাঠিয়ে দিস্ ভাই। ভুলে যাস্‌নে যেন আবার! তোদের আবার যা ভোলা মন। উড়ো জাহাজেরই টিকিট একটা এঁটে দিস্, তাড়াতাড়ি যাবে।

একদিন না যেতেই দিদির তাগাদা শুরু হয়: অভি! অভি! কোথায় গেলি ভাই!

অভিজিৎ ঘরে এসে প্রবেশ করে: আমায় ডাকছিলে দিদি?

হ্যাঁরে দরখাস্তটা পাঠিয়েছিলি ত ? ঃ দিদি অভির মুখের দিকে তাকান।

হ্যাঁগো। সে ত' কালই পাঠিয়ে দিলাম। অভির গলাটি কি কেঁপে উঠে!

তবে সে আসে না কেন ?

চিঠি পণ্ডিতজী পড়বেন, তবে ত!···সে তুমি ভেবো না দিদি, ঠিকানা ঠিকই আছে, সে আমি দেখে শুনে দিয়েছি।

কি জানি ভাই! আমার যে আর সময় নেইরে!···

অভি উদ্‌গত অশ্রু কোনমতে চাপতে চাপতে ঘর হ'তে পালিয়ে যায়।

কি জবাব দেবে!··· কি জবাব দেবে ও!···

অভির মাকে ডেকে দিদি বলেন ঃ বৌদি! নীলু আসছে! চালকুমড়োর বড়ি খেতে সে বড্ড ভালবাসতো!· করে রেখে দিও! আমি ত বিছানায় শুয়ে। কলকাতা শহরে চালকুমড়ো আর পাবে কোথায় বল। বাজার হতেই আনিয়ে নিও।

নিশ্চয়ই করে দেবো দিদি! আপনি ভাববেন না। অভির মা জবাব দেন।

একদিন দু'দিন করে সাতটা দিন কেটে গেল। দিদির ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না। ঘুরে ফিরে সবাইকে কেবল একই প্রশ্ন ঃ হাঁরে চিঠিটা কি তবে গেল না ? আর একটা না হয় দরখাস্ত লিখে দে। এবারে মহাত্মাজীকে একটা দে! আমার যে আর সময় নেই!

চোখে ত ঘুম নেই।

শয্যার 'পরে শুয়ে শুয়ে কেবলই যেন ঘরছাড়া সেই দুরন্ত নীলাঞ্জনেরই পায়ের শব্দ শোনেন।

ঐ বুঝি সে এল!·

একটু শব্দ হলেই ঃ দেখতে নীলু এল কি না ? বৌদি, রাত্রে একটু সজাগ থেকো ভাই! যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি!·· আর যদি ঘুমিয়েই পড়ি তা'হলে সে এলেই কিন্তু আমায় জাগিয়ে দিও! কত দিন দেখি না নীলুকে ? মায়ের পেটের ভাইত নয় শত্রু! শত্রু! এমন শত্রু যেন কারও ঘরে না থাকে! ছোটবেলায় মা মারা গেলেন। বাবা আবার বিয়ে করলেন। ঐ নীলু, দেড় বছর বয়স হবে তার। আমাকেই ত ও মা ব'লে জানে!

দিদি আপন মনেই বকে যান! অতীত স্মৃতির রোমন্থন! ঝাপ্‌সা ছানিপড়া চোখে অশ্রু ঘনিয়ে আসে। বাইরে সত্যিই পায়ের শব্দ পাওয়া গেল ঃ অভি! অভি আছিস ?

কে? কার্ গলা?···

সৃষ্টিধর এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

অভিজিৎ বাইরের ঘরেই ছিল: কে?

আমি সৃষ্টিধর। দিদি কোন্ ঘরে ভাই!

মাষ্টারদা! অভি ইতিপূর্বে প্রথম সেদিন মেসে সংবাদ দিতে গিয়ে মাষ্টার-দা'কে দেখলে। মাষ্টারদা! যার কথা কত শুনেছে ও! কত গল্প! কত কাহিনী! বিপ্লব যুগের সেই অসীম সাহসী মাষ্টারদা···যার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ, যাকে ধরবার জন্য এত বড় ব্রিটিশ শক্তিও হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে। সেই মাষ্টারদা! অভি এগিয়ে এসে মাষ্টারদার পায়ের কাছে মাথা নোয়াতে যেতেই মাষ্টারদা অভির দু'টো হাত ধরে ফেললেন: থাক্ ভাই, থাক্, রোজ রোজ প্রণাম কেন? নীলাঞ্জনের ভাইপো তুমি!···দিদি কেমন আছেন!···

অভি মাথা নাড়ে।

চল দিদির ঘরে যাই!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে মাষ্টারদা ডাকেন: দিদি কোথায় গো? দিদি!

কে?

আমি সৃষ্টিধর, দিদি।

কে? সৃষ্টিধর!···

মাষ্টারদা এগিয়ে এসে দিদির পাশেই বসেন।

নীলুকে সংগে আনলে না কেন সৃষ্টি! সে ত তোমাকে ছাড়া কখনো থাকতো না! দু'জনে একসংগে সেই চলে গেলে!···নীলু আমার কেমন আছে সৃষ্টিধর?

একটু দ্বিধা নেই মাষ্টারদার, বলে: নীলু! সেত ভালই আছে দিদি! তার জন্য কোন চিন্তা করো না!

কিন্তু সবাই যখন ছাড়া পেলে, সে তবে আসছে না কেন মাষ্টার?···দেশের কাজে নামলে কি স্নেহ মমতা সব একেবারেই বিসর্জন দিতে হয় তোমাদের?··· বুড়ী দিদির কথা কি একবারটিও মনেও পড়ে না তার?

গভীর স্নেহে মাষ্টারদা দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শীর্ণ দেহাবয়ব যেন শয্যার সংগে একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। রগের দু'পাশের চুল অধিকাংশই পেকে শাদা হয়ে গেছে।

মুখের পরে সুস্পষ্ট বলিরেখায়, বয়সের ছাপ!

এককালে দিদির গায়ের বর্ণ কাঁচা হলুদের মত ছিল। এখন মনে হয় যেন রোদে পোড়া তামাটে। অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী যেন আগুনের তাপে ঝলসে গিয়েছেন। সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, কিছুই আজ তার আর অবশিষ্ট নেই!

নীলাঞ্জন মাষ্টারদার চাইতে প্রায় বছর আটেকের ছোটই হবে।

কিশোর-সংঘের একজন সাধারণ সভ্য হয়ে এলো একদিন নীলাঞ্জন। তারও ঠিক তার দিদির মতই এমনি স্বর্ণকান্তি ছিল। কি নাসা, কি চক্ষু, কি যুগ্মভ্রূ!··· প্রশস্ত ললাট। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণের জরুল চিহ্ন! সেই নীলাঞ্জনেরই দিদি হিরণ্ময়ী!···ভাইয়ের জন্য তিনি এজীবনে স্বামীর ঘরই করতে পারলেন না।

দুরন্ত ভাই! কারও শাসন মানবে না! অশান্ত চঞ্চল!··

সৎমায়ের কাছে ভাইকে রেখে হিরণ্ময়ী শ্বশুর-বাড়ীতে গেলেন।

একমাসও গেল না। ভাই নদী সাঁতরে পালিয়ে চলে এল দিদির কাছে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারটা হবে।

ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি! নিঃসাড় গ্রাম!··মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শুধু শোনা যায় এখানে ওখানে।

দিদি! দিদিগো!

ঘুমের মধ্যেই দিদি চমকে উঠেন: কে?

পাশেই স্বামী শেখরনাথ শুয়ে ছিলেন। প্রশ্ন করেন: কি হলো?

ঘুমের মধ্যে নীলুর গলা শুনলাম যেন।

পাগল!···এই রাত দুপুরে, কোথায় সে নদীর ওপাড়ে অন্য গাঁয়।

আবার শোনা যায় কণ্ঠস্বর: দিদিগো! দিদি!

ঐ! ঐ ত আমার নীলুর গলা। যাই!

তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে হিরণ্ময়ী দরজা খুলে অন্ধকারে আংগিনার 'পরে এসে দাঁড়ান: কে?

আকাশে মেঘ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন নিশুতি রাত্রি যেন থম্ থম্ করে।

দিদি, আমি নীলু!···নীলাঞ্জন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে দিদির গায়ে। দু'হাতে দিদিকে আঁকড়ে ধরে: দিদি!

হ্যাঁরে দস্যি! এত রাত্রে তুই কোথা হ'তে এলি বলত?

পালিয়ে এলাম দিদি! তোমার জন্য মন কেমন করছিল।

বেশ করেছিস্! চল্ ঘরে চল!—তোকে নিয়ে আমি কি করি বলত নীলু!...

দিদি হিরণ্ময়ীর ওখানেই থেকে গেল নীলু। কিন্তু শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠে দস্যিছেলের কাণ্ডকারখানায়।

সংঘাত বেধে উঠে স্নেহ ও আত্মীয়তার মর্য্যাদায়।

পরের ছ', এত গরজ তাদের কিসের? এত ঝামেলাই বা কেন পোহাবে ওরা? নীলাঞ্জনকে নিয়ে নালিশের অন্ত নেই।

শেখরনাথ বিরক্ত হয়ে উঠেন। তীব্র কণ্ঠে বলেন: হয় ভাই নিয়ে তুমি থাক এবাড়ীতে, আমি যাই; না হয় নীলুকে পাঠিয়ে দাও। নিত্য এ ঝামেলা আর সত্যি আমার সহ্য হয় না হিরণ!...

ও যদি ভাই না হয়ে তোমারই ছেলে হতো কি করতে? অবিচলিত ভাবে হিরণ্ময়ী প্রশ্ন করেন।

কেটে দু'টুকরো করে গংগার জলে ভাসিয়ে দিতাম! বলে রাগতভাবে শেখরনাথ ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

নির্বাক হিরণ্ময়ী স্বামীর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুকখানা তোলপাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হ'য়ে আসে।

নীলু কিন্তু কোন কথাই যেন বুঝবে না!

এত দুষ্ট হলে কি হবে, পড়াশুনায় কিন্তু ঠিক আছে। ক্লাশে তার মত অঙ্ক কষতে কেউ পারে না, কবিতা মুখস্থ পারবে না কেউ ওর মত বলতে, মুখে মুখে ইংরাজী ট্রানসেলেসনে ওকে হারায় কে! কিন্তু দুষ্টুর যেন শিরোমণি!

যত বদবুদ্ধি কি ওরই মাথায় ঘুরবে সর্বদা!

হিরণ্ময়ী কিছুই বলতে পারেন না। মা-হারা ভাইটির মুখের দিকে তাকালেই শাসনের সমস্ত সংযম যেন স্নেহের প্রাবল্যে খেই হারিয়ে ফেলে।

এদিকে নীলাঞ্জনকে কেন্দ্র করে বাড়ীর মধ্যে অসন্তোষের ঝড় যেন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠে দিনকে দিন!

শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী ভাইয়ের হাত ধরে একদিন শ্বশুর-বাড়ীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নৌকায় এসে উঠে বসেন। আর তিনি ফিরে যান নি শ্বশুরের ভিটেয়।

মাস দু'য়েক পরে হঠাৎ একদিন শেখরনাথ এলেন, বললেন: ফিরে চল হিরণ!...তোমাকে আমি নিতে এসেছি।

দিদি মাথা নাড়লেন : যে বাড়ীতে আমার ভাইয়ের স্থান নেই, সেখানে আমারও স্থান নেই।

তাহলে তুমি যাবে না!

যাব না ত বলি নি। বলেছি যেখানে নীলুর স্থান নেই সেখানে আমার স্থানের কি সংকুলান হবে?

এরপর কিন্তু আমায় দোষ আর দিতে পারবে না হিরণ!...

ভয় নেই! যে মুহূর্তে মেয়েমানুষ হয়েও শ্বশুর-বাড়ী ছেড়ে এসেছি, সমস্ত সংশয়ের একেবারে শেষ করেই এসেছি সেই মুহূর্তেই! ভাগ্য-বিড়ম্বনায় যাকে ধরে রাখতে পারলাম না, তার জন্য আর যেই হোক আমি হা-হুতাস করবো না! তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমার চাইতেও তোমার ভাই-ই তোমার বড় হলো তা'হলে হিরণ?

মায়ের পেটের ভাই আর স্বামী এক বস্তু নয়। কিন্তু সে তর্ক থাক্। তুমি হয়ত বুঝবে না! সত্যিই যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে আর পাঁচটা বছর অপেক্ষা করো, নীলু একটু বড় হলেই আবার আমি ফিরে যাবো!

থাক্! আর না ফিরলেও চলবে!

রাগত শেখরনাথ স্থান ত্যাগ করলেন।

একমাসও গেল না, হিরণ্ময়ী লোকমুখে শুনলেন, স্বামী শেখরনাথ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করবেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে হিরণ্ময়ী নীলাঞ্জনকে সজোরে বুকের 'পরে চেপে ধরলেন।

ভাই দিদির মুখের দিকে তাকায়। ভাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করেন : হ্যাঁরে নীলু, তোর দিদিকে তুই কোন দিন ছেড়ে যাবিনে ত, আজ থেকে তোর দিদির সকল দায়িত্ব কিন্তু তোকেই বহন করতে হবে।

খুব পারবো, সে তুমি দেখে নিও। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না!

সেই নীলাঞ্জনই তাকে ছেড়ে চলে গেল একদিন।

মাষ্টারদার ত কিছুই অজানা নেই। নিজের হাতে গড়া শিষ্য নীলাঞ্জন সেন।

আমায় সত্যি কথা বলত মাষ্টার, নীলু আমার বেঁচে আছে ত?...

ও-কথা কেন বলছো দিদি!

কি জানি মাষ্টার!···কথাগুলো আর শেষ হয় না। দিদির ছ' চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে।

কেঁদ না দিদি, কেঁদ না! নীলাঞ্জন তোমার মরে নি! সে মৃত্যুঞ্জয়?

* * *

সত্যিই ত'! কেন এ অশ্রুমোচন!

ক্ষণিকের হলেও সে ত' মিথ্যা নয়। তার ত শেষ নেই! সে যে অব্যয়, অক্ষয়, সে যে অনাদি, সে যে অনন্ত! স্মৃতির মণিকোঠায় আজও যে সে বেঁচে আছে। এবং থাকবেও বেঁচে চিরদিন।

তবে কেন এ অশ্রুমোচন!···কেন এ বিলাপ। কেন এ ক্ষণিক দুর্বলতা!

কিন্তু তবু! তবু মন মানে কই! তাই বুঝি দু'চোখের কোলে অশ্রু ভরে আসে! চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে!

* * *

যায় যাক্! লজ্জায় অপমানে সর্বাংগ কালি হয়ে যাক্! তবু বলব! পরদেশীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। একমাত্র সোনার ভারতবর্ষেই যে তাদের Divide and Rule নীতি সফল হয়েছে, সগৌরবে একথা ঘোষণা করবে চিরদিন। সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস!

ভাই হয়ে আমরা ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। পরদেশী প্রভুর বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াতে গিয়ে, ভাইয়ের বুকে আমরা ভাই ছুরি হেনেছি, ঘরভেদী বিভীষণ হয়ে আমাদেরই মৃত্যুবাণ তুলে দিতে ইতস্তত করিনি পরদেশীর হাতে। বিভীষণের কলঙ্কের মতই এ কলঙ্ক যে যাবার নয়!

বহু দূর দেশ হতে এসে যারা জোর জবরদস্তী ও ছলনা করে আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরই বুটের তলায় চিপে ধরে শান্তির বাণী আওড়াতে বাধ্য করলে, আর যাই করি না কেন আমাদের সে দৈন্যকে আজ যেন লজ্জার খাতিরে না এড়িয়ে যাই! স্বীকৃতি দিতেই হবে! এবং সেই লজ্জাস্কর স্বীকৃতির বেদনা-মাখা অশ্রুজলে ঝাপসা চোখে আবার ফিরে তাকাই ১৮৫৭র সেই পরাজয়ের কাহিনী তো। বিপ্লবের সেই অগ্নি·· যে যজ্ঞাগ্নি শুধু জ্বলতে দেখে এসেছিলাম।

* * *

সেই দিল্লী, বারাণসী, জৌনপুর, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসী···যেখানে দেখে এলাম বহু কালের দাসত্বের অবসানে উড়তে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা; সেখানেই আবার ফিরে যেতে হবে। বলতে হবে অকুতোভয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে,

কেমন করে একে একে আবার আমাদের সে সব জায়গা হতে ফিরে আসতে হলো, পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি ও লজ্জায় মাথা নীচু করে, দাসত্বের লৌহ শিকলকে নিজেদের পায়ে পায়েই আরো শক্ত কঠিন করে বেঁধে। ১৮৫৭র সেই মহাপ্রলয়ের দিনে ভারতের দিকে দিকে যখন চলেছে শিকল ভাংগার বহ্নি-উৎসব, ভারতের বহু স্বাধীন রাজ্যের রাজন্যবর্গ একান্ত নিরপেক্ষ হয়েই সেদিন দূরে দাঁড়িয়ে রইলো ইচ্ছাকরে নির্বিকার ভাবে। তাদের প্রাণে কি সত্যি সেদিন স্বাধীনতার আকাংক্ষা জাগে নি? মূর্খের দল! শুধু মূর্খ নয়, দেশ-দ্রোহীর দল। তারা যদি সেদিনকার সেই সংকটময় মুহূর্তে কাঠের পুতুলের মত দূরে দাঁড়িয়ে না থাকত, মুক্তিকামী বীর সৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়াতো তাদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে, তা'হলে হয়ত নিশ্চয়ই ১৮৫৭র রক্তদান ব্যর্থ হতো না। হতো না···হতো না সেদিনগুলো কলংকিত!

সাহায্য ত তারা সংগ্রামীদের কোন প্রকারেই করেনি, বরং পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে বিদেশী শক্তির সংগে হাতে হাত মিলিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেদিনকার ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করতে।

কিন্তু কে সে মুখোসধারীর দল? কারা?

আজ বিচারের দিনে তাদের যেন আমরা না ভুলে যাই! কাচ্, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বুন্দেলা, রাজপুতনা এবং তাদের স্বগোত্র আরো অনেকেই...মীরজাফর, ইয়ারলতিফ্ ও পাতিয়ালার বংশধরেরা।

মুষ্টিমেয় বীর শহীদের বুকের রক্তে যখন দেশের মাটি সিক্ত হয়ে গেল, কই জনসাধারণ ত এগিয়ে এলো না সে রক্তোৎসবে সেদিনের সেই মহামুহূর্তে!

তারপর যারা সেদিন দেশের ডাকে এগিয়ে এলো, তাদেরও মধ্যে নেই কোন একতা, নেই একনিষ্ঠতা, নেই অন্ধ দেশপ্রেম নেই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

দলের মধ্যে শৃংখলার অভাব।

দলপতিকে মেনে নেওয়ার মত সকলের চিত্তে নেই নিঃসংশয়তা বা উদারতা।

* * *

১১ই মের স্বাধীনতা ঘোষণার পর অবার দিল্লীতে ফিরে এসেছি।

আগেই বলেছি ৭ই আগষ্ট শ্বেতাংগ সেনানায়ক দিল্লীর সন্নিকটে উপনীত হয়।

তারও আগে সসৈন্যে উইলসন সেখানে এসে পৌছে গিয়েছে।

স্বাধীন দিল্লীকে আজ চারিপাশ হতে শ্বেতাংগের দল আমাদেরই বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে অবরোধ করেছে।

কিন্তু কই! অবরুদ্ধ দিল্লীত আজিও ধরা দেয় না। নতি স্বীকার করে না।

হতাশার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে শ্বেতাংগদের মনে।

নব আশার বাণী শোনায় শ্বেতাংগ অফিসার বেয়াড স্মিথ্: হতাশ হলে চলবে না। দিল্লীর অবরোধ আমরা তুলে নিতে পারি না, আজ যদি আমরা দিল্লীর অবরোধ তুলে দিই, পিছু হটে যাই, সমগ্র পাঞ্জাব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেই সংগে যাবে সমগ্র ভারত। যাবে সমস্ত আশা।

ভারতে আমাদের রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

ব্রিগেডিয়ার উইলসন জবাব দেয়: ঠিক বলেছো, দিল্লী পুনরধিকার না করা পর্যন্ত আমরা এক পাও পিছু হটে যাবো না।

শোন ভারতবাসী, শ্বেতাংগদের কথা শোন। এ দৃঢ়তার কেন অভাব হয়েছিল সেদিন তোমাদের? কেন তোমরাও সেদিন তাদের পাশে থেকে ঐ সংকল্পের বাণী শুনেও অধীনতা শৃংখল ছুড়ে ফেলে দেশকে চির স্বাধীন করতে এগিয়ে যাওনি। কেন তোমরাও সমান কণ্ঠে করতে পারনি প্রতিজ্ঞা!

দিল্লী অবরোধ তারা সেদিন করেছিল বটে, তবে তাদেরও দুর্দশার অন্ত ছিল না।

সংবাদ আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থাই নেই। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে সব ধ্বংস করেছে সংগ্রামীর দল।

প্রায় একমাস পরে সংবাদ আসে নিকলসনের নেতৃত্বে আরো একদল সৈন্য আসছে দিল্লীর দিকে সাহায্যার্থে।

এদিকে দিল্লীতে বিদ্রোহী দলে উপযুক্ত নেতার অভাব, সুষ্ঠুভাবে সৈন্য চালনা করবে এমন কেউ নেই।

স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর শাহেরও যুদ্ধ বা সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে নেই কোন সত্যিকারের অভিজ্ঞতা, কারণ মুঘোল শক্তি যখন ক্ষয়ের মুখে, হৃতসর্বস্ব, শ্রীভ্রষ্ট তখনই যে তাঁর জন্ম।

ইংরাজের ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্যের মধ্যেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো লাঞ্ছনা ও অবমাননা সয়ে কেটেছে।

ব্রিটিশ শক্তির নিকট পদানত পিতার সন্তান তিনি।

ময়ূর সিংহাসনের গৌরব গরিমা আজ তাঁর কাছে অতীতের স্বপ্নস্মৃতি মাত্র।

পঞ্চাশ হাজার বীর সাহসী যোদ্ধা দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে, তবু জয়ের আশা ক্ষীণ হয়ে আসে দিনকে দিন, কেবল একজন সত্যিকারের দলপতির অভাবে।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের চেষ্টার অন্ত নেই।

শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সম্রাট সাহায্য লিপি প্রেরণ করলেন জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়ারের রাজন্যবর্গের নিকট : সকাতর মিনতি : দেশের এতবড় দুদিনে আপনারা এগিয়ে আসুন। দেশকে বিদেশীর পদদলিত হতে দেবেন না। আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করুন। ফিরিংগীদের আমাদের জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করুন! স্বাধীন করুন আমাদের স্বপ্নের, গৌরবের হিন্দুস্থানকে! সকলে একত্র হোন। দেশ হতে ফিরিংগীদের তাড়িয়ে দিন। আমার রাজ্য মান সম্ভ্রম কিছু চাই না, সিংহাসন আমি হাসিমুখে ত্যাগ করবো, আপনারা যোগ্য ব্যক্তিকেই সিংহাসনে বসিয়ে দেশ শাসন করুন।

কিন্তু সম্রাটের কাতর অনুনয় ব্যর্থ হলো।

এদিকে দু'পক্ষে যুদ্ধ চলেছে ঘোর রবে।

দিল্লীর গৌরব-রবি যখন অস্তাচলমুখী দিন দিন, সামান্য মাহিয়ানার জন্য সেপাইদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ।

হয় মাহিয়ানা বাড়াও, নচেৎ নগরের ধনীদের গৃহ লুঠ করবো আমরা।

হায় অপদার্থের দল! দেশের এতবড় দুদিনে আজ সম্মানের চাইতে অর্থই হলো তোমাদের কাছে বেশী! দেশের চাইতে বেশী হলো একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা।

তোমারা পরাধীন থাকবে না ত থাকবে কে?

সম্রাটের আদেশ নায়ক বখৎখান সেপাইদের প্রশ্ন করে : তোমাদের অভিপ্রায় কি? যুদ্ধ করবে না আত্মসমর্পণ করবে?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত আমরা যুদ্ধ করবো!

বখৎখানের পরামর্শ মত স্থির হলো, নজাফগড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রু-পক্ষের যে সৈন্যদল আসছে তাদের ধ্বংস করতে হবে, যেন দিল্লীতে তাদের দল না এসে পৌঁছুতে পারে। শত্রু শিবিরে এ সংবাদ পৌঁছুতে দেরী হল না. নিকলসন অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দ্রুত সেপাইদের সংকল্পে বাধাদানের জন্য নজাফগড়ের দিকে এগিয়ে যায়।

ভারতীয় সৈন্যদল কিন্তু বখৎখানের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে সামনের এক পল্লীগ্রামে গিয়ে ছাউনি ফেললে।

ইংরাজ সৈন্য এসে অতর্কিতে ভারতীয় সেপাইদের আক্রমণ করলে।

সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিল বীরের মত যত ভারতীয় সেপাই, তারা আক্রমণের জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিল না।

'বুন্দেল-কি সড়াই'য়ের যুদ্ধের পর এত বড় পরাজয় ভারতীয় বাহিনীর আর হয়নি। দ্বিতীয়বার, নীতির অপপ্রয়োগ, যথেচ্ছাচারিতা, আদেশ লংঘন ও নৈতিক আদর্শের অভাবে ও একতার জন্যই তাদের ঘটলো শোচনীয় পরাজয়। এমনই হয়। আদর্শের মৃত্যু যেখানে ঘটেছে, পরাজয়কে সেখানে ঠেকিয়ে রাখা কি যায়? যায় না।

দীর্ঘকাল ধরে দিল্লী অবরোধের পর ২৫শে আগষ্ট ঐ যুদ্ধ জয় শ্বেতাঙ্গ দলে আনন্দের ও আশায় বাণী বহন করে আনল।

এদিকে ইতিমধ্যে পাঞ্জাব হ'তে নিরাপদে নতুন-সৈন্যদলও এসে গেল।

শত্রুপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনী: তিনহাজার পাঁচশত গোরা সৈন্য ও অফিসার, পাঁচ হাজার গুর্খা, শিখ ও পাঞ্জাবী সৈন্য। দুই হাজার পাঁচশত কাশ্মীরি সৈন্য, এ ছাড়াও এদের দলে ছিল বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী ঝিন্দের রাজা। ইংরাজ উচ্ছিষ্ট লোভী কুকুরের দল।

সেপ্টেম্বরের প্রথমমার্দ্ধে শত্রুপক্ষে সমরায়োজনই চলল।

ধীরে ধীরে ইংরাজ সৈন্যের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকের দল দিল্লীর গৌরব-রবি ধূলিসাৎ করতে এগিয়ে আসছে, দিল্লীর প্রাচীরের বাইরে, প্রাচীরের মধ্যে তখন আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে চলেছে নানা বিশৃংখলা, বিদ্রোহ ও দলপতির আজ্ঞা ও নির্দেশ লংঘন।

১৪ই সেপ্টেম্বর বিশাল ইংরাজ সৈন্য চারভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালাল।

দ্বিপ্রহরের দিকে বহু ফিরিংগীর রক্তপাত ও প্রাণদানের পর দিল্লীর প্রাচীর ভেংগে গেল, স্বাধীন দিল্লীতে আবার শ্বেতাংগরা প্রবেশ করল।

১১ই মের স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে তারই ভয়াবহ সূচনা ফিরে এল।

নিকলসন রক্তাক্ত, আহত।

২৪শে সেপ্টেম্বর প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন দিল্লীর সমগ্র আশাই প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে।

দিল্লীর তিনের চার অংশ শ্বেতাংগ অধিকারে গিয়েছে।

দিল্লীর বুকে স্থরু হলো এবারে প্রতিহিংসার রক্তোৎসব।

গোরা সৈনিকেরা বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, যাকে সামনে পেলে, তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিল্লীর পথের ধূলায় ছড়িয়ে দিল দানবীয় জিঘাংসায়।

গৃহে গৃহে জ্বালাল ভয়াবহ অগ্নি।

শিখ সৈন্যরাও তাদের সংগে মেতে উঠে সেই হত্যাযজ্ঞে! অগ্ন্যুৎসবে।

দিল্লীর প্রাসাদও অবরুদ্ধ : কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ ?

গভীর রাত্রে বখৎখান এসে সম্রাটের কক্ষে করাঘাত হানল।

কে ?

সম্রাট্, আমি বখৎখান।

আমাদের সব আশাই কি তা'হলে নির্মূল হলো, এই সংবাদই কি দিতে এলে বখৎখান !...বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন।

সম্রাট্ !...রাজধানী শত্রুদের হাতে গিয়েছে বটে, তবে এখনও আমরা শেষ চেষ্টা করতে পারি, আপনি নিরুৎসাহ হবেন না। আমি কাল এসে আপনাকে নিশ্চয় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বলব।

বখৎখানের প্রস্থানের একটু পরেই বাহাদুর শাহের আর একজন আত্মীয়, মীর্জা এলাহি বক্স এসে বাহাদুর শাহ্‌কে নিজ গৃহে নিয়ে গেল। সেখান হতে মীর্জার পরামর্শে পরের দিন রাত্রে সম্রাট্, বেগম জিন্নৎমহল ও তদীয় পুত্র হুমায়ুনের সমাধিভবনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গোপনে। এই সংবাদ গোপনে ঘর-সন্ধানী বিভীষণ রাজীব আলি ইংরাজ শিবিরে পৌঁছে দেয় এবং রাজীব আলি ও মীর্জার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত শ্বেতাংগ সেনাপতি হডসন দিল্লীর শেষ স্বাধীন সম্রাটকে বন্দী করলে।

আর বন্দী হলো ঐ সঙ্গে সাহ্‌জাদারাও।

পথিমধ্যেই শাহ্‌জাদা ও অন্যান্য রাজবংশীয়দের গুলি করে মারা হলো। হুমায়ুনের বংশধরদের রুধিরে দিল্লীর পথের ধুলো রাঙা হ'য়ে গেল।

১৮৫৮ অব্দের ২৭শে জানুয়ারী ইংরাজ সৈনিক কর্মচারীদের আদলেতে বিচারের প্রহসন শুরু হলো বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের। চল্লিশ দিন বিচারের পর আদেশ হলো : নির্বাসন দণ্ড।

রেংগুনের তিনশত মাইল দূরে পেগুতে বৃদ্ধ সম্রাট্ নির্বাসিত হলেন।

* * * *

দিল্লীতে অশ্রুমোচনের শেষ না হ'তেই ফিরে তাকাই লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার দিকে। এখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—সেই উচ্ছৃংখলতা, সেই নীতিভংগ, সেই ভেদাভেদ, সেই যথেচ্ছাচারিতা ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে, এবং তারই সাহায্যে সেখানেও শত্রুপক্ষই হলো জয়ী।

অযোধ্যা !

সেদিন যখন চক্রান্ত করে শ্বেতাংগরা বিনা বাধায় একটি বহু বিস্তৃত ও বহু

সম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে তাদের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্বাসিত করেছিল, তখন অযোধ্যাবাসী নির্বাক স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল, প্রতিবাদে কেউ একটি অংগুলিও হেলন করে নি। নবাবের পদচ্যুতিতে তারা কেবল নিরুপায় দুঃখানলেই অশ্রু-তর্পণ দিলে, কিন্তু ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি অসিও খাপ হ'তে মুক্ত হলো না।

ক্লীবত্বের ফল পেতে দেরী হয় নি।

যে নবাবের আমলে, তাদের নবাব অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রা সহজ ও সরলই ছিল, আজ সেই নবাবহীন ইংরাজের আমলে দুঃখ-দৈন্য যেন শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে এল।

অযোধ্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা যারা আত্মীয়তা সূত্রে নবাবের সঙ্গে ছিল সংযুক্ত, নবাবের অভাবে আজ তাদেরই দৈন্য ও অভাব যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠল!

সেদিন পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়-স্বজনরা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়রাই কেবল দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাই নয়, জনসাধারণও দারিদ্র্য ও করভারে অবসন্ন হ'য়ে উঠেছিল।

এরা ছাড়াও ভূসম্পত্তি ও অর্থবলে বলীয়ান চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি, একদা যারা তাদের ক্ষমতায়, তেজস্বিতায় ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল, এরাও শ্বেতাংগদের ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল।

তালুকদার সম্প্রদায়কেও উৎখাত করতে শ্বেতাংগরা কসুর করে নি।

সে সময় সম্ভ্রান্ত তালুকদারদের সশস্ত্র অনুচর ও জংগল পরিবেষ্টিত মৃন্ময় দুর্গ ছিল। শ্বেতাংগ আধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে, ঐ সব দুর্গ হতে কামান অপহরণ, জংগল পরিষ্কৃত, সশস্ত্র অনুচরদের নিরস্ত্রীকৃত ও দলভ্রষ্ট করে দেওয়া হয়! এ অপমানের জ্বালা সেই সব নিরস্ত্রীকৃত যোদ্ধারা ভুলতে পারে নি।

এই ভাবেই ১৮৫৭র বিপ্লবে ঐ সকল অধিকারচ্যুত-অত্যাচার জর্জরিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, স্বত্বভ্রষ্ট ভূস্বামীর দল, তাদের নিরস্ত্রীকৃত বিতাড়িত লাঠিয়াল সমরকুশলী অনুচরবৃন্দ, ও অযোধ্যা অধিকারের পর নবাবের সৈন্যদল হতে যে সব সৈন্যদের শ্বেতাংগরা বিতাড়িত করেছিল, সকলে আজ এগিয়ে এল প্রতি-হিংসা ব্রত উদ্‌যাপন!

মে মাসের প্রথমেই সাত সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক সৈন্যদল নতুন টোটা ব্যবহারে অসম্মতি জানায়। অধিনায়কদের সকল চেষ্টা হয় ব্যর্থ। টোটা তারা কিছুতেই ব্যবহার করবে না যায় প্রাণ যাক!

আটচল্লিশ সংখ্যক পদাতিক দলের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সংবাদ গিয়েছে পত্র মারফৎ। কিন্তু সেপাইদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

দেশদ্রোহী এক তরুণ সেপাইয়ের হাতে সে চিঠি ভাগ্যক্রমে পড়ে যায়।

আটচল্লিশ সংখ্যক পদাতিক দলের বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী পর-উচ্ছিষ্টলোভী সুবাদার সেবক তেওয়ারী, হাবিলদার হীরালাল দোবে এবং রামনাথ দোবে, তারাই গোপনে সেই পত্রখানা শ্বেতাংগ অধিনায়কদের হাতে তুলে দিতে কুন্ঠিত হলো না।

শ্বেতাংগ স্যার হেনরি লরেন্সের কানে এ সংবাদ পৌছতেই, সে বলে: আর দেরী নয়, বলপূর্বক ভারতীয় সেপাইদের এখুনি নিরস্ত্রীকৃত করতে হবে।

১০ই মের চন্দ্রালোকিত রাত্রি, মীরাটে যখন স্বাধীনতার পুণ্যসংগ্রাম হয়েছে সুরু, এখানে প্রশস্ত কাওয়াজের ময়দানে সুরু হলো নিরস্ত্রীকরণ উৎসব— ফিরিংগীদের বিজয় উল্লাসে। নিরস্ত্রীকরণ উৎসবের পর একপক্ষকালও গেল না, জ্বলে উঠলো আগুন অযোধ্যায়।

*　　*　　*　　*

আর লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি।

গোমতীর তটে যে পাহাড়টি অবনত হয়ে আছে, তারই উপরে রেসিডেন্সি, সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী। ১৮০০ সনে সাদত আলি, রেসিডেন্টের বাসের জন্য রেসিডেন্সী নির্মান করেছিলেন। রেসিডেন্সার মধ্যাস্থিত ভূগর্ভে অনেকগুলো গুপ্ত কক্ষ আছে। রেসিডেন্সীর সীমানার মধ্যেই ফিরিংগীর ধনাগার।

বৈদ্যুতিক তরংগের তারে ভাসিয়ে আনছে লক্ষৌতে চারিদিকের দুঃসংবাদ। বিপ্লবের বার্তা! প্রলয়-প্রভঞ্জনের গুরু গুরু ডাক।

ভারতীয় সেপাইরা চঞ্চল হয়ে উঠছে সে সংবাদে। দিল্লী, মীরাটের সাফল্য প্রাণে জাগাচ্ছে তাদের নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন!

সৈন্যাধ্যক্ষ হেনরী লরেন্স।

৩০শে মে'র রাত্রি। অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের আশু সম্ভাবনায় প্রকৃতি থম্ থম্ করছে।

রেসিডেন্সী গৃহে হেনরী লরেন্স ডিনার খেতে বসেছে তার সহচরদের নিয়ে টেবিলে। দ্বারে করাঘাত শোনা গেল: আসতে পারি?

—এসো! কি সংবাদ!

—আজ রাত্রেই বিদ্রোহীরা সংগ্রাম স্থরু করবে। শুনলাম সংকেতধ্বনি, নয়বার তোপধ্বনি নাকি ওরা করবে।

আগন্তকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারকে ফালি ফালি করে তোপধ্বনি শোনা গেল!

কিন্তু কই? কোন গোলমালই ত শোনা যাচ্ছে না!

হেনরী লরেন্স হেসে ফেলে: কই হে? কোথায় বিপ্লব?...সব যে চুপ্‌চাপ।

কিন্তু হেনরী লরেন্সের কথা শেষ হলো না। অকস্মাৎ মুহুমুহু বন্দুকের শব্দ চারিদিক প্রকম্পিত ক'রে তুলল: দুম্...দুম্!...দুড়ুম্!...দুম্!...

ছুটে সকলে ঘরের বাইরে আসে! রজতস্নাতা ধরণী। অপূর্ব মোহিনী!

সৈনিক নিবাস হতেই বন্দুকের শব্দ আসছে, তাতে আর কোন ভুলই নেই!...

বিদ্রোহীর দল এই দিকেই আসছে এগিয়ে।

সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করে সদল বলে হেনরী সৈনিক নিবাসের দিকে ধাবিত হয়। এদিকে সেপাইরা রেসিডেন্সীর-দিকে এসে গেল বুঝি।

জ্বলে উঠ্‌লো আগুন! স্থরু হলো ফিরিংগী নিধন যজ্ঞ।...

বিদ্রোহীদের অব্যর্থ গুলির আঘাতে ফিরিংগী ব্রিগেডীয়ারের রক্তাপ্লুত দেহ মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু একদিনেই সব বিদ্রোহীরা ছত্রভংগ হয়ে গেল ফিরিংগীর কামানের মুখে; একতা ও নিষ্ঠার অভাবে!

এদিকে অযোধ্যার চারিদিক হ'তে প্রাণভয়ে পলায়িত ফিরিংগীরা লক্ষ্ণৌতে এসে ভিড় করছে। অযোধ্যা ফিরিংগী শূন্য, ভারতীয়দের সম্পূর্ণ করতলগত।

হেনরী লরেন্স এখন লক্ষ্ণৌ রক্ষা কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার নতুন করে সৈন্য সমাবেশ স্থরু হয়। ঐ সৈন্যদলের মধ্যেই ছিল বিশ্বাসঘাতক, ভারতীয় শিখসৈন্যরা, তা' ছাড়াও ৮০০ জন অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য!

১২ই জুন আবার বিপদের কালো মেঘ এলো ঘনিয়ে আকাশে।

প্রথম সংঘর্ষ হলো ফিরিংগীদের সাথে ভারতীয় বিপ্লব-বাহিনীর—ইস্‌লামপুর পল্লীতে। বিপ্লব-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ফিরিংগী-বাহিনী ছত্রাকারে বিশৃংখল হয়ে গেল। গৌরবময় পশ্চাদপসরণ করতে তারা বাধ্য হলো।

বিন্-হাটের যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লব-বাহিনী এবারে এগিয়ে এলো বিজয়োল্লাসে গোমতীর তটাভিমুখে। সামনেই কামানদ্বারা সুসজ্জিত প্রস্তরময় সেতু—গোমতী পারাপারের একমাত্র পথ।

ফিরিংগী-বাহিনী মরণ পনে কামান চালাতে সুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে ভারতীয়-বাহিনী নৌকা সংগ্রহ করে নদী পার হতে সুরু করল।

আজ তারা কোন বাধাই মানবে না।

নীলাকাশ মধ্যাহ্নের প্রখর মার্তণ্ড তাপে যেন আগুন ছড়ায়।

ফিরিংগীদের আশ্রয় স্থল ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর সবই ভারতীয়-বাহিনী করেছে অস্ত্রমুখে অবরোধ।

চারিদিতে মুহুর্মুহু কামান গর্জন! আহতের আর্তনাদ, অগ্নি ও ধুম্র-শিখায় পৃথিবী জ্বলছে অত্যাচারের ঔদ্ধত্যে!

দুনিবার আক্রমণের মুখে মন্ত্রিভবন, রেসিডেন্সী সব বিদ্রোহীদের করতলে ছেড়ে দিতে ফিরিংগীরা বাধ্য হলো।

দিনমণি অস্ত গেলেন। এলো রাত্রির কালো ছায়া। কিন্তু গোলা-গুলির বিরাম নেই।

১লা জুলাই লক্ষ্ণৌতে ব্রিটিশের শক্তি ও গৌরব, বিপ্লব-বাহিনীর কামানের মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে মন্ত্রিভবন হতে প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ফিরিংগীরা দলে দলে রেসিডেন্সীতে এসে আশ্রয় নিল।

২রা জুলাই হেনরী লরেন্স বিপ্লব-বাহিনীর কামানের গোলায় শেষ নিঃশ্বাস নেয়; হেনরীর মৃত্যুসংবাদ ভারতীয়দের মধ্যে নতুন আশা বহন করে আনে। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ সুরু করে।

গোলা বৃষ্টির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই! সেদিনকার মুক্তি সংগ্রামের সে এক গৌরবময় অধ্যায়। দিনের পর দিন যায়, রাত্রির পর রাত্রি আসে: কিন্তু বিপ্লবীদের অবরোধ তিলমাত্র শিথিল হয় না। অবরুদ্ধ ফিরিংগীদের দুর্দশায় একশেষ। মনের শান্তি নেই, ক্ষুধায় আহার নেই, নেই তৃষ্ণায় পরিমিত জল! সবার উপরে দেখা দেয় ওলাউঠা, বসন্ত, যতপ্রকারের দুরারোগ্য সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধি।

সকল কিছুর উপরে অবিশ্রান্ত গোলা-বৃষ্টি!

জুলাই গেল। আগষ্ট মাস এলো, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তনই নেই। দেশদ্রোহী সেপাই অংগদ, হীন চরের বৃত্তি নিয়ে বিপ্লবীদের সকল সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে ফিরিংগীদের কাছে গোপনে গোপনে।

দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের বহু ভারতীয় কর্মচারী নিজেদের দেশের

ভাইদের ভুলে ইংরাজের তুষ্টি সাধনে যতপ্রকার সাহায্য সম্ভব দিয়ে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে।

অংগদই একদিন সংবাদ এনে দেয়: আর ভয় নেই, সেনানায়ক হ্যাভলক্ সসৈন্যে কানপুর হ'তে আসছে ফিরিংগীদের উদ্ধার করতে।

২৫শে সেপ্টেম্বর সত্য সত্যই উদ্ধারকারী ইংরাজ সৈন্যদের আসবার সাড়া পাওয়া গেল দ্বারে।

ওদিকে ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে আবার স্বাধীনতার সমাধি হলো। ফিরিংগীদের বিজয়-পতাকা সম্রাটের প্রাসাদে হল উড্ডীন নতুন করে।

দিল্লী অধিকারের সংগে সংগেই সুরু হলো ইংরাজ ও দেশদ্রোহী পর-উচ্ছিষ্টলোভী বিদেশীর তাঁবেদার দেশীয় সৈনিকদের হত্যা ও লুণ্ঠন নারকীয় উৎসব।

২৬শে সেপ্টেম্বর: লক্ষ্ণৌ!

বিপ্লব-বাহিনী মরণ পণে রুখে চলেছে, আসতে দেবে না আগত ফিরিংগী-বাহিনীকে। কিন্তু লক্ষ্ণৌর স্বাধীনতার স্বপ্নও ধূলিসাৎ হ'তে চলেছে। দিল্লী, ও মীরাটের বিষাক্ত ধোঁয়ার পুনরাবৃত্তিতে লক্ষ্ণৌর মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলেছে মাত্র। বিপ্লব-বাহিনীকে কিছুতেই যেন ফিরিংগীরা শেষ করতে পারে না।

অক্টোবর মাসও এই ভাবেই যায়। নভেম্বর মাস এসে পড়ে!

১৩ই নভেম্বর আলামবাগ এবং দেলখোশা বাগানের মধ্যবর্তী মৃন্ময় দুর্গের পতন হলো।

১৬ই নভেম্বর আবার ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর রেসিডেন্সী আক্রমণ করে।

কিন্তু সেখান থেকেও আবার পিছু হটে আসতে হয়।

এমনি করেই বিপ্লব-বাহিনীর সংগে শ্বেতাংগদের যুদ্ধ চলে দীর্ঘ দিন ধরে। রক্তে লক্ষ্ণৌর রাস্তার ধুলো লাল হয়ে যায় কামানের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে যায়।

লক্ষ্ণৌর এই জীবন-মরণ সংগ্রামে যে ভারত সন্তান মৃত্যুপণে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তার কথাই আজ বার বার মনে পড়ে: ফৈজাবাদের আহম্মদ শাহ্ মৌলবী। শ্বেতাংগরা বহু পূর্বেই আহম্মদশাহের অন্তরে অগ্নির সন্ধান পেয়েছিল এবং তাই তাকে গ্রেপ্তার করে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল ফাঁসীর দড়িতে, ১৮৫৭র মহাবিপ্লবের মাত্র কিছুকাল পূর্বে।

দেশপ্রেমিকের উপরে দেশদ্রোহীর অপরাধ কাঁধে চাপিয়ে ফৈজাবাদের কারাগৃহে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হলো।

যে মুহূর্তে ভারতের মাটিতে বিপ্লবের অগ্নি শিখা জ্বলে উঠ্‌লো, বিপ্লবীরা কারাগারের পাষাণ প্রাচীর ভেংগে গুড়িয়ে দিয়ে দেশপ্রেমিককে দিলে মুক্তি। কারামুক্ত অক্লান্ত দেশকর্মী আহম্মদ শাহ্‌ দিবারাত্র সমভাবে আবার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র বিলিয়ে বেড়াতে লাগলেন লক্ষ্ণৌর জনে জনে।

১৫ই জানুয়ারী ১৮৫৮: বিপ্লবীরা সংবাদ পেলে ফিরিংগী বাহিনী লক্ষ্ণৌর দিকে এগিয়ে আসছে কানপুর হ'তে।

আলমবাগে ফিরিংগী-বাহিনীকে তারা এসে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

এদিকে এতবড় সংবাদেও বিপ্লবীদের মধ্যে কোন সাড়াই কিন্তু জাগল না। রণসজ্জা বা উদ্যমের কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না।

আহম্মদ শাহ্‌ কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদে চুপ করে থাকতে পারলে না, তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন কানপুরের পথে অগ্রগামী ফিরিংগী-বাহিনীর অগ্রগতিকে রোধ করতে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে।

আউটরামের কাছে এ সংবাদ গোপন রইল না। ভারতীয় গুপ্তচর এসে গোপনে ফিরিংগীদের এসংবাদ আগেই দিয়ে দিল।

আউটরাম সংগে সংগে একদল সৈন্য প্রেরণ করলে: তোমরা শীঘ্র এগিয়ে যাও। সংবাদ পেয়েছি আহম্মদ শাহ্‌ সদলবলে কানপুরের পথে আমাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসছে। শীঘ্র গিয়ে তার গতিরোধ কর।

অস্ত্র মুখে দুই দলে সাক্ষাৎ হলো পথের মধ্যখানে।

অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের প্রতিরোধ, রক্ত দিয়ে রক্তের ঋণ শোধ! মস্তকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহম্মদ শাহ্‌, দেশমাতৃকার বীর সন্তান, স্বদেশদ্রোহিতার—ভাই হয়ে ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার, গুপ্তচর বৃত্তির মূল্য পরিশোধ করে গেলেন।

দলপতির রক্তাপ্লুত আহত দেহ সেই মুহূর্তেই ডুলির মধ্যে শায়িত করে বিপ্লবীরা লক্ষ্ণৌতে প্রেরণ করল।

বিপ্লবীদের মধ্যে যখন এই দুঃসংবাদ পৌছল, দলপতির শূন্যস্থান পূর্ণ করলে এবারে এক নির্ভীক ব্রাহ্মণ—ভিদেহী হনুমান। আহম্মদ শাহ্‌র অসমাপ্ত কর্মভার স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণ অসি হাতে রণক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন বীর বিক্রমে।

সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘোর সংগ্রামের পর ব্রাহ্মণ ফিরিংগীদের হাতে আহত হয়ে বন্দী হলেন।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে এই ঘটনায় বিশৃংখলা দেখা দিল আবার চতুর্দিকে।

আবার সেই অর্থের মোহ তাদের মনকে আচ্ছন্ন করল।

দেশের স্বাধীনতা গেল ভেসে, সুরু হলো স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৈন্যদের মধ্যে।

দিন যায়। চারিদিকে ঘোর অনিয়ম বিশৃংখলা। একজন মাত্র দলপতির অভাব। মাত্র একজন দলপতি যিনি ঐ বিশৃংখল বাহিনীকে চালনা করতে পারেন।

আবার এদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আহত আহম্মদ শাহ্ সামান্য একটু সুস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন সৈন্যদের পুরোভাগে। তখনও তার দেহের ক্ষতগুলি ভাল করে শুকিয়ে যায়নি। কিন্তু তার সকল প্রকার প্রচেষ্টাই এবারেও ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। ভীরু অপদার্থ দেশদ্রোহীর দল তখনও অর্থের মোহে নিশ্চল।

সেই ১৮৫৭র ভারতীয়দের মুক্তি-সংগ্রামের সময় হ'তে আজ পর্যন্ত যে ভারতীয় বাহিনীর পিঠ্ চাপড়ে ইংরাজ বাহাদুর বাহবা দিয়ে এসেছে, আসলে সে ভারতীয় বাহিনীকে গড়া হয়েছিল গুর্খা ও শিখ যোদ্ধাদের (?) নিয়েই।

১৮৫৭র মহাবিপ্লবের ঘন দুর্যোগে গুর্খা ও শিখ সৈন্য বাহিনী যদি শ্বেতাংগদের পাশে না এসে দাঁড়াত, এবং পরবর্তী কালেও যদি তারা তাদের সদা আজ্ঞাবহ হ'য়ে না থাকত, ত'হলে ফিরিঙ্গীদের ভারতে দীর্ঘ প্রায় পৌণে দুই শত বৎসরের কায়েমী রাজ্য বিস্তারের সোনার স্বপ্ন হয়ত করে সেই সম্ভাবনার মুখেই ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

দিল্লীর পরাজয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে যেমন শিখ-বাহিনীকেই মনে পড়ে, তেমনি লক্ষ্ণৌর পরাজয়ের দুদিনেও মনে পড়ে দেশদ্রোহী জংগ বাহাদুরের নেপালী সৈন্যদের কথাই সর্বাগ্রে।

আজ তাই অযোধ্যাবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল, যখন তারা শুনলে ইংরাজ বাহিনীকে সাহায্য করতে জংগ বাহাদুরের অন্য আর এক বাহিনীও অযোধ্যার দিকে এগিয়ে আসছে। আজ আর শোক করে কোন লাভ নেই। কারণ তখন জংগ বাহাদুরের মত দেশদ্রোহীকে গুলি করে মারবার মত কোন ব্রজেশ্বরী-নন্দন কানাইলালের হয়ত জন্ম নেওয়ার সময় হয়নি। ভারতবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি তখনও সম্পূর্ণ! তামস তপস্যা হয়নি শেষ।

শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বেগমও সৈন্যবাহিনী নিয়ে লক্ষ্ণৌ রক্ষায় এগিয়ে এলেন। কিন্তু হতচ্ছন্ন লক্ষ্ণৌর 'পরে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে এসেছে।

কানপুর হতে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কলিন্সের পরিচালিত সৈন্য বাহিনী আউটরামের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে।

ইংরাজ সৈন্য বাহিনী লক্ষ্ণৌ অধিকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দলে দলে চতুষ্পার্শ্ব হতে ইংরাজ সৈন্য এসে লক্ষ্ণৌর সৈন্য বাহিনীর সংগে মিলিত হচ্ছে।

বিদ্রোহীদের দলও পুষ্ট হয়ে উঠ্ছে; কত লোক আসছে জন্মভূমির রক্ষা কল্পে, গ্রাম হতেও ছুটে আসছে অশিক্ষিত মূর্খ গ্রামবাসীরা তারাও যুদ্ধ করবে।

মূর্খ, দরিদ্র, অশিক্ষিত চাষী, তারাও আজ এসেছে :—

আগে কেবা প্রাণ
করিবেক দান
তারই লাগি কাড়াকাড়ি।

দেশ হতে দেশান্তরে, সহর হতে সহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যে রক্ত-কোকনদের প্রতীক বিলান হয়েছিল যে, চাপাটি বিতরণ হয়েছিল : উঠ, জাগ ভারতবাসী, মায়ের শৃংখল মোচন কর, আজ যেন সেই রক্ত-কোকনদের পাপড়িগুলি দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে, অগ্নিস্ফুলিংগের মত, চৈত্র-শেষের ঝরা পাতার মত, দুরন্ত গ্রীষ্মের বাতাসে। সেই চাপাটি উৎসব আজ দিকে দিকে।

অগণিত সন্তান এসেছে আজ দেশ-মাতৃকার শৃংখল মোচনে।

সহরের রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে বন্দুক কামান বসেছে।

দিলখুশ-বাগ হতে কৈশোর-বাগ পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রস্তুতি।

কেবল মাত্র সহরের উত্তরাংশে কোন ব্যবস্থা নেই, কেবল মাত্র বিদ্রোহী সৈনিকরা সেখানে বুক ফুলিয়ে এখনও দণ্ডায়মান।

ধূর্ত কৌশলী ইংরাজ সেনানায়ক কলিন্স্ সহরের উত্তরাংশের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠ্ল।

আক্রমণ শুরু হলো ঐ পথেই।

ইতিপূর্বে হ্যাভ্লক্, আউটরাম, কলিন্স কেউই ঐ অংশ দিয়ে লক্ষ্ণৌ আক্রমণের পরিকল্পনা করেনি।

সহরের ঐ অংশেই গোমতী নদী প্রবাহিতা। বিদ্রোহীরাও ভেবেছিল, ঐ পথটিতে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থারই প্রয়োজন নেই।

আউটরামও ঐ পথটিই এবারে বেছে নিল।

৬ই মার্চ সুরু হলো আক্রমণ উত্তর-পথে।

৬ই মার্চ হ'তে সুরু করে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত দিবা-রাত্র সমভাবে চলেছে সংগ্রাম, বীর সৈনিকদের দৃঢ় পণ: জননী জন্মভূমিকে আবার স্বাধীন করবোই।

রক্ত-স্রোত বয়ে চলেছে। লক্ষ্ণৌর শেষ আশার আলোটুকু তাও বুঝি নির্বাপিত হয়ে আসছে।

লক্ষ্ণৌর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মধ্যে নবাব ও বেগমকে মুক্তিকামী সৈনিকেরা —কোনমতে স্থানান্তরিত করে।

কিন্তু শহীদ আহম্মদ শাহ্ কই?

তখনও তার প্রাণে আশা। নতুন উদ্যমে আবার আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি সামান্য মুষ্টিমেয় বীর-সৈনিকদের নিয়েই।

সহর ফিরিংগীদের পূর্ণ অধিকারে এসেছে।

২১শের সংগ্রামই লক্ষ্ণৌর শেষ সংগ্রাম।

সহরের কুটীরে কুটীরে সুরু হয়েছে বিজয়ী ফিরিংগীদের লুণ্ঠনোৎসব, হত্যা, রক্তপাত ও অগ্নি-যজ্ঞ।

রক্তে সহরের পথ-ঘাট পিচ্ছিল। অগ্নি ও ধূম্রে আকাশ আচ্ছন্ন। আহতের আর্তনাদ চারিদিকে।

রক্ত-লোলুপ ফিরিংগীদের দানবীয় অট্টহাস্য।

দোষী নির্দোষীর নেই কোন ভেদাভেদ। বিচার ত' নয় যথেচ্ছাচারিতা। কুৎসিত প্রতিহিংসা।

একটি বৃদ্ধ এগিয়ে এল: তোমরা না সুসভ্য ইংরাজ! নির্দোষ শিশুদের এমনি করে হত্যা করছো কেন? গুড়ুম্! প্রত্যুত্তর এলো সৈনিকের মুষ্টিবদ্ধ পিস্তল হতে অগ্নি-ঝলকে। রক্তাক্ত-দেহ, গত-প্রাণ বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলায়। ক্ষুধার্ত্ত হায়নার মত হয়েছে ফিরিংগীর দল। সুসভ্য জগতে এসেছে বন্য-বর্ব্বরতা। সেই আদিম হিংস্র জিঘাংসা। সেই রক্ত-তৃষ্ণা!

বন্দী সেপাইদের কুকুরের মত গুলি করে মারা হচ্ছে।

* * *

দিল্লীর পতন হয়েছে। অশ্রু মোচন করছে দিল্লী।

লক্ষ্ণৌতেও সুরু হলো অশ্রু মোচন।

কিন্তু সংগ্রামের ত শেষ হলো না।

যে মশাল জ্বললো তার আগুন ত নিভবার নয়। নিভবে কেন? এ ত বিদ্রোহ নয়! এ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ মৃত্যু নয় এ যে প্রাণদান!

এ অস্ত্রধারণ ত সামান্য অভিযোগের 'পরে ভিত্তি করে নয়।

ধর্মনাশ! সে ত ভুয়ো কথা।

রাজনৈতিক দাসত্ব! দীর্ঘ দিনের দাসত্বের মর্মদাহ তিল তিল করে যে জাতিকে এতকাল দগ্ধেছে!

এবং সেই অগ্নিদাহ মন্থন করে জেগেছে মুক্তির রক্ত কোকনদ। মুক্তির জ্যোতির্ময় শিখা।

স্বদেশ আমার! জননী আমার। মাগো আমার জন্মভূমি!

দিল্লী গিয়েছে। গিয়েছে লক্ষ্ণৌ! কিন্তু অযোধ্যায় তখনও চলেছে সংগ্রাম।

সেপাই হতে সুরু করে, জমিদার, রাজা তালুকদার, মৌলভি-মুন্সি, সাধারণ গ্রামবাসী সবাই এসেছে এ সংগ্রামে। এ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তির জন্য মরণ পণ।

* * *

লক্ষ্ণৌকে পশ্চাতে ফেলে ফিরে তাকাই অযোধ্যার দিকে।

অনল-শিখায় রক্তাভ হয়ে উঠেছে অযোধ্যার আকাশ।

সীতাপুর: প্রথম অনল-শিখা দেখা দিল।

সেপাইদের সংগে হাতে হাত মিলিয়েছে অত্যাচারে জর্জরিত ভূস্বামীরাও।

৩রা জুন: সীতারামপুরে বিদ্রোহানল জ্বলে উঠ্লো। লুণ্ঠিত হলো ধনাগার।

কয়েকজন দেশদ্রোহী সেপাই গোপনে লক্ষ্ণৌতে সংবাদ প্রেরণ করে।

তড়িৎ বেগে ফিরিংগীদের রক্ষা কল্পে ছুটে এলো এক দল শিখ সৈন্য লক্ষ্ণৌ হ'তে।

সীতারামপুর হ'তে বিদ্রোহানল ব্যাপ্ত হয়েছে মুলাওনে। সেখান হ'তে মোহমদীতে।

প্রজ্বলিত হুতাশনের মত বিপ্লবের অগ্নি-শিখা একে একে অযোধ্যার চতুষ্পার্শ্বে রিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

কি সাধ্য ফিরিংগীদের ঐ জ্বালাময়ী পাবক-শিখার গতি রোধ করে।

মুক্তির ডাক পৌঁছে গেছে জনে জনে। তরংগ রোধিবে কে? মহাবারিধির

বক্ষ হতে এসেছে তরংগাঘাত। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই তরংগ।

তরংগবিক্ষুব্ধ ফৈজাবাদ।

একদা সম্পদ প্রভাবশালী অযোধ্যার তালুকদারগণ, যারা ফিরিংগীদের রাজত্বে পর্যুদস্ত হচ্ছিল ও হয়েছিল, আজ তারা এতবড় সুযোগ হেলায় হারাতে চাইলে না।

তাহাদের হৃদয়গত প্রচণ্ড বিদ্বেষ-বহ্নি, এতকাল যা প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়ের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, সহসা যেন লেলিহান হয়ে উঠে।

সাহাগঞ্জের রাজা মানসিংহ।

ফিরিংগীর অত্যাচারে হৃতসর্বস্ব হয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন।

এই দুর্যোগে তাকে বন্দী করা হলো।

ফৈজাবাদে তখন বিপ্লবের অগ্নি-শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সর্বত্র লুঠ, হত্যা চলেছে অবাধে।

সুলতানপুরে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল ৯ই জুন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতানপুরও ফিরিংগী শূন্য হলো।

শেষ আশা ছিল রাজা হনুমন্ত সিংহ।

ফিরিংগীর অত্যাচারে জর্জরিত হৃতসর্বস্ব হনুমন্ত সিংহ তিনিও রেহাই পাননি।

যে ফিরিংগীর দল একদা তার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেনি, আজ তারাই যখন রাজার দরজায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল, রাজার দুই চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করল: সাহেব! আপনাদের দেশের লোক এই দেশে এসে, আমাদের রাজাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যে সব সম্পত্তি চিরকাল হ'তে ভোগ দখল করে এসেছি, আপনারা, সে সব জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছেন অন্যায় জুলুম করে। তথাপি আমি আপনাদের কোনদিন বিরুদ্ধাচরণ করিনি। এখন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। এই দেশের লোক আজ আপনাদের বিরোধী হয়ে উঠেছে। একদিন অন্যায় জুলুম করে যাকে আপনারা সম্পত্তিচ্যুত, নিঃসহায় করেছেন, আজ তারই কাছে এসেছেন সাহায্যের প্রার্থনায়, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাবো এবং আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এদেশ হ'তে আপনাদের চিরদিনের মত বিতাড়িত করবো।

অযোধ্যা ও অযোধ্যার আশে পাশে কি ভাবে বিপ্লবের অগ্নিশিখা বিস্তারলাভ করেছিল, সে কথা স্বীকার করতে ফিরিংগী ঐতিহাসিকদেরও অনেক সময় সত্যকেই মেনে নিতে হয়েছিল : এই সব ঘটনায় ইংরাজের জীবন এবং ইংরাজের সম্পত্তির যেভাবে অনিষ্ট হয়েছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের স্বজাতিগণ শৃগাল শকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য না হলেও, আপনাদের প্রাণনাশের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পলায়ন করেছে দিকে দিকে।

সিপাহীযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্বয়ং কে সাহেবের বিবৃতি।

* * *

১৬ই আগষ্ট ইংলণ্ড হতে নব নিযুক্ত সেনাপতি এলেন স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল।

২০শে অক্টোবর ক্যাম্পবেল কলিকাতা হ'তে যাত্রা করে ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে এসে পৌছলেন।

কানপুরের পথে ক্যাঃ পীল সিপাহীদের সংগে যুদ্ধে জয়লাভ করে চলেছে।

ফতেপুর হতে ১৪ মাইল দূরে কাজোয়া পল্লী। ১৬৫৯ খৃঃ আলমগীর বাদশা আওরংজীব তার ভ্রাতা শাসুজার সংগে এইখানেই যুদ্ধে বিজয়ী হন।

আওরংজীবের ভারত সাম্রাজ্য লাভের মীমাংসা সেদিন এইখানেই স্থিরীকৃত হয়েছিল।

দানাপুর হ'তে বহুসংখ্যক সিপাহী কাজোয়ায় এসে সমবেত হলো।

১লা নভেম্বর দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় এবং যুদ্ধে জয়ী হল ইংরাজই।

এদিকে ৩রা নভেম্বর ক্যাম্পবেল কানপুরে উপনীত হয়।

ক্যাম্পবেল যখন তার সৈন্যসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় এসে প্রবেশ করলে, সেখানে তখনও চলেছে প্রচণ্ড সংগ্রাম।

পথে কেবল কানকাটা কুকুর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

* * *

১৩ই নভেম্বর প্রধান সেনাপতি আলমবাগ ও দেল-খোশা বাগান অধিকার করে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, দ্রুত পাতাগুলো উল্টিয়ে যাই।

২৬শে নভেম্বর। কানপুর।

সংবাদ এসেছে প্রধান সেনাপতি ক্যাম্পবেল সসৈন্যে কানপুরের নৌ-সেতু উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নৌ-সেতুর প্রান্তভাগে একটি মৃন্ময় দুর্গে সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম্ তখনও প্রতিরোধ করে চলেছে মুক্তিকামী সৈনিকদের।

কিন্তু মৃন্ময় দুর্গে প্রবেশের আগে ১৮৫৭-র মুক্তি সংগ্রামের পরিকল্পনা-কারী শ্রীমন্ত নানা, তাঁতিয়া তোপী ও আজিমুল্লাহখান্—সেই তাদেরই অন্যতম রক্ত-বিপ্লবের শহীদ মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ বীরশ্রেষ্ঠ সেনা নায়ক তাঁতীয়া তোপীকে স্মরণ ক'রে প্রণাম জানিয়ে নিই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। উন্নত পেশল দেহ, সুগঠিত মস্তক, বিস্তৃত কপাল, খড়্গের মত উন্নত নাসা প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী।

১৮৫৭-র রক্ত-বিপ্লবের স্মৃতি চিরদিন জাতির মনে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে, বিশেষ করে সেই বিপ্লবের হোতা শ্রীমন্ত নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাই, আজি-মুল্লাহ্খান, কুমার সিং, মঙ্গল পাড়ে, সেনানায়ক মহারাষ্ট্র প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ তোপী।

ত্যাতা তোপে, তাঁতীয়া তোপী।

সেই ১৬ই জুলাই কানপুরে সেপাইদের পরাজয়ের পর শ্রীমন্ত নানা সাহেবকে কানপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মাবর্তের দিকে অগ্রসর হ'তে আমরা দেখে এসেছিলাম।

প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে সে রাত্রে গোপন সভা বসল শ্রীমন্ত নানার।

১৭ই জুলাই শ্রীমন্ত নানা তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালা সাহেব, ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, প্রধান সহকারী ও সেনাধ্যক্ষ তাঁতীয়া তোপী ও কুলনারী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর দিকে অগ্রসর হলেন।

ভাগীরথী তটে নৌকা প্রস্তুত।

শ্রীমন্ত নানা লক্ষ্ণৌর অন্তর্গত ফতেপুর চৌধুরী ভূপাল সিংয়ের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

চৌধুরী ভূপাল সিং বিপ্লবীদের নিজ গৃহে সাদর আহ্বান জানালেন।

হ্যাভ্লক তখন তার সমগ্র সৈনিদের নিয়ে কানপুর পরিবেষ্টন করে লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হবার মতলব আটছেন।

দরবারে স্থির হলো, কানপুরের সমরে পরাজিত ছত্রভংগ সৈন্যবাহিনীকে আবার নতুন করে গড়ে কানপুরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে।

সেনাধ্যক্ষ হবেন স্বয়ং তাঁতিয়া তোপী।

উঠ! সৈনিকগণ আবার সাজ, স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও!

ওদিক ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ হ্যাভলক প্রস্তুত হচ্ছেন লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হতে। অকস্মাৎ তাঁতীয়ার সৈন্যবাহিনী ঝড়ের মত সম্মুখে এসে বিপর্যস্ত করে তোলে ফিরিংগীদের অগ্রগতিকে।

ত্রস্তে তারা কানপুরের দিকে হটে আসে।

ফিরিংগী সৈন্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাঁতীয়া আবার ফতেপুরে এসে নানা সাহেবের সংগে মিলিত হলেন।

বিশ্বাসঘাতক সিন্ধিয়ার আশ্বাস বাক্যে গোয়ালিয়রের সৈন্য বাহিনী তখনও ছিল নিশ্চুপ।

অন্তরে তাদের ঝড় বইছে, স্বাধীনতার সংগ্রামে যে তারাও তাদের বুকের রক্ত তর্পণ দিতে চায়।

গোপনে তাঁতীয়া গোয়ালিয়রের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে গিয়ে মিশে গেলেন।

মর্মস্পর্শী ভাষায় জানালেন আহ্বান: এসো বীর, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করো।

সুসজ্জিত গোয়ালিয়র বাহিনী নিয়ে তাঁতীয়া অগ্রসর হন, কানপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনার দক্ষিণ ভাগে কাল্পী অভিমুখে।

সমর কৌশলী সুদক্ষ সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক বুঝতে পেরেছিলেন কানপুর অধিকার করতে হলে, সর্বপ্রথমে অধিকার করতে হবে কাল্পীর দুর্গ এবং সেখান হ'তেই চালাতে হবে আক্রমণ।

এদিকে গুপ্তচরের মুখে তাঁতীয়া স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের কানপুর আসবার সংবাদও পেয়েছিলেন।

দ্রুত ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসে তাঁতীয়া কাল্পী অধিকার করে সেখানে সৈন্য স্থাপনা করলেন।

১০ই নভেম্বর যমুনা পার হয়ে ভগিনীপুর অধিকার করলেন, সেখানেও সৈন্য সমাবেশ করা হলো।

বালা সাহেবও এসে তাঁতীয়ার সংগে সসৈন্যে যোগ দিলেন।

মাত্র কিছুকাল আগেও যে দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ত নানার দরবারে সামান্য একজন বেতনভুক্ত কলম-জীবী ছিলেন মাত্র, আজ তিনিই সমরনায়ক। গৌরব আসে বুঝি এমনি করেই।

ফিরিংগী সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম সসৈন্যে নৌ-সেতুর প্রান্ত ভাগে অবস্থিত মৃন্ময় দুর্গে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রধান সেনাপতি কলিন ক্যাম্পবেলের আশা-পথ চেয়ে।

রণ-কৌশলী সেনানায়ক আর বৃথা কালক্ষেপ না করে, যমুনা অতিক্রম করেই 'দোয়াবে' এলেন, এবং জালনায় তার ধনসম্ভার ও অন্যান্য জিনিষগুলো রেখে ঝড়ের গতিতে কানপুরের আশে পাশে কতকগুলো গ্রাম অধিকার করে নিলেন।

ফিরিংগীদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়াইণ্ডহামের নেতৃত্ব ফিরিংগী-বাহিনীও চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। ২৫শে নভেম্বর পাণ্ডু নদীর অভিমুখে অগ্রসর হলো অগ্রগামী তাঁতীয়ার সৈন্যবাহিনী, চারিপাশ হ'তে ঘিরেছে তাদের ওয়াইণ্ডহামের সৈন্যরা।

মুহুর্মুহু প্রতিপক্ষের সৈন্যদের 'পরে তাঁতীয়ার সৈন্যরা গোলা-গুলি বর্ষণ করছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই বিপ্লবীদের তিনটি কামান ফিরিংগীরা অধিকার করে নেয়।

আশায় আনন্দে ওয়াইণ্ডহামের সৈন্যবাহিনী উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে: আর কি, জয়ত এবার তাদের করায়ত্ব! বিপ্লবীরা ছত্রভংগ হয়েছে।

আনন্দে ফিরিংগীবাহিনী প্রত্যাবর্তনের কল্পনা করছে। সহসা এমন সময় ঝড়ের মত তীব্র বেগে তাঁতীয়ার বাহিনী ওদের 'পরে এসে ঝাপিয়ে পড়ল।

আক্রমণের বেগ সামলাতে না পেরে ফিরিংগী-বাহিনী একবারে কানপুর পর্যন্ত হটে এল।

ভারতীয় সেনানায়ক যে কতবড় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, সেটা বুঝতে ওয়াইণ্ডহামের মুহূর্তও বিলম্ব হয় না।

চক্রব্যূহের মত প্রায় চতুর্দিক হ'তে তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনী ফিরিংগীদের ঘেরাও করে ফেলেছে।

প্রায় অর্দ্ধভাগ কানপুরই এখন তাঁতিয়ার করতলগত।

এমন সময় সংবাদ এল গুপ্তচরের মুখে, ব্রিটিশ প্রধান সেনানায়ক স্যার কলিন্সের সৈন্যবাহিনী কানপুরাভিমুখে অগ্রসর হ'য়ে আসছে ঝড়ের বেগে।

এদিকে তাঁতিয়ার নিজের সৈন্যবাহিনী অবিশ্রাম যুদ্ধে ক্লান্ত ও অবসন্ন।

২৯শে নভেম্বর ফিরিংগীদের প্রধান সেনাপতি কানপুরের নৌ-সেতু উত্তীর্ণ হলো।

ওদিকে উৎকণ্ঠিত ওয়াইণ্ডহাম মৃন্ময় দুর্গের মধ্যে বসে কলিন্সের আগমন প্রতীক্ষা করছিল প্রতি মুহূর্তে।

দিনমণি অস্তাচলমুখী। কলিন্সের সৈন্যবাহিনী একে একে নৌ-সেতু অতিক্রম করে কানপুরে পদার্পন করছে।

সকলেই গিয়ে মৃন্ময় দুর্গে আশ্রয় নেয়।

এখনও প্রায় সমগ্র কানপুর সহর ও ভাগীরথীর তটদেশ তাঁতিয়ার সৈন্য-বাহিনীর করতলগত।

কানপুরের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিক্ষরা পৃষ্ঠাগুলি!

বামে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী ও নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান—বৃক্ষবহুল উন্নত ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা ও নালাসমূহ। দক্ষিণে গংগার খালের অপর দিকে বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তর।

এই প্রান্তরেই গোয়ালিয়র বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রস্তত হয়ে আছে।

* * *

কয়েক দিন রণসজ্জা চলতে থাকে।

তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনীর সংগে এসে ইতিমধ্যে মিলিত হয়েছে শ্রীমন্ত নানা-সাহেবের সৈন্যবাহিনী ও বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্যভারতের সৈন্যবাহিনী।

সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ মহারাষ্ট্রীয় রণকৌশলী বিদ্রোহী সেনানায়ক স্বয়ং তাঁতিয়া তোপী।

৬ই ডিসেম্বর সূর্য আকাশ-পটে দেখা দিল রক্তরথে।

সূর্য চিহ্নিত রক্তিম আকাশকে প্রতিবিম্বিত করে কামান উঠলো গর্জ্জে!

একদিকে শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও তাঁতিয়ার সৈন্য পরিচালনা, অন্যদিকে ব্রিটিশ সেনানায়ক স্যার কলিন্স, ওয়াইণ্ডহাম, ওয়ালপোল, ও ক্যাঃ পীল প্রভৃতি।

কিন্তু হায় তথাপি ১৮৫৭র গৌরব রবি অস্তাচলমুখী।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌর মেঘাবৃত আকাশ হ'তে কালো মেঘ কানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো বুঝি, তা নাহলে তাঁতিয়ার পরাজয় ঘটে কখনো ক্যাঃ পীলের কাছে।

একান্ত বাধ্য হয়েই পশ্চাদপসরণ করে গেল তাঁতিয়া ও তার সৈন্যবাহিনী।

৯ই ডিসেম্বর বিঠুরের পথে হলো এদের সংগে দ্বিতীয় সংঘর্ষ।

এবারও মুক্তি সংগ্রামীদের পরাজয়।

তাঁতিয়া পুনঃ কাল্পীতে এলেন। আবার মনোযোগ দিলেন নতুন করে সৈন্য সমাবেশে।

সংগ্রামে জয় পরাজয় আছেই, কিন্তু তার জন্যে বিচলিত তাঁতিয়া নন।

এই সময় নানা এলেন বিঠুরে।

সেখান হ'তে গেলেন অযোধ্যায়।

পরহস্তগত কানপুর হতে বিদায় নিয়ে যাবো এবারে অন্যদিকে।

১৮৫৭র অগ্নিশিখা লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছি সম্মুখের দিকে।

শেষ তর্পণ বুঝি ঝাঁসীতে।

ঝাঁসী হতে সেদিন যখন কামানের গোলার বারুদ ও রক্তস্রোতের মধ্যে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন সেখানে ইংরাজের প্রাধান্য আর ছিল না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ তখন ঝাঁসীর গদীতে।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ দশ মাস অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে।

রাজ্যের কোথাও কোন খেদ বা গোলমাল নেই।

এমন সর্বগুণন্বিতা মহীয়সী নারী যেখানে স্বীয় হস্তে শাসন-রজ্জু ধরেছেন, সেখানে আর দুঃখ বা নালিশ কিসের! কিসেরই বা অভিযেগ!

প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় লক্ষ্মী প্রায়ই পুরুষের বেশে, আবার কখনো কখনো নারীর বেশে সজ্জিত হ'য়ে দরবার ঘরের সংলগ্ন তার নিজস্ব বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। সেখান হতেই তার আদেশ লিপি ঘোষিত হতো।

* * *

১৯শে মার্চ ১৮৫৮, সংবাদ এলো ঝাঁসী হ'তে ১৪ মাইল দূরবর্তী চঞ্চলপুরের দিকে ফিরিংগী সেনানায়ক স্যার হিউ রোজ সসৈন্যে যাত্রা করেছে।

তদানীন্তন ঝাঁসীর নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও তেমন কুশলী ও কর্মপটু ছিলেন না বলেই, উপস্থিত কর্মনির্ধারণে গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিল।

রাণীর দরবারে এমন অনেক বয়স্থ কর্মচারী ছিল, যারা ইংরাজ সৈন্যের আগমন-বার্তা শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

রাণী-মা, আত্ম-সমর্পণ করুন: ভীত ত্রস্ত আবেদন।

আত্ম-সমর্পণ! ওষ্ঠপ্রান্তে ঘৃণার হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়: মেরি ঝাঁসী নেহি দুংগী।

রাণীর অধীনে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সেনানায়ক নথে খাঁ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

তখন যোদ্ধারাও সজ্জিত হলো রণসাজে।

রাণী আসন্ন যুদ্ধের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ : মেরী ঝাঁসী নেহি দুংগী।

২১শে মার্চ স্বয়ং হিউ রোজ তার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীতে এসে শিবির স্থাপন করলে, নগর ও দুর্গের মধ্যবর্তী কতকগুলি ভগ্নপ্রায় বাংলোর মধ্যে।

দক্ষিণে সমুন্নত পর্বত-শ্রেণী বহুদূর বিস্তৃত। বামে পর্বত-শ্রেণী ও ফতিয়ার পথ প্রসারিত।

উত্তরে পর্বত-শীর্ষে ঝাঁসীর প্রসিদ্ধ দুর্গ, চতুষ্পার্শ্বে সমুন্নত সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত।

দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ব্যতীত অন্য সকল দিকে ঝাঁসী নগরী প্রসারিত।

শুধু যে দুর্গই প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল তা নয়, নগরীও ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত।

দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় নগর-প্রাচীরেও গুলি নিক্ষেপের রন্ধ্র এবং কামান সন্নিবেশের স্থল নিদিষ্ট ছিল।

দূর হতে যাতে দুর্গ অভ্যন্তর পরিদর্শন করা যায়, হিউ রোজ নগরের বহির্দেশে একটি সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করে।

২২শে মার্চ চতুষ্পার্শ হতে নগর ও দুর্গ অবরোধ করা হয়।

২৩শে মার্চ কামান নির্ঘোষে যুদ্ধ হলো সুরু উভয় পক্ষে।

* * *

অন্ধকার রাত্রি।

আকাশে অগণিত তারকা।

রাত্রির অন্ধকারকে দূর করেছে নগরের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অসংখ্য মশাল। সুগভীর রণবাদ্য বাজে দুম্ দুম্ দুম্!...

রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠে।

ইংরাজ সৈন্য রাত্রির অন্ধকারে একবার আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু সতর্ক রাণীর সৈন্যদের গোলা বর্ষণে আবার পিছু হটে আসে।

পরদিন প্রভাতে রাণীর সুবিখ্যাত কামান 'ঘনগর্জ' হ'তে গোলাবর্ষণ সুরু হলো। পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে ফিরিংগী বাহিনী 'ঘনগর্জের' তোপাঘাতে।

২৪শে, ফিরিংগীরা চারটি তোপমঞ্চ তৈরী করে আক্রমণ সুরু করে। নগর প্রাচীরের কিয়দংশ ঐ দিন ভেংগে গেল।

নগরবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে।

এগিয়ে এল অন্তঃপুরবাসিনী রাণী রণাংগনে অসিহস্তে।

২৫শে দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হয়।

রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ বীর-বিক্রমে বুরুজ হ'তে গোলা বর্ষণ সুরু করে।

২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০শে মার্চ ঝাঁসীর বীরবৃন্দ একে একে প্রাণ দান করেন রণক্ষেত্রে।

৩১শে মার্চ : সুসংবাদ এসেছে, সেনানায়ক তাঁতিয়া তোপী আসছে সসৈন্যে ঝাঁসীর দিকে।

হিউ রোজের কপালে চিন্তার রেখা দেয়।

এদিকে এখনো দুর্গ করতলগত হয়নি।

বেত্রবতীর তীরবর্তী প্রান্তরে তাঁতিয়া শিবির স্থাপনা করেছেন।

আর বিলম্ব নয়, দুর্গ অবরোধ চালাবার জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রেখে হিউ রোজ বাকী সৈন্য নিয়ে তখনি বেত্রবতীর দিকে অগ্রসর হয়।

তাঁতিয়ার নিকট এ সংবাদ পৌছাতে বিলম্ব হলো না।

তাঁতিয়ার শিবিরের পুরোভাগে ঘন জংগল, প্রখর মার্তণ্ডতাপে শুষ্ক।

'জংগলে অগ্নি সংযোগ কর', তাঁতিয়া নির্দেশ দিলেন।

মুহূর্তে অগ্নিসংযোগে দাবানলের মতই অরণ্যের শুষ্ক গুল্মলতা দাউ দাউ করে লেলিহান শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে পথ রোধ করল হিউরোজের।

নিবিড় ধূম্ররাশিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত।

এই অবকাশে তাঁতিয়া পশ্চাদপসরণ করলেন। জানি না বীর সেনানায়কের হঠাৎ এ বিভ্রম কেন হলো।

দুঃসময়ে বুঝি মতিভ্রমই ঘটে অতি বড় বুদ্ধিমানেরও।

তাঁতিয়ার আগমন সংবাদে দুর্গাভ্যন্তরে যে আনন্দের বার্তা বহে এনেছিল, এই দুঃসংবাদে তা নিমিষে লুপ্ত হলো।

কিন্তু তবু তারা নিরুৎসাহ হয়নি সেদিন ·

আবার নতুন আশায় নতুন উদ্দীপনায় সৈন্যদের মধ্যে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেল।

১লা এপ্রিল তাদের যুদ্ধে যে অপূর্ব্ব বিক্রম দেখা গেল, তা সত্যিই অতুলনীয়।

৩রা এপ্রিল :

নগরের প্রবেশের প্রধান পথ : বোরছা নরোয়াজা ইংরাজ সৈন্যের হস্তগত হয়েছে, উন্মত্ত জলস্রোতের মত ফিরিংগীরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে বিশৃংখলা। উন্মত্ত সৈন্যেরা ঘরে ঘরে আগুন লাগাচ্ছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাকে সম্মুখে পায় অসির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দানবীয় হিংসায়।

রাণীর প্রাসাদ দুয়ার :

উন্মত্ত ফিরিংগী সৈন্য আর তাদের তাঁবেদার পর-উচ্ছিষ্ট লোভী ভারতীয় সৈন্য।

ভাঙ্! ভাঙ্ রে দুয়ার!

মৃত্যু পণে পথ রোধ করেছে রাণীর সৈন্যবাহিনী।

চারিদিকে জ্বলেছে আগুন।

প্রচণ্ড হুতাশন।

আর বুঝি প্রাসাদ রক্ষা করা যায় না।

দুর্গের অভ্যন্তরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ চঞ্চল পদবিক্ষেপে পায়চারী করছেন।

কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর পাশে : রাণী-মা!

বিচলিত হবেন না, শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করবো।

কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত ৫০ জন অশ্বারোহীও আজ মৃত। চারিদিকে বিশৃংখলা। উন্মত্ত ফিরিংগীরা এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গদ্বার অতিক্রম করলো।

শুনুন আর্য! আমি দুর্গ ছেড়ে পালাব মনস্থ করেছি। এই নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি আমি কোন মতেই মাথা পেতে নিতে পারবো না। এখান হতে পালিয়ে আমি নানা ভাইয়ের ওখানে যাবো।

কিন্তু কি করে পালাবেন রাণী-মা? চারি পাশে শত্রুসৈন্য পথ আগলে রয়েছে।

অসিমুখে পথ পরিষ্কার করে নিতে লক্ষ্মী জানে!

পিতা মোরোপন্ত তাম্বে এলেন : কি করবে মা স্থির করলে?

প্রস্তুত হন পিতা, দুর্গত্যাগই স্থির করেছি। সংগে আপনি, দামোদর ও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর যাবে।

* * *

৪ঠা এপ্রিল।

অন্ধকার রাত্রি।

আকাশে শুধু অগণিত তারকা।

দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে জ্বলছে আগুন লেলিহান শিখায়, রাতের কালো আকাশ লালে লাল হয়ে গিয়েছে।

দুর্গ-ত্যাগের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত।

এখনও ফিরিংগী সৈন্য দুর্গদ্বার অতিক্রম করতে পারেনি।

*   *   *

ঝাঁসীর রাজলক্ষ্মী।

কোথায় সে নারী-সুলভ কমনীয়তা ও লজ্জারুণিমা।

সংবদ্ধ বেণী, পৃষ্ঠে লম্বমান।

পরিধানে সালোয়ার, বক্ষে বক্ষাবরণ লৌহ বর্ম, কটিদেশে লম্বমান তীক্ষ্ণ তরবারী।

মস্তকে রেশমী পাগড়ী।

পৃষ্ঠে শক্ত করে বাঁধা তার প্রাণাধিক প্রিয় দত্তক সন্তান বালক দামোদর রাও।

অশ্বে আরোহণ করলেন রাণী লক্ষ্মী।

সুশিক্ষিত অশ্ব সামান্য ইংগীতে নিঃশব্দে লম্ফ দিয়ে দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে গেল।

পশ্চাতে অনুচরবৃন্দ।

দুর্গ হ'তে লক্ষ্মীর পলায়ন-বার্তা ফিরিংগীদের মধ্যে পৌঁছাতে দেরী হলো না। হিউ রোজ তরুণ অফিসার লেঃ বৌকারকে ডেকে আদেশ দেয়ঃ রাণী পলাতকা। এখুনি তার অনুসরণ করো। জীবিত বা মৃত সেই বিদ্রোহিণী রাণীকে বন্দী করে আনবে।

ছুটে মুহূর্তে ফিরিংগী সৈন্য কতিপয় অশ্ব পৃষ্ঠে।

কিন্তু দীর্ঘ একুশ মাইল পথ অনুসরণ করে বৌকার দেখলেনঃ ঐ দূরে বেগবান অশ্ব হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে।

উড়ছে পথের ধূলি পশ্চাতে ধূম্রজাল রচনা করে।

কাছাকাছি আসতেই দু'পক্ষে হয় যুদ্ধ সুরু।

মোরোপন্ত জংঘাদেশে আহত হয়ে রুধির স্রাবে ক্লান্ত হয়ে ধরা পড়লেন, কিন্তু রাণীকে ধরা গেল না, বিদ্যুদ্ গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে রাণী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

*   *   *

এদিকে ঝাঁসী নগর ও দুর্গ ফিরিংগীদের হস্তগত।

ভয়াবহ নৃশংস হত্যা লুঠ ও অগ্নিদাহ চলেছে সর্বত্র বেপরোয়া।

অসহায়ের আর্ত কোলাহলে আকাশ ও বাতাস ভরে গেছে।

নগর ও প্রাসাদ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হলো।

*　*　পশ্চাতে পড়ে থাক্‌ অগ্নিদগ্ধ ঝাঁসী। ওদিকে আর ফিরে তাকাবো না। জলুক ঝাঁসী, দিন আসবে, তখন আবার এসে অগ্নিদগ্ধ ঝাঁসীর মাটির বুকে নতুন করে প্রাসাদ গড়ে তুলব। আর ত' সময় নেই, বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে যে পথের মধ্যে আমরা ফেলে এসেছি।

রাণী! আমাদের ঝাঁসীর রাণী! প্রায় একশত বৎসর পার হয়ে যেতে চলেছে, তবু তোমায় কি ভুলতে পেরেছি! আশায় আশায় দিন গুনছি কবে আবার তুমি ফিরে আসবে! অশ্বপৃষ্ঠে, অসিহস্তে এলায়িত-কুন্তলা বীরঙ্গনা!

প্রণাম তোমায় জননী! প্রণাম!

ঘরে ঘরে জননীরা তোমারই মত কন্যা কামনায় তপস্যা করবে, যারা সুখের দিনে স্বামীন ঘর আলো করে থাকবে নিরন্তর কল্যাণ কামনায়। ঘরে ঘরে জ্বালাবে শান্তির স্বর্ণ প্রদীপ, আঁকবে মঙ্গল আল্পনা দুয়ারে দুয়ারে আবার প্রয়োজনের দিনে তারাই অকুতোভয়ে মুক্ত অসি হস্তে বীরাঙ্গনারূপে আত্মদানে, রক্ত দানে নৃমুণ্ড মালিনী শক্তিরই আধাঁর তারা প্রমাণ করবে।

*　*　কাল্পী!

শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তখন কাল্পীতে অবস্থান করছেন।

ধূলি-ধূসরিত ক্লান্ত অশ্বারূঢ়া রাণী এসে ওদের শিবিরের সম্মুখে দাঁড়াল।

শ্রীমন্ত দ্রুতপদে এগিয়ে এসে সাদরে আহ্বান জানালেন বাল্যসংগিনীকে: এসো লক্ষ্মী!

নতুন করে আবার যুদ্ধের আয়োজন হলো সুরু।

তাঁতিয়ার 'পরে এবারে ন্যস্ত সৈন্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব।

*　*　কুঁচ নগর: কাল্পী হতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরবর্তী।

শ্বেতাঙ্গ হিউ রোজের সৈন্য বাহিনীর সংগে যুদ্ধ সুরু হলো এদের সৈন্য বাহিনীর আবার। তাঁতিয়ার মতিভ্রম ঘটলো, রাণীর কোন পরামর্শই সে নিলে না। ফলে ফিরিংগীদের হাতে ঘটলো তাদের এবারে পরাজয়।

তাঁতিয়া পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

*　*　দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো কাল্পীর ছয় মাইল দূরে যমুনা তীরে, এবারেও তাঁতিয়া রাণীর আদেশ অগ্রাহ্য করলো, মাত্র আড়াইশত অশ্বারোহীর পরিচালনা ভার রাণীর হাতে, যমুনা রক্ষার ভার রাণীর 'পরে ন্যস্ত, বিদ্যুৎ শিখার মত অশ্ব

পরিচালনা করে, মুক্তবেণী বীরাঙ্গনা উন্মুক্ত অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র বিরাজ করতে লাগলেন !

কিন্তু এবারেও রাও সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতায় রাণীকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগে বাধ্য হতে হলো।

রাণী এলেন গোপালপুরে।

শ্রীমন্ত নানাও তখন গোপালপুরে, রাও সাহেবও পলায়ন করে এসেছিল গোপালপুরেই।

এখন উপায় ?

একমাত্র পথ এখন আমাদের সম্মুখে, রাণী বলেন, গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করে সেখান হতে যুদ্ধ করা, দুর্গ ভিন্ন ফিরিংগীদের সংগে যুদ্ধ অসম্ভব।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে লক্ষ্মী! মহারাজা জয়াজী রাও শিন্দে ফিরিংগীদের তাঁবেদার, তার মন্ত্রী দিনকর রাও-ও ইংরাজ-পদলেহী, এছাড়া দুরারোহ পর্বতের 'পরে অবস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গ।

তার জন্য কোন চিন্তা নেই রাও সাহেব, বুদ্ধির চালে আমরা দুর্গ অধিকার করবো : রাণী আশ্বাস দিলেন।

অতএব গোপালপুর ত্যাগই স্থির হলো।

এসংবাদ গোয়ালিয়রে পৌছতে দেরী হলো না। দিনকর ইংরাজের সংগে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান সুরু করে দিল।

সে বললে, মহারাজ বিচলিত হবেন না। ইংরাজ শিবিরে সংবাদ পাঠিয়েছি।

কিন্তু ইংরাজের সাহায্য এসে পৌছবার আগেই যে এরা এসে পড়বে মন্ত্রী !

তারও উপায় চিন্তা করেছি, আপাতত ওদের আক্রমণ না করে, কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহারাজ শিন্দে মন্ত্রীর পরামর্শে সন্তুষ্ট হতে পারে না। দেরী করা সংগত হবে না ভেবে সে সসৈন্যে মেবারের দুই মাইল পূর্বে রাত্রি প্রভাতের সংগে সংগে গিয়ে উপস্থিত হয়।

বেলা সাতটার সময় গোলাবৃষ্টি সুরু করে শিন্দে।

কিন্তু বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীর সৈন্য পরিচালনায় মুহূর্তে শিন্দের সৈন্য বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করতে পথ পায় না।

এদিকে শিন্দের বহু সৈন্য এ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাও সাহেবের সৈন্যদের সংগে হাত মিলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অনেকে গিয়ে মুক্তি সংগ্রামীদের সংগে যোগও দিল।

এদিকে বেগতিক দেখে শিন্দে প্রাণপণে আগ্রার দিকে অশ্বকে ধাবিত করলে।

রণ-কৌশলে লক্ষ্মী হলেন বিজয়ী।

স্বপ্ন তার বুঝি এতদিনে সফল হতে চললো।

বিজয় উল্লাসে রাও সাহেব নগরে প্রবেশ করলেন।

* * *

অপরিণামদর্শী রাও সাহেব এই সংকট মুহূর্তে ক্ষণিক আশার আনন্দে শিথিলতা প্রকাশ করলেন।

দশহরা পর্ব সমুপস্থিত।

সৈনিকদের শৃংখলা সাধন না করে নির্বুদ্ধি রাও সাহেব উৎসবে মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

এদিকে ঐ সুযোগে স্বয়ং হিউ রোজ মহারাজকে গোয়ালিয়রে আসতে সংবাদ প্রেরণ করে নিজে সসৈন্যে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করলে।

গোয়ালিয়রে এসংবাদ পৌছতে বিলম্ব হলো না, কিন্তু তবু রাও সাহেবের সম্বিৎ হলো না।

রাণীর পুনঃ পুনঃ সতর্ক বাণী সত্ত্বেও তিনি উৎসব নিয়েই মেতে রইলেন।

কেবল মাত্র তাঁতিয়াকে সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দিলেন।

তাঁতিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজ সেনাপতির পথরোধ করতে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু ফিরিঙ্গীর বিরাট সৈন্যবাহিনীর কাছে তাঁতিয়া পরাজিত হলেন।

রাণী রাও সাহেবের অব্যবস্থিততায় পূর্বেই নিরতিশয় বিরক্ত ও ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, তিনি রাও সাহেবকে ডেকে বললেন: কূলে এসে আপনি তরী ডোবালেন রাও সাহেব! কর্তব্য কর্ম অবহেলা করে আমোদ-প্রমোদে রত থেকে, সব নষ্ট করলেন আপনি। কিন্তু আর দেরী করবেন না। ফিরিংগী সৈন্য সমাগত প্রায়, এখুনি সৈন্যদের সজ্জিত করুন। সম্মুখ-যুদ্ধ ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই।

তাঁতিয়াও সম্মত হলেন রাণীর প্রস্তাবে।

আবার বীরাঙ্গনা পুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন সৈন্যের পুরভাগে।

গোয়ালিয়র দুর্গের পূর্ব ভাগ রক্ষার ভার তারই পরে ন্যস্ত হয়েছে।

১৭ই ও ১৮ই জুন রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী ভূখণ্ড ফুলবাগানে রাও সাহেবের সৈন্যদের সংগে ফিরিংগী বাহিনীর যুদ্ধ হলো ; রাণী সারা দিন সৈন্যপরিচালনা করলেন স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে থেকে অক্লান্ত ভাবে।

কিন্তু জয়ের আশা সুদূরপরাহত!

অগত্যা রাণী তার কতিপয় সহচর নিয়ে রণস্থল ত্যাগ করাই সমীচীন বোধ করলেন।

রাণীর অশ্বও নিরতিশয় ক্লান্ত। কিন্তু ওদিকে ফিরিঙ্গীর সৈন্যবাহিনী এসে গেল।

অশ্বপৃষ্ঠে রাণী ছুটেছেন, সহসা কানে এলো কার আর্ত চিৎকার: মরলাম, কে আছ কোথায় বাঁচাও।

বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ আর্তনাদ।

চকিতে রাণী পশ্চাতে অবলোকন করে দেখ্‌লেন, তার প্রিয় সহচরী মুন্দরা একজন ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্তা হয়ে প্রাণভয়ে চিৎকার করছে।

বিদ্যুদ্‌বেগে রাণী অশ্ববল্গা টেনে ধরে অশ্বের গতি রোধ করলেন।

ঝলকি উঠ্‌লো রাণীর হাতের তীক্ষ্ণ অসি এবং ইংরাজ অশ্বারোহীর মস্তক চ্যুত হলো। মুন্দরাকে রক্ষা করে আবার রাণী অগ্রসর হলেন সম্মুখের দিকে।

সামনেই সংকীর্ণ খাল।

খাল উত্তীর্ণ হবার জন্য অশ্বকে ইংগীত করেন, কিন্তু ক্লান্ত অশ্ব এগোয় না।

ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করে একেবারে নিকটে এসে পড়েছে।

অসিহস্তে রাণী ফিরে দাঁড়ান। আর উপায় নেই। অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতীর্ণ হলেন রাণী এবং সুরু হলো অসি-যুদ্ধ মুখো মুখী সংগ্রাম।

অপূর্ব সে অসি-যুদ্ধ।

একদিকে সুশিক্ষিত ইংরাজ, অন্যদিকে একজন ভারতীয় কুলললনা।

পৃথিবীর ইতিহাসে কত শত যুদ্ধ-কাহিনী লিখিত হয়েছে যুগে যুগে কিন্তু এযুদ্ধের তুলনা কোথায়?

১৮৫৭র রক্ত বিপ্লবের রক্তক্ষরা ইতিবৃত্তের পাতায় রক্ত দিয়েই লেখা রইলো এই অপূর্ব অসিযুদ্ধের কাহিনী সেত মুছে যাবার নয়।

আক্রমণকারীর তীক্ষ্ণ অসি সহসা এসে ক্লান্ত অবসন্ন রাণীর বক্ষঃস্থলে আঘাত হানে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে এল।

মৃত্যু সন্নিকটে তবু আহত ব্যাঘ্রীর মতই রাণী মুহূর্তে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে ইংরাজ সৈন্যকে দ্বিখণ্ডিত করে নিজে ধরাশায়ী হলেন।

ছোট একটি পর্ণকুটীর।

অন্তিম শয়নে শায়িতা রক্তাপ্লুতা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী।

কুটীর-স্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পার্শ্বে উপবিষ্ঠ আর কোথায়ও কেউ নেই।

বড় পিপাসা একটু জল : ক্ষীণ অন্তিম কণ্ঠ।

গঙ্গাধর পবিত্র গঙ্গোদক এনে দিলেন : এই নাও মা জল।

আঃ গঙ্গাধর ! কই বাবাজী তুমি কোথায় ?

এই যে মা আমি।

অশ্রুপ্লুত আঁখির দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে : মেরী ঝাঁসী !...

একে একে লাগিল নিভিতে

দীপালোকমালা।

* * * বিপ্লবের মহাগ্নিশিখা সত্যিই কি নির্বাপিত হয়ে এল ?

১৮৫৭র রক্ত-প্রচেষ্টা কি এইখানেই এমনি ভাবে পরিসমাপ্ত হবে ?

এমনি করেই কি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

কিন্তু কোথায় সেই দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর সেনানায়ক তাঁতিয়া ?

ঝালোয়ারের রাজধানী ঝালরপত্তন।

তাঁতিয়া তখন সেখানে।

প্রসিদ্ধ জালিমসিংহের বংশধর পৃথ্বীসিংহ ঝালরপত্তনের সিংহাসনে তখন।

পৃথ্বসিংহ কাপুরুষ, ইংরাজ-পদলেহী। সে তৎপর হয়ে উঠে তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করতে।

কিন্তু অধিনস্থ সৈন্তরা চায় তাঁতিয়ার পক্ষ সমর্থন করতে।

সব এসে মিলিত হলো তাঁতিয়ার সংগে।

তাঁতিয়া রাণার প্রাসাদ অবরোধ করলেন।

পরদিন রাণার সংগে সাক্ষাৎ হলো : রাণা, কেন পরদেশীর পদলেহন করছেন, আসুন, আমরা একত্র হয়ে পরদেশীকে দূর করে দিই আমাদের জন্মভূমি হতে চিরতরে ; মুক্ত করি আমাদের জননী জন্মভূমিকে।

বেশ, আমি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা যুদ্ধ যুদ্ধ-সাহায্যে দিতে পারি।

পাঁচ লক্ষ মুদ্রা কতটুকু, অন্তত পঁচিশ লক্ষ টাকা পেলেও কোন মতে এই সুবিপুল যুদ্ধভার বহন করা যেতে পারে।

অবশেষে রাণা অনেক তর্কাতর্কির পর পনের লক্ষ পর্যন্ত টাকা দিতে রাজী হলেন, এবং পাঁচ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিলেন।

কিন্তু রাণা ঐ রাত্রেই গোপনে রাজধানী ত্যাগ করে মৌ'তে প্রস্থান করলেন।

পাঁচ দিন ঝালরপত্তনে কাটিয়ে তাঁতিয়া বর্ষাসমাগম আসন্ন দেখে, রাও সাহেব প্রভৃতির পরামর্শে ইন্দোরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে কিন্তু ইংরাজ বাহিনী তাঁতিয়ার পিছু পিছুই আসছে।

পথে নালকেরা, রাজগড়, নরবর, শিরোঞ্জ পড়ল। সেখান হতে ললতপুর।

এদিকে হাতের সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত, সৈন্যদের মাহিয়ানা বাকী পড়েছে।

তাদের মধ্যে অসন্তোষের ধোঁয়া দেখা দিচ্ছে ক্রমে ক্রমে!

সংগের সাথীরা একে একে এই মুক্তিকামী সেনানায়ককে ত্যাগ করে গিয়েছে। আর কোন আশাই নেই। সব আশার শেষ!

হৃত-সর্বস্ব ভগ্ন-মনোরথ মহারাষ্ট্রীর সেনানায়ক সব ত্যাগ করে মনের দুঃখে গিয়ে পারনের নিবিড় অরন্যে আত্ম-গোপন করলেন।

সহসা একদিন সেই অরণ্য মধ্যে পুরাতন বন্ধু মানসিংহের সংগে সাক্ষাৎ হলো।

আপনি একা দেখছি, কিন্তু সংগের সৈন্যদের ছেড়ে দিলেন কেন?

সে দুঃখের কাহিনী আর নাই বা শুনলেন। আজ হয়ত সত্যিই পরিশ্রান্ত আমি। এখন ভালই করি, মন্দই করি, আপনার সংগেই জীবনের শেষ কয়টা দিন থাকবো স্থির করেছি।

কিন্তু হায় পরিশ্রান্ত হৃত-সর্বস্ব মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন, তিনি জানতেন না, সে ফিরিংগীদেরই একজন গুপ্তচর মাত্র, বন্ধুকবেশী-শত্রু।

গোপনে মানসিংহ ইংরাজ সেনানায়ক মীডের নিকট সংবাদ প্রেরণ করলেন: পলাতক তাঁতিয়ার সন্ধান মিলেছে। এই সুযোগে শীঘ্র দেখা করুন আমার সংগে।

৭ই এপ্রিল। গভীর নিশীথে তাঁতিয়া যখন নিঃশংকচিত্তে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ইংরাজ সেনাপতি মিড্ তাঁতিয়ার বন্ধুরূপী শয়তান মানসিংহের চেষ্টায় বীরেন্দ্রকেশরীকে শৃংখলিত করলে।

১৮৫৭র শেষ আশার আলোটুকুও নির্বাপিত হলো, বিশ্বাসঘাতকতার বিষ-ফুৎকারে।

১৮৫৯ : ১৮ই এপ্রিল সাপ্রিতে তাঁতিয়ার ফাঁসী হলো, ইংরাজের বিচারে।

ইংরাজের বিচারে তাঁতিয়া দোষী! তাই তাকে ফাঁসী দেওয়া হলো। যে বীর-শ্রেষ্ঠ একদা প্রৌঢ় বয়সেও বারংবার রাজপুতনা ও মালব ঘুরে বেড়িয়েছেন, অসীম কৌশলে বারংবার ইংরেজ সৈন্যদের পরাভূত ও পর্যুদস্ত করেছেন, যাহার বীরত্ব-গাঁথা আজিও সারা ভারতের জনগণের বুকে আশার ও সাহসের উদ্দীপনা যোগায় তার মৃত্যু ত নেই। সে যে অবিনশ্বর, মৃত্যুহীন।

আর মৃত্যুহীন সেই ১৮৫৭র অগ্নিযজ্ঞের সর্বপ্রধান হোতা শ্রীমন্ত নানা সাহেব। ইংরাজের শত চেষ্টাও যাকে কোন দিন শৃংখলিত করতে পারেনি। ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে যার কোন সন্ধানই মেলেনি। তিনি সহসা একদিন ভারতের ভাগ্যাকাশে উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে এবং প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার মতই চারিদিক প্রজ্জ্বলিত করে, সহসা আবার কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে যে আত্মগোপন করলেন কেউ তা জানল না।

কিন্তু সত্যিই কি বিস্মৃতি!

সমগ্র স্মৃতি তবে তাঁকে প্রণতি জানায় কেন? কেন তবে উত্তর কালে ১৮৫৭র যে অগ্নিদাহ একদা বাংলার একপ্রান্তে সেনা-নিবাসে জ্বলে উঠেছিল, শহীদ মংগল পাঁড়ের ফাঁসীর দড়িতে দোদুল্যমান নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি লোমকূপ হ'তে, এবং ক্রমে যে অগ্নি মীরাট, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বারানসী, অযোধ্যা, ঝান্সী, পাটনায় ছড়িয়ে গেল যে, সে অগ্নি আর কোন দিনও নিভল না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত কখনো ধিকি ধিকি, কখনো আবার প্রজ্জ্বলিত পাবক-শিখার মতই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ভারতের আকাশ-বাতাস অরুণাভ করে তুলেছে উত্তরকালে বারংবার।

অক্লান্ত-কর্মী ফিরিঙ্গী প্রতিনিধির দল যখন কোন মতেই শ্রীমন্ত নানাকে খুঁজে পেলে না, তখন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একের পর এক আঠার জন নির্দোষীকে নানা সাহেবের নামে অকুণ্ঠিত চিত্তে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধও করেনি।

ফিরিঙ্গীর সন্দেহ তালিকা-ভুক্ত ফাঁসীর আসামী অষ্টাদশ নানা মৃত্যুর পূর্বে সখেদে বলেছিলেন : মরণে কোন খেদ নেই, তবে ফিরিঙ্গী প্রতিনিধির কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ, এই যেন শেষ নানাসাহেব হন। আর যেন কোন নির্দোষীকে ফাঁসীয় দড়িতে না ঝোলান হয় এ প্রহসনের যেন এখানেই হয় শেষ।

আজিমউল্লা খাঁকেও ইংরাজের নাগপাশ বাঁধতে পারেনি কোন দিন। চির মুক্ত, চির স্বাধীন! সাধ্য কি কেউ তাদের কেশ স্পর্শ করে!

১০ই মে ১৮৫৭র অগ্নিদাহ নির্বাপিত হলো ১৮৫৮র মে মাসে।

ভারতে ফিরিঙ্গীর পর-রাজ্য গ্রহণের দুর্বার লোভ, পরকীয় স্বত্বের উচ্ছেদ প্রচেষ্টার ও অসংযত ব্যবহার ও নানাবিধ অত্যাচারের মাশুল তাদের কড়ায় গণ্ডায় না হলেও কিছুটা শোধ করতে হয়েছিল।

লাভ লোকসানের খতিয়ানে হয়ত সেদিন তারা জিতেছিল, কিন্তু ১৮৫৭র বিপ্লব নেশাগ্রস্ত ঘুমিয়ে পড়া জাতির একশত বৎসরের ঘুম-জড়িমায় প্রবল নাড়া যে দিয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সেদিন ত কারও দ্বিমত ছিলই না, আজিও হয়ত নেই।

বণিকের ছদ্মবেশে যে জাতি একদিন আমাদের দেশদ্রোহিতা ও দলাদলির অন্ধ-গলিপথে এসে আমাদের সিংহাসন-চ্যুত করে কোম্পানীর রাজ্য বিস্তার করেছিল, দীর্ঘ একশত বৎসর পর তার আবার রূপ বদলাল, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮র ২রা অক্টোবর একান্ত দয়াপরবশ (?) হ'য়ে এক ঘোষণাপত্র বের করে রাজ্যভার স্বহস্তে নিলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে নতুন করে আবার মেঘ সঞ্চারের ইংগিত দেখা দিল পাকাপোক্ত ভাবে।

—দুই—

আবার ফিরে তাকাই সেই আঠারো শতকের মধ্য পর্বে, অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতের দিকে।

দিল্লীর মুঘোল বাদশাহী গৌরব মলিন হয়ে এসেছে। সাম্রাজ্যের শক্তি বহুদিন হ'তেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল।

সেই পুরাতন বেদনাক্লিষ্ট কাহিনী : ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের মাটিতে যখন প্রভুত্বের শিকড় গেড়ে বসেছে।

সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার প্রায় সবগুলিই নবশক্তির নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, পর্যুদস্ত।

কিন্তু ভারতবাসী এ দাসত্ব সেদিন মেনে নিতে রাজী হয়নি, নির্বিচারে : লৌহ কঠিন হস্তে নবজাগ্রত রাজশক্তি চেয়েছিল দাসত্বকে কায়েমী করতে।

ফিরিঙ্গীরা যখন এদেশে এসে বাণিজ্য সুরু করে, মুসলমানের হাতেই ছিল রাজ্য-শাসন ভার, এবং সেই মুসলমান রাজশক্তি ক্রমে দুর্বল ও অশক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই, ফিরিঙ্গী বণিক এদেশে রাজ্য স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল।

তাই হয়ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল মুসলমানদের মধ্যেই প্রথম : ওহাবী বিদ্রোহ। ঐ বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় যারা সেদিন হয়েছিলেন, তাঁরা তদানীন্তন মুসলিম-ভারতের অন্যতম আধ্যাত্মিক গোষ্ঠির কয়েক জনকে নিয়ে।

সেদিনকার সে বিদ্রোহের মূলে মুসলিম-ভারতের কয়েকজন ধর্ম সংস্কারকই নেতৃত্বভার নিয়েছিলেন বলেই যেন আমরা না মনে করি যে, এর মূলে ছিল কেবল ধর্মের গোঁড়ামীই বা ধর্মান্দোলন।

যদিও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মান্ধ ভারতবাসী চিরদিনই ধর্মের নামে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, তথাপি ওহাবী আন্দোলনের মূল সত্যকে আজ কেবলমাত্র ধর্মের গোঁড়ামী বলেই অস্বীকার করলে চলবে না।

রাজনৈতিক পরাজয় ও রাজ-ক্ষমতাকে হারাবার বেদনা ও তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থাই হয়ত সেদিন এই বিদ্রোহের মূলকে আঁকড়ে ছিল, এবং ধর্মের লাগাম ধরে বিদ্রোহীরা ঐ দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চেয়েছিল। কারণ

ধর্মান্ধ ভারত-বাসীকে ধর্মের চাবুক হেনে যত সহজে বিচলিত করা যেতো, তত আর হয়ত কিছুর দ্বারাই সম্ভব হতো না।

ভারতে ফিরিংগী শক্তির পত্তনের সংগে সংগে যত খণ্ড খণ্ড বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, ওহাবী আন্দোলন সেই বহু বিপ্লব আন্দোলনেরই একটি অংশ মাত্র।

সে যাই হোক, 'ওহাবী' কথাটা মোটেই এদেশীয় নয়, যদিচ ঐ শব্দটিকে কেন্দ্র করে ভারতে তথা বাংলার মাটিতে একদিন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বিশেষ করে তদানীন্তন একদল আচার নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ মুসলমান যাদের বলা হোত 'ফরাজী' বা 'ফেরাজী' বঙ্গদেশে তারাই ছিল ওহাবী।

সুদূর আরব দেশে প্রথমে সুরু হয় এই ওহাবী আন্দোলন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আবির্ভাব হয় নাম তাঁর আবদুল ওহাব। তিনিই ঐ আন্দোলনের প্রবর্তক।

তুর্কীর অধীনে অবস্থান কালে আরব জাতির মধ্যে নানা দিক দিয়েই অবনতি দেখা দেয়। সাধারণ মুসলমানগণ ইস্‌লাম ধর্মের সত্য মূল তত্ত্বটি বিস্মৃত হ'য়ে বাহ্যিক কতকগুলো সামান্য আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মত্ত হ'য়ে ওঠে। ধর্ম-পরায়ণ আব্দুল ওহাব জাতির ঐ আবর্জনা দূর করে মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত খাঁটি ইসলাম ধর্মের পুনঃ প্রবর্তনের জন্য তৎপর হয়ে উঠ্‌লেন। আরব সমাজের লোকেরা দেখতে দেখতে তার অনুগত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। এবং ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হ'তে মুসলমানগণ আরবে যেতেন তীর্থ করতে এবং ক্রমে তীর্থযাত্রীদের মধ্য দিয়েই ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ আন্দোলন।

ভারতে এই আন্দোলনের স্রষ্টা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভি, ১৭৮৬ খৃঃ মহরম মাসে রায়বেরিলীতে তাঁর জন্ম।

কিশোর বয়সেই সৈয়দের মনে সৈনিক হবার স্পৃহা জেগে উঠে। সুরু করেন তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে। উত্তর-ভারতে ইংরাজ রাজত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

কিশোর সৈনিকের যোগাযোগ ঘট্‌লো দুর্ধর্ষ পিণ্ডারীদের সংগে। কিশোর বালক হয়ে উঠে দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা! ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্বপ্রথম পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

ভারতের অন্তর্গত পাঞ্জাবে তখন শিখ রাজ্য তথা হিন্দু প্রভুত্ব গড়ে উঠ্‌ছে।

যার ফলে সৈয়দের জীবনে দেখা দেয় এক পরিবর্তন—সৈয়দ ধর্মসংস্কারে অনুরাগী হ'য়ে উঠ্লেন। সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইস্লাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে সৈয়দ একদিকে যেমন পণ্ডিত ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মুসলীম সমাজে সমর্থন লাভ করলেন অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানেরাও তার অনুগত হ'য়ে উঠ্তে লাগল। ফলে যখন যেখানে তিনি গমন করতেন বিখ্যাত মৌলানারা তার সঙ্গে থেকে ভৃত্যের মত তাকে সেবা যত্ন করতেন। যাতে করে সাধারণ মুস্লীম সমাজও তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। ঈশ্বর এক এবং মুসলমান মাত্রেই সমান—সৈয়দ প্রচারিত ঐ দু'টি কথা যেন মন্ত্রের মতই মুসলমান জন সাধারনের চিত্ত অনায়াসেই জয় করে নিল। যখন যেখানে তিনি গমন করতে লাগলেন দলে দলে স্থানীয় লোকেরা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। সৈয়দ সর্বত্র উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকদের তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে লাগলেন। পাটনায় তার ধর্মপ্রচারের জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেখানে তদীয় নিযুক্ত চারজন খলিফার মধ্যে ইনায়েৎ ও বিলায়েৎ আলির নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। পাটনা হ'তে সৈয়দ কলকাতায় এলেন এখানেও তার বিস্তর শিষ্য হলো।

১৮২০-২২ খৃঃ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়ালেন সৈয়দ।

তারপর মক্কায় তীর্থ করতে গিয়ে 'ওহাবী'দের সংস্পর্শে এলেন, এবং ওহাবী দলভুক্ত হয়ে গেলেন। এতকাল সৈয়দের মন ছিল ধর্ম সংস্কারেই। ওহাবী মতবাদে অনুপ্রানিত হয়ে তার সর্বপ্রথম মনে হলো ধর্ম-রাজ্য স্থাপিত না হলে বিশুদ্ধ ইস্লাম ধর্মের প্রবর্তন স্বপ্নে মাত্র পর্যবসিত হবে। অতএব সর্বপ্রথমে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা চাই। বোম্বাইয়ের পথে সৈয়দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবং ওহাবী মতবাদের প্রচারোদ্দেশে ১৮২৪ খৃঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে মিশে গিয়ে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে, মুসলমান প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেন।

১৮২৭ হ'তে শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলে ওয়াহাবীদের আক্রমণ হলো সুরু।

বহু খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে ১৮৩১ সনে সৈয়দ একজন শিখের গুলিতে নিহত হলেন। সৈয়দ নিহত হওয়া সত্বেও তার প্রধান শিষ্যেরা চতুর্দিকে সংবাদ প্রচার করতে লাগল যে, সৈয়দ আহামদের মৃত্যু হয়নি। সব কিছু শত্রুর রটনা। তিনি এখনো জিবীত। গুপ্তভাবে বিচরণ করছেন এবং তার অনুগতের দল তার নির্দেশ মত কার্য করে যেতে পারলেই আবার

একদিন তিনি সশরীরে সকলের সম্মুখে এসে দেখা দেবেন। নিরীহ মুসলমান জনসাধারণ ঐ কথায় বিশ্বাস করে আগের চাইতেও অধিকতর ধন জন দিয়ে সৈয়দ পরিকল্পিত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তার কর্মীসঙ্ঘকে নানাভাবে সহায়তা করতে লাগল। নিভৃত পর্বত প্রদেশে সিতানায় ওহাবীদের দুর্গ স্থাপিত হলো। পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে হ'তে লাগল রসদ সংগৃহীত।

এদিকে সমগ্র উত্তর ভারতে সৈয়দ যখন নিজ মতবাদ প্রচার করে চলেছেন এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশায় বাঙলা দেশে সরিয়তুল্লা নামে অন্য একজন মুসলমান অনুরূপ মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। সরিয়ত ছিলেন ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামের অধিবাসী। তিনিও মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন। এবং তার অন্ধ ইস্‌লাম প্রীতি ক্রমে তাকে হিন্দু বিরোধী করে তোলে। ইংরাজ প্রভুত্ব তার কার্যের অন্তরায় বোধ করায় তিনি তার প্রতি-বিধান কল্পে ইংরাজের বিরুদ্ধেই তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। সরিয়তের পরে তার পুত্র দুদুমিয়াও পিতার অনুসৃত পথে অগ্রসর হন।

সৈয়দ আহামদের প্রবর্তিত 'ওহাবী' আন্দোলন যে সহসা ভারতে শিকড় গেড়ে বসেছিল তার মূলে ছিল সরিয়ৎ ও তদীয় পুত্র দুদুমিয়ার কার্যসমূহ ও তৎপরতা।

কিন্তু সত্যিকারের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' বাংলা দেশেই সুরু হয়েছিল।

কারণ মনে পড়েছে আজ মৌলভী সরিয়ত্ উল্লাহ্‌কে, যার নেতৃত্বে সুরু হয়েছিল সর্বপ্রথম এই বাংলাদেশেই অষ্টাদশ শতকের জন-জাগরণ।

দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ওহাবী-পন্থীরাই সর্বপ্রথম বয়ে আনলে নব আশার বাণী। ধর্মের নামে হলেও আসলে আর্থিক উন্নয়নের।

দেখতে দেখতে অগ্নি-শিখা বাংলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল : চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর, নদীয়া···

এলো ১৮৩১ সাল : ১০৫৭রও আগের কথা : সবে অধিষ্ঠিত ইংরাজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

ওহাবী! ওহাবী!..প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে।

সহস্র সহস্র অশিক্ষিত নিপীড়িত কৃষক নিয়েছে আজ মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের শপথ! ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাই।

অবসান! হাঁ, অবসান চাই! কিন্তু সে অগ্নিগর্ভ কণ্ঠস্বর ভোলেনি ভারত! ভোলেনি তোমাকে আজিও হে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর!

সাধারণ একজন মুসলমান কৃষক

তিতু মীর বা তিতু মিঞা।

ভারতে গণ-বিপ্লবের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় শহীদ।

১৭৮২ খৃঃ। ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার চলেছে তখনও ভারতের দিক হতে দিকে, ক্রমে দাসত্বের ক্লেদাক্ত বেষ্টনীতে নির্জীব শক্তিহীন হয়ে চলেছে ভারতবাসী। এমনি সময়ে ২৪ পরগণার হৃদয়পুর গ্রামে এক শিশু জন্ম নিল।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে দেখা গেল ধর্মের প্রতি তার গভীর অনুরাগ।

শিক্ষার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই, তবু বালকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না মহীশূর-শার্দ্দুল টিপুর ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী, শাহ আলমের দুর্দশার কাহিনী। চঞ্চল হয়ে উঠে হৃদয়। নিস্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে।

কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পন করে তিতু। শান্ত, ধীর, অথচ গম্ভীর. ছোটখাটো এক জমিদার কন্তার পাণিগ্রহণ করায় অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দেয়, কিন্তু দেশের ডাক যার দু'কান ভরে বেজেছে, আরাম বিলাস তার কোথায়? কুস্তি, লাঠি, অসি শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে তিতু নদীয়ার এক জমিদারের বরকন্দাজ হলেন।

মারপিটের এক মামলায় জড়িয়ে পড়ে একবার কারাবাসও হলো।

কারামুক্তির পর তিতু চলে গেলেন দিল্লী এবং সেখান হ'তে বাদশা পরিবারের অন্তভূ ক্ত হয়ে গেলেন মক্কায় ১৮২৯ খৃঃ।

সেইখানেই হলো ওহাবী নেতা সৈয়দ আহম্মদের সংগে পরিচয়।

নতুন করে জেগে উঠলেন যেন তিতু যাদুর স্পর্শে রূপকথার কাহিনীর মত।

মক্কা তীর্থ সেরে বাংলার ছেলে তিতু আবার বাংলার মাটিতে ফিরে এলেন। বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন আচার ব্যবহারের বিশেষ কোন রীতিনীতি ছিল না। তিতু সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম-সংস্কারে মেতে উঠলেন এক নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে।

তীর্থ-প্রত্যাগত তিতুর তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধর্মীর (?) ব্যবহার সহ্য হলো না বলেই সত্য ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হলেন তিনি।

সমাজের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা কিন্তু তিতুর মত মেনে নিতে রাজী নয়।

সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়, জোলা, নিকারী, পলুয়া প্রভৃতি কিছু কিছু তার মতকে মেনে নিল।

তিতুর অনুশাসন ছিল (১) টাকা ধার দিয়ে কারুর স্থদ নেওয়া চলবে না। (২) বিবাহে বা কোন পর্যোপলক্ষে কোন বাদ্য বাজান চলবে না। (৩) প্রত্যেককে দাড়ী (নূর) রাখতে হবে। (৪) কাছা দিয়ে কাপড় পরবে না।

প্রতি রাত্রে তিতুর বাসগৃহে গোপন বৈঠক হয় স্থরু। তার শিষ্য ও অনুরাগী সম্প্রদায়ের অন্যান্য মুসলমানেরা ভীত হয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে দরবার করলে। কৃষ্ণদেব রায় তিতুর অনুরাগীদের ডেকে সাবধান করে দিলেন, এবং বললেন: তোমরা নিজেদের কাজকর্ম সেরে ধর্ম-কর্ম কর, আমার আপত্তি নেই। যদি তা না করে ধর্মের নামে অন্যের প্রতি অন্যায় জোরজুলুম কর, তাহলে প্রত্যেকের দাড়ি প্রতি ১।০ কর ধার্য করবো।

জমিদারের শাসনের ফলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ালো।

তিতু গর্জে উঠলো, বললে: ভাল কথায় বিধর্মীর দল না শোধরায় তা'হলে বলপ্রয়োগ স্থরু করো। যেমন করেই হোক ছলে বলে ওদের স্বমতে আনতেই হবে।

জমিদারের নিকট গিয়ে যারা নালিশ জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে খাসপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ছিলেন।

তার ঘরবাড়ী সব লুঠ হয়ে গেল সহসা এক রাত্রে।

এ ব্যাপারে তিতুর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, জমিদারকে জব্দ করা। খাসপুর লুণ্ঠন করে তিতুর অনুচরেরা পরদিন প্রাতে ইচ্ছামতী পার হ'য়ে পুঁড়া আক্রমণ করল।

পুঁড়াতে সেদিন কার্তিক পূর্ণিমার পর দিন বারোয়ারী পূজা হচ্ছে।

বারোয়ারী তলায় যাত্রা গান চলেছে: তিতুর দল আসছে সংবাদ পেয়ে, বারোয়ারী তলা ছেড়ে যে যে দিকে পারলে সব পালিয়ে গেল।

বেচারী পুরোহিত পূজা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পালাবার অবকাশ পেলো না।

তিতুর দল বারোয়ারী তলায় এসেই একটি গোহত্যা করলে।

এই জঘন্য ব্যাপারে পুরোহিত কিন্তু স্থির থাকতে পারল না, দেবীর খড়্গ নিয়ে রুখে দাঁড়ালো।

শক্তের ভক্ত নরমের যম। তিতু বেগতিক দেখে চম্পট দিল বারোয়ারী-তলা ছেড়ে।

বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তিতুর লুঠতরাজের সংবাদ গেল, বারাসত তখন একটি ভিন্ন জিলা, থানা ছিল 'কদম্বগাছিতে'।

ম্যাজিষ্ট্রেট কদম্বগাছির থানা ইন্‌চার্জকে তদন্তে পাঠালেন।

থানা ইন্‌চার্জ দারোগা বাবু জাতিতে ছিলেন চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। তিনি ১১০ জন বরকন্দাজ ও চৌকিদার নিয়ে তিতুকে ধরতে এলেন।

তিতুর লোক-বল তখন প্রায় ৫০০।৬০০। উভয় পক্ষে হলো যুদ্ধ।

দারোগা বাবু ও তার কয়েকজন অনুচর ঐ যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

দারোগা হত্যার পর তিতু ঘোষণা করলেন: আমিই এখন ভারতের অধীশ্বর।

গোবরডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদের নিকট তিতু কর চেয়ে পাঠালেন। এও বলে পাঠালেন, যদি তারা তিতুর আধিপত্য না স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের মাথা তিতুর দুপায় নজরানা করা হবে।

তিতুর এক পরামর্শদাতা ফকির ছিলেন। ফকির সাহেব বললেন: ঘাবড়াও মাৎ বেটা। ইংরাজের গোলাগুলি কিছুই নয়, সব আমি খেয়ে ফেলবো।

তিতু তখন বাঁশবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা তৈরী করলেন আত্মরক্ষার জন্য।

বাঁশবেড়িয়ার এক ঘন নিবিড় আম্রকাননের মধ্যে গড় কেটে, বাঁশের কেল্লা তৈরী করে তিতুর দরবার বসল।

সামান্য কৃষকের ছেলে হোল স্বাধীন রাজা।

চারিপাশে কঠিন প্রহরা।

অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে সড়কি, বল্লম, রামদা, টাংগী ইত্যাদি।

গ্রামের লোকেরা ভয় পেয়ে কেউ কেউ টাকীতে, আবার কেউ কেউ বা গোবরডাঙ্গায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

গোবরডাঙ্গার জমিদার তখন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ডাকসাইটে জমিদার।

তিতুর ক্রমবর্ধমান শক্তি অর্জ্জনের ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

কলিকাতার বিখ্যাত লাটুবাবু ও ছাতুবাবুদের নিকট হতে ২০০ হাবশী অনুচর চেয়ে পাঠালেন।

মোল্লাহাটীর কুঠির ম্যানেজার ছিলেন ডেভিস্ সাহেব, তারও অধীনে তখন প্রায় ২০০ শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা ছিল।

তারাও কালীপ্রসন্ন বাবুর পরামর্শে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

তিতুর নিকট এসকল সংবাদ গোপন ছিল না।

তিতুকে আগেই আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করবার জন্য ডেভিস্ লোকজন নিয়ে বজরায় করে এগিয়ে এলেন।

বাঁশচোড়ের কাছাকাছি বজরা থামতেই তিতু ডেভিসের বজরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ডেভিস্ কোনমতে প্রাণ হাতে করে পালালেন।

এরপর তিতু প্রায় ৫০০ অনুচর নিয়ে গোবিন্দপুর আক্রমণ করে।

গোবিন্দপুরের রায় মহাশয়ও আগে হতেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

এবারের যুদ্ধে তিতুই কিন্তু হেরে গিয়ে কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালাল নদীপথে।

তিতুর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়। অলৌকিক ভাবে তিতুকে প্রাণে বাঁচতে দেখে তার অনুচরেরা তাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলে মনে করতে লাগল। ঐ সঙ্গে নানা উপকথাও প্রচারিত হলো তিতু সম্পর্কে।

তিতুর দল ক্রমে ভারী হয়ে উঠ্‌তে লাগল। অনেকে এসে তিতুর দলে যোগ দিল।

দারোগা হত্যার রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সামান্য একজন কৃষককে দমন করা এমন কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার এই ভেবে কলকাতা হতে তিতুকে দমন করতে এক নাজীরের অধীনে কয়েক জন চৌকীদার, বরকন্দাজ, জন কয়েক রংরুট ও চারজন গোরা অশ্বারোহী এলো।

আর তিতুর দলে তখন প্রায় ১০০০ লোক সংঘবদ্ধ হয়েছে।

মুসলমান ধর্ম্মকে নতুন করে বলীয়ান করতে যারা একদা সংঘবদ্ধ হয়েছিল, আজ তাদের মনে দেখা দিল বুঝি ভিন্ন চিন্তা।

ধর্ম্মই বল আর যাই বল, কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে চাই ফিরিংগী বিতাড়ন এদেশ হ'তে।

যত দিন তারা এখানে রাজ্য শাসনের গদীতে বসে আছে, ততদিন কোন কিছুরই প্রাধান্য বা প্রচার তারা ক্ষমার চোখে দেখবে না!

অতএব!...

কলকাতা হতে প্রেরিত ছোটখাটো দলটি তিতুর দেশীয় অস্ত্রের মুখে বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গেল।

কলকাতায় যখন এসংবাদ এসে পৌছল, কর্তাদের টনক এবারে নড়ে উঠ্‌লো।

সামান্য একজন গেঁয়ো চাষা! এত বড় স্পর্ধা তার। সমূলে উৎপাটন করো!

পড়ে গেল সাজ সাজ রব।

১৮৩১ সন।

বিরাট বাহিনী এলো আধুনিক রণ-সাজে সজ্জিত হয়ে এক বিদ্রোহী কৃষকের দম্ভ চূর্ণ করতে।

১৯শে নভেম্বর।

রাত্রি শেষ হয়ে এল, পূর্বাকাশে উষার রক্তিম রাগ।

লেঃ ষ্টুয়ার্টের পরিচালনায় একদল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈনিক ও একদল গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব প্রেরিত লোকদের সংগে এসে অতর্কিতে তিতুর বাঁশের কেল্লাকে ঘিরে ফেললে।

কিন্তু ওহাবীরা এত সৈন্য সমাবেশ ও বিপুল সমরায়োজন দেখেও যেন কিছু মাত্র ভীত নয়, বরং এর আগের বার যে কয়জন বিপক্ষীয় ওদের হাতে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, সেই মৃত দেহগুলো বাঁশের কেল্লার সম্মুখে টাংগিয়ে দিল।

সুসভ্য ইংরাজ অফিসার লেঃ ষ্টুয়ার্ট সামান্য হাতিয়ার-হীন একদল চাষা-ভুষা গেঁয়ো লোকের সংগে সম্মুখ-যুদ্ধ করতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ করতে লাগল: একজন দূতকে পাঠালে, তিতুর কেল্লায়: আত্মসমর্পণ করো।

গেঁয়ো তিতু রাজনীতি জানবে কোথা হতে, দূত অবধ্য, তথাপি সে দূতকে হত্যা করে সগর্বে ঘোষণা করলে: যুদ্ধং দেহি!

লেঃ ষ্টুয়ার্টের দল তিতুর বাঁশের কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে কামান সাজিয়ে রেখেছিল! ফাঁকা তোপধ্বনি করা হলো!

কামান হ'তে যে ফাঁকা আওয়াজও করা যায় গেঁয়ো চাষাভুষারা তা' জানত না। তাই ওরা ভাবলে, কামান দাগান হলো, কিন্তু গোলা ছুটল না, এ নিশ্চয়ই ফকির সাহেবের কেরামতি। নিশ্চয়ই ফকির সাহেব কামানের গোলা গিলে খেয়ে ফেলেছেন।

সমস্বরে উল্লাসে সব চিৎকার করে উঠে: হুজরৎ নে গোলা খা ডালা।

সংগে সংগে সকলে কেল্লার বহির্দেশে এসে চতুষ্পার্শ্বের ইংরাজ সৈন্যের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইংরাজের সুবর্ণ সুযোগ।

লেঃ ষ্টুয়ার্ট হুকুম দিল: Fire!

ভীম রবে গর্জে উঠে ইংরাজের কামান। ভূমিসাৎ হলো তিতুর বাঁশের কেল্লা।

নিজেদের হঠকারিতার জন্যই তিতু প্রভৃতি কয়েকজন সর্দার ইংরাজের কামানের গোলায় প্রাণ দিল।

বাকী যারা বেঁচে ছিল, প্রায় ৩০০ শত জন বন্দী হলো ইংরাজের হাতে।

ইংরাজের আদালতে এদের প্রত্যেকেরই প্রাণ দণ্ড দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে তিতু মীরের মৃত্যুর পর বঙ্গের ওহাবী সমাজ প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি আর, তবে লুপ্তও হয়নি।

তিতু মীরের পর সরিয়াতুল্লার নেতৃত্বে ফরিদপুর ও ঢাকায় ১৮৩৭ সন নাগাদ বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়। প্রায় ১২০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ হ'য়ে নতুন এক সরা জারী করে নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি, কাছাখোলা, কটি দেশে চর্মের রজ্জু ভৈল করে চতুর্দিকস্থ হিন্দুদের বাড়ীতে চড়াও হ'য়ে দেব দেবীর পূজায় অশেষ ব্যাঘাত ঘটায়। সরিয়তের মত তদীয় পুত্র দুদুমিয়াও অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে ঢাকা ফরিদপুর ও বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে। ফরিদপুরে দুদুমিয়া ফরাজীদের গুরু ছিলো। সে ও তার অনুচরেরা স্থানীয় জমিদার ও কুঠিয়ালদের একেবারে অগ্রাহ্য করে চলে। তারা গর্ভমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন দিন দাঁড়ায় নি বটে তবে গর্ভমেণ্ট তাদের ভয় করতো।

১৮৪৭ সনে দুদুমিয়ার বাড়ি জমিদার ও কুঠিয়ালেরা মিলে লুঠ করে এবং ১৮৫৭ সনে সেসন আদালতে তার প্রতি দণ্ড দেয়। ১৮৫৭ যখন ভারতীয় সেপাইরা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গর্ভমেণ্ট আশঙ্কা ক্রমে দুদুমিয়াকে কয়েদ করে কিছুকালের জন্য আলিপুরে জেলে রাখে।

দুদুমিয়ার শিষ্যরাও সর্বত্রই তাকে ঈশ্বর প্রেরিত মনে করে তার যশোগানে ও মত প্রচার করত, সমাজের দ্বারা শাসিত হ'য়ে বা ইচ্ছাপূর্বক কাছা ছেড়ে যারা দুদুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিল তাদেরই 'ফেরাজী' বলা হতো। এক একজন খলিফার অধীনে বহু 'ফেরাজী' থাকত, - পা পচে গিয়ে দুদুমিয়া মারা যায়।

ক্রমে বাঙ্গলা দেশে 'ফেরাজী'দের কার্যকলাপ এক নব রূপ ধারণ করে, এবং বারাসাত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় তারা ছড়িয়ে পড়ে। সিতানায় 'ওহাবী' কেন্দ্রে মূল উদ্দেশে কার্য চলতে লাগল এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে ধন-জন ও অন্যান্য রসদপত্র সিতানায় প্রেরিত হতে থাকে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হ'তে পূর্ব-প্রান্তিক বাঙলা এই

দুই হাজার মাইল স্থান জুড়ে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা, শাখা বা কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওহাবী সৈন্যদের কুচকাওয়াজের সময় নানা সমর সঙ্গীত গাওয়া হতো।

ওয়াহাবীরা সামরিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৫৮, ১৮৬৩ ও ১৮৬৮ অব্দে ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু প্রতি বারই ঘটেছে পরাজয়।

কতকাল চলে গেল, তিতু মীরের কথা স্মৃতির পটে ঝাপসা হয়ে গেছে কি তবু? —না। সেই যে চলতি গান, যা বহুকাল ধরে চাষাভূষারা বাংলার মাঠে মাঠে গেয়ে বেড়িয়েছে কেন?

—জোলানী উঠিয়া বলে, উঠ্‌রে জোলা ঝাট্‌
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র তোর দাড়ী কাট্‌॥
তিতুমীরের গলা ধরি নমরুদ্দি কয়
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙা গোরা, উদ্দিপরা ব্যাতের টোপ মাথায়
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি............ইত্যাদি।

১৮৫৭র বিপ্লবাগ্নি নিভিয়ে (?) দেবার সংগে সংগেই ইংরাজ জাতি বুঝতে পারলে, এই স্বর্ণভূমি ভারতকে শোষণ করতে হলে সর্বাগ্রে যে জিনিষের প্রয়োজন: সেটা হচ্ছে ভেদ নীতির প্রচলন। আর তা নাহ'লে এই তেত্রিশ কোটি লোকের বাস-ভূমি বিরাট এই ভূখণ্ডকে করায়ত্ত রাখা সহজসাধ্য হবে না। কাজ সুরু হলো সৈন্য বিভাগে সর্বপ্রথম।

১৮৫৭র মৃত্যুপণকে ব্যর্থ করে দিতে যে দেশদ্রোহী পর-উচ্ছিষ্ট লোভীরা ইংরাজদের পাশে পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, সেই শিখ ও গুর্খাবাহিনী আজ ইংরাজের পিঠ চাপড়ানী পেয়ে নিজের হিন্দুস্থানী ভাইদের, হিন্দুস্থানী সেপাইদের শত্রু বলে ধরে নিতে সুরু করল।

এ'ত তাদেরই জবানী। স্বয়ং লর্ড ডালহৌসীর জবানী: ভয়ের কিছু নেই। হিন্দুস্থানী সেপাইদের বিরুদ্ধে শিখ ও গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের (Devils) মতই লড়বে।

শিখরা সেপাই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের

পক্ষ নিয়ে লড়েছে, তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে; তার কারণ এই যে তারা বাঙালী পল্টনকে অন্তরের সংগে ঘৃণা করে।

কিন্তু এ ঘৃণা এল কোথা হতে? এর মূল কোথায় ছিল, ডালহৌসী?

তোমাদের রাজনীতিতেই! ধন্য নীতি-বিশারদ ফিরিংগী জাত! রাজত্ব করবার নামে এত বড় শোষণ আর কোন জাত কোন জাতকে করেছে কিনা জানি না। ১৮৫৭র শোধ এমনি ভাবেই তোমরা তুললে, যাতে করে এতগুলো লোককে বেমালুম একেবারে পাকা-পোক্ত ভাবে গোলাম বানিয়ে ছেড়ে দিলে। এতবড় বিশাল ভারত ভূমিতে মানুষ বলতে আর একটা লোককেও রাখলে না। ভেদ-নীতির কুঠারাঘাতে এতগুলো মানুষকে একেবারে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত করে ভেড়া বানিয়ে দিল।

'ঐক্য-বোধ' ও 'ভ্রাতৃত্ব-বোধ' কথা দু'টো ভারতের অভিধান হ'তে একেবারে মুছে গেল।

বাংগালী পল্টনের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে, শিখ পাঞ্জাবী, মুসলমান, জাঠ, রাজপুত, গুর্খা দিয়ে সৈন্যদল গড়ে উঠ্‌লো। আর সেই সংগে আইনের বলে বাংগালীকে নিরস্ত্র করে রাখবারও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পংগু ঠুঁটো জগন্নাথ করে বাংগালী জাতটাকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলে, তোমাদের রাজ্য বিস্তারের সুবিধার জন্য, তোমরা ভেবেছিলে বাংগালী যে একদা কোন দিন অস্ত্র ধরতো, সত্যিকারের সৈনিক ছিল, সে কথাটাও তাদের ভুলিয়ে দেবে; কিন্তু তা সম্ভব করতে পারলে কি!

তারই জবাব: আমাদের বাংগালী ছেলে যতীন্দ্রনাথ বাড়ুজ্যে; নেতাজী সুভাষচন্দ্র! যাদের ডাকে আজ শুধু বাংলা কেন, ভারতের সর্বত্র সৈনিক-সাধনা এনে দিল।

সৈনিক আমরা! একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লংকা করিল জয়!

তোমরা আইনের তালা-চাবী দিয়ে আমাদের সাধনা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে প্রহরী বসালে সংগীন উঁচিয়ে।

তাই রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারে, গোপনে গোপনে সুরু হলো আমাদের সাধনা।

আমরা স্বপ্নে দেখলাম: মা কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন।

আর স্বপ্ন দেখলাম: মা কি হবেন।

তোমরা আইন রচনা করো। শৃংখল করো আরো শক্ত, কারাগার করো লৌহ কঠিন ক্ষতি নেই তাতে।

আমরা স্বপ্ন দেখি : মা কি হবেন ! মা কি হবেন !

আমাদের দেশ-মাতৃকা জননী জন্মভূমির মুক্তি প্রস্তুতি চলুক !

আইন ! আইনের পর আইন যত খুশী রচনা করতে চাও করো।

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাধন তত টুটবে।

১৮৬১ : পাশ হলো ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলস্ এক্ট্। ঐ আইনে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পুনর্গঠিত হলো। বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজন পঞ্চম সদস্য নিযুক্ত হলেন।

১৮৭০ : আইনের আবার কিঞ্চিৎ সংশোধন : যখন যে প্রদেশে পরিষদের অধিবেশন হবে, তখন সেই প্রদেশের শাসনকর্তারাও এতে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে যোগদান করবেন। চলুক আইন গড়া, আমরা একটু পিছনে তাকাই।

মরা গাংগে বান এলো : চৈত্র বা হিন্দু মেলা।

ভাংগা বন্দরে প্রাণের সাড়া এল কি ? প্রথম মেলা ১২২৮, ৩০শে চৈত্র (ইংরাজী ১৮৬৭), দ্বিতীয় অধিবেশন ১২৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র।

কি বলেছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ?—আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় স্থখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত-ভূমির জন্য !

মাগো! সন্তান তোমার জাগছে। ঘুমে-বোজা চোখের পাতায় রুদ্ধ বাতায়ন ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে পড়ছে তিমির-বিদারী অরুণ রশ্মি।

রশ্মি ! ভাংগা ভাংগা নবারুণ-রশ্মি !

ঐত' তোমার ছেলেরা বলছে, শোন মা, এই মিলনের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য আরো আছে। যাতে করে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় প্রীতি, ভারতবর্ষের মাটিতে বদ্ধমূল হয়, তাইত এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

আমাদের কবির কণ্ঠে শুনলাম ঐ সংগে নতুন দিনের নতুন গান :

হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

* * * *

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়।

ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?

হোক ভারতের জয়।

একশত বৎসরেরও বেশী, মরা জাতি শুনলো যেন নতুন কথা !...

১৮৬০—১৮৮০ : মাঝে মাঝে আসে মরা গাংগে যেন জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস !

আমরা শুনলাম আরো একজন নির্ভীকের কণ্ঠ।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

না ভারত ঘুমিয়ে নেই ! এসেছে তার ঘুম ভাঙ্গার লগ্ন !

১৮৭১ : ওহাবী নেতা আমীর খাঁকে ইংরাজ তিন আইনের বলে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দিল।

ওহাবীরা বললে : না এ জুলুম চলবে না আমাদের নেতার প্রকাশ্য আদালতে প্রকাশ্য বিচার হোক। তাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরমানের এজ্‌লাসে আবেদন করা হলো।

বিচার অবিশ্যি যা হলো তা বলাই বাহুল্য।

তখন ভারতে লর্ড মেয়োর শাসন কাল। এলো ১৮৭১এর ২০শে সেপ্টেম্বর। টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় আবদুল্লা এসে অতর্কিতে প্রধান বিচারপতি নরমানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করলে।

নরমানের সুবিচারের জবাব।

রক্তাক্ত দেহে নরমান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবং সেই রাত্রেই শেষ নিঃশ্বাস নিল।

Tooth for a tooth ! Eye for an eye ;...

ঘুমন্ত ভারতে বহুকাল পরে আবার বুঝি দেখা দিল অগ্নি-স্ফুলিংগ।

হিংস্র ইংরাজ ফাঁসীর দঁড়িতে লট্‌কে আবদুল্লার প্রাণান্ত ঘটালো। ভাবলে বোধ হয় : আগুন নিভলো।

ভুল ভাংগতে দেরী হলো না প্রভুদের। ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণ কালে শের আলীর হাতে স্বয়ং লর্ড মেয়ো প্রাণ দিল! দ্বিতীয় অগ্নি-স্ফুলিংগ !

তাই বলছিলাম ভারত ঘুমিয়ে থাকেনি। এবং মুখে না প্রকাশ পেলেও অন্তরে হয়ত সেটা ইংরাজ সরকার অনুভব করছিল হাড়ে হাড়েই।

রাজ্য শাসনের নামে শোষণ ও ব্যভিচার, অন্যায় জোর জুলুম ক্রমে তাই

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল : কর্তারা 'আর্মস্ এ্যাক্ট' (অস্ত্র আইন) নামে আর একটি নতুন আইন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র-শস্ত্র, এমন কি বন্দুক বা তরবারিটি পর্যন্ত রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনী বলে ঘোষিত হলো! শ্বেত-অশ্বেত, খ্যাত-অখ্যাত সকল বিদেশীই অস্ত্র-শস্ত্র রাখতে পারবে ও ব্যবহারও করতে পারবে, কেবল মাত্র আমরা এদেশের অধিবাসী হয়েও, হিন্দু বা মুসলমান কেউই, অস্ত্র ব্যবহার ত দূরের কথা অস্ত্র রাখতেও পারবো না, আইনতঃ সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। কোন একটা সুসভ্য শিক্ষিত স্বাধীন জাতি যে, রাজ্য শাসনের অজুহাতে এতদিনকার একটা সুসভ্য জাতকে এমনি করে হাত পা ভেংগে পংগু, অপদার্থ করে ফেলতে পারে, ভাবতেও বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

যে ভারতকে কেন্দ্র করে একদা এত বড় ভূখণ্ড এশিয়া, শিল্পে, স্থাপত্যে, শিক্ষায়, কৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজ সেই ভারতের আর গৌরবের বলতে কিছুই এরা বাকী রাখবে না, ইংরাজের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু কবরের মাটিতেও অংকুরোদ্গম হয়, এ-ই প্রকৃতির বিধান। তাই ভারতের কবরের মাটিতে দেখা দিলেন : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

এদেরই প্রচেষ্টায় আবার ভারতের জনগণের বুকে এলো নতুন ঐক্যের ধারা। নতুন মন্ত্র হলো উচ্চারিত।

যে আত্ম-বিশ্বাস প্রায় শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছিল, তা আবার তারা সম্পূর্ণ হ'য়ে ফিরে পেলে, এক-ভ্রাতৃত্ব ও এক-জাতীয়তা সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হলো। এই কল্যাণ মুহূর্তে ভারত-সভা নতুন চিন্তা ও কর্মধারা জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করলে।

'ভারত-সভার' মূল উদ্দেশ্য ছিল : ভারতে প্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্রর প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ : প্রজাস্বত্ব-আইন। জমিতে প্রজার স্বত্ব এবারে সুনির্দিষ্ট হলো।

* * *

দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে : সামান্য কারণে দেশপ্রেমিক নেতা সুরেন্দ্র নাথের দু'মাস দেওয়ানী জেলে কারাবাস হলো। কারাকক্ষের দুয়ার খুলেছে।

পলাশীর প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের পতনের পর হতে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ক্রমপ্রতিষ্ঠা ও সেই অধীনতার শিকল ভাংগতে গিয়ে ভারতে

পরবর্তী প্রায় দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিংগ ঝল্‌কে উঠেছে বার বার, তার রক্তিমাভায়েই ভারত হয়ত নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন আবার।

এ সেই স্বপ্ন : মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, আর কি হইবেন।

—তিন—

সেই স্বপ্ন : দ্বি-সপ্ত-কোটিভুজৈর্ধৃত খর-করবালে, অবলা কেন মা এত বলে।

ভারতে বিংশ শতাব্দী আসছে। তারই অত্যাসন্ন ইংগিত ১৮৯৩ : বোম্বায়ে সংঘটিত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা।

অদূরাগত উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহাগ্নির একটি অগ্নি-স্ফুলিংগ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়ে, বিশেষ করে পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুসলমান ও ব্রিটিশ বিদ্বেষ যেন হু হু করে জ্বলে উঠ্‌লো ঐ সামান্য একটি স্ফুলিংগে।

১৮৯৪ : পুনা ও বোম্বায়ে মহারাষ্ট্রীয় ও চিৎপাবন ব্রাহ্মণ যুবকেরা গণপতি উৎসবকে কেন্দ্র করে যেন ঘুম ভেংগে জেগে উঠ্‌লো। পথে পথে মিছিল। লাঠি, তলোয়ার ও মশাল নিয়ে সশস্ত্র মিছিল দেখা দিল।

একদা যাদের শৌর্যে ও বীর্যে স্বয়ং আলমগীর বাদশা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল : যে মহারাষ্ট্রীয় বীর গৈরিক পতাকা তুলে স্বপ্ন দেখেছিলেন :

খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
এক ধর্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিব আমি···

তারই ভগ্ন সমাধি-মন্দিরের দ্বারে এসে প্রণাম জানালো হাজারো মারহাঠী যুবক : জয়তু শিবাজী!

জীর্ণ সমাধি মন্দির সুসংস্কৃত হলো।

১৮৯৫ : শিবাজী উৎসব।

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত দু'টি যুবক, দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার সমিতি স্থাপন করলেন।

উঠ! ভারতবাসী জাগ! শিবাজী ও বাজীপ্রভুর অনুকরণে দুঃসাহসিক

কাজে এবারে তোমাদের প্রবৃত্ত হ'তে হবে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো, বলো ভাই সব আমরা জাতির মুক্তি-সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেবো।

এদেশের নাম যদি হয় হিন্দুস্থান, তবে এখানে ইংরাজ রাজত্ব করে কোন্ অধিকারে!

১৮৯৭: কেশরীর পাতায় আমরা পড়লাম: বাঘনখ সাহায্যে আফজল খাঁর হত্যা শিবাজীর অবশ্য-করণীয় পুণ্যকীর্তি, নরহত্যা আদৌ নয়। আমাদের তা'র অনুকরণে দেশের শত্রু উৎসাদনে প্রবৃত্ত হতে হবে।

'বাঘনখ'! শিবাজীর সেই চিরস্মরণীয় অমোঘ গুপ্ত শক্তি 'বাঘনখ'!

শার্দুলের মত সেই ধারালো নখরাঘাতে, যারা আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে, শয়নের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, অংগের বস্ত্রাবরণ খুলে নিয়েছে, সেই ফিরিংগী শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবো।

ইংরাজের সুশাসন (?)! তবু মহামারী, দুর্ভিক্ষ!

১৮৯৭: দেখা দিয়েছে প্লেগের মহামারী বোম্বাইয়ে।

কর্ম ও নীতি-বিশারদ ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সুরু হলো 'প্লেগ রেগুলেশনের' অকথিত পাশবিক অত্যাচার।

দেশের লোক বুঝতে পেরেছে প্লেগ কমিশনার শ্বেতাংগ র‍্যাণ্ড এই অত্যা-চারের মূল।

গভর্ণমেণ্টের নিকটেও প্রার্থনা করে কোন ফল নেই।

এ'ত আর বুঝতে কারও কষ্ট নেই যে, সামান্য প্লেগ প্রতিরোধের অছিলায় তারা সুরু করেছে এই দুর্বিসহ প্রজাপীড়ন ও জঘন্য অত্যাচার।

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

২২শে জুনের স্বপ্ন-মদির রাত্রি!

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের দীর্ঘ ৬০ বৎসর পূর্ণ হলো। হীরক জুবিলী উৎসব।

আলোকমালায় সেজেছে তাই পুনা নগরী। হাস্যে, লাস্যে, গন্ধে, গীতে যেন অভিসারিকা, সহসা সেই আলোকোজ্জ্বল আনন্দ-ঘন মুহূর্তে নীল শান্ত আকাশ চিরে নেমে এলো যেন বিচারের বজ্রাগ্নি শিখা ইন্দ্রের বজ্রের মতই অব্যর্থ অমোঘ।

দুম্! দুম্! দুড়ুম্!

রক্ত! পুনার মাটি ভিজে গেল। দামোদর চাপেকারের হাতে র‍্যাণ্ড ও লেঃ আরেষ্ট বিগত-প্রাণ!

অন্ধকারে যে বজ্র সঞ্চিত হচ্ছিল, এ তারই একটু আভাস মাত্র এবং যে বজ্রর হতে পরবর্তী কালে ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে বাংলাদেশে মুহুর্মুহু অগ্নি-জিহ্বা লালায়িত হয়ে উঠেছে।

কারাগারের লৌহ কবাট ঝন্ ঝন্ করে খুলে যায়, ফাঁসীর দড়ি দাগের 'পর দাগ পড়ায় কণ্ঠে কণ্ঠে। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করে ছুটে যায় জাহাজ আন্দামানে নির্বাসন দিতে।

গুপ্ত সমিতি!

বল দেশের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো!

একদিকে গুপ্ত কক্ষে গুপ্ত সমিতির গোপন অধিবেশন, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করবে না।

চাপেকার সমিতিকে ভেংগে গুড়িয়ে তচ্‌নচ্ করে দেওয়া হলো।

কিন্তু ২২শে জুনের রাত্রে যে অগ্নিশিখা ঝলকিয়ে উঠেছিল, তা কি নিভ্‌ল!

পুনার গুপ্ত-বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট দীক্ষা হয়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের। বরোদার মহারাজার শরীর রক্ষীর কাজে ইস্তফা দিয়ে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতায় এলেন। সংগে শ্রীঅরবিন্দের একখানা চিঠি সরলা দেবীকে লিখিত:

সভা সমিতি করে মিষ্ট কথায় আর যাকেই ভোলান যাক, ফিরিংগী জাতকে ভোলান যাবে না। লগুড় হেনে শায়েস্তা করতে হবে। অতএব প্রস্তুত হও।

সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিড়িতে হবে।

সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে উড়ে এলো বিপ্লবের বীজ শস্য-শ্যামলা উর্বরা বাংলার মাটিতে শ্বেতাংগদের অলক্ষ্যে।

১০২ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে সুকিয়া ষ্ট্রীট্ থানার নিকটে ব্যারিষ্টার পি. মিত্রকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবী সমিতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপনা করলেন।

১৯০৩ : বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার গোড়ার দিকে এসে যোগ দিলেন ঐ সমিতিতে।

১৯০৪—

১৯০৫ : সোনার বাংলার অংগ ছেদ করলে ফিরিংগীরা।

ভয় পেয়েছিল ইংরাজ। বাংগালী জাতি তখন রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর, সমগ্র ভারতের নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে, তার নেতৃত্বের ক্ষমতাও যাবে এবং সেই সংগে ভারতবাসীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাঁটা পড়বে।

কিন্তু, তার ফিরিঙ্গীদের চাইতেও সাংঘাতিক উদ্দেশ্য যেটা ছিল, সেটা : ভেদনীতির প্রবর্তন এই দেশের জনগণের মধ্যে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্রেক।

শ্বেতাংগরা যত অস্ত্র হেনেছে অসহায় ভারতবাসীর 'পরে, এটা সবার চরম! পাশুপত অস্ত্র!

নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আসামের ছোটলাট হলেন স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড্ ফুলার। সে'ত প্রকাশ্যেই যত্র তত্র বলতে স্বরু করলে : আমার হিন্দু মুসলমান দুই স্ত্রী।

হিন্দু দুয়োরাণী—অবহেলিতা ও নিন্দিত', আর মুসলমান সুয়োরাণী—প্রণয়াস্পদা ও বিশেষ অনুরাগিণী।

হায়রে কি রূপকথারই সৃষ্টি হলো, আজিও তার মীমাংসা হলো না।

১৯০৫এর সেই অংকুরিত বিদ্বেষ-বিষ, ১৯৪৮এর ৩৫শে জানুয়ারী আকণ্ঠ পান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন যিনি, সেই অহিংসার পূর্ণ প্রতীক মহাত্মাকে আর একবার প্রণাম জানাই এই সংগে।

ভারত সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠেছিলো সেদিন, সে বিষের সাক্ষ্য দেবে যুগ যুগ ধরে দিল্লী নগরীর বিড়লা ভবন ও যমুনাপুলিনের রাজঘাট শ্মশান!

ফিরিংগীর কীর্তি! এজগতে অতুলনীয়। আর অতুলনীয় তাদের অমোঘ পাশুপত অস্ত্র প্রবর্তিত ভেদ-নীতি! সেলাম তোমায় লর্ড কার্জন! হাজার সেলাম! কবি আবার বল! আবার আমরা শুনি বল : জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাংলার সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র

উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, ভিক্ষা নহে।

* * না ভিক্ষা আমরা চাইনা। ছিনিয়ে নেবো আমরা আমাদের যা কিছু প্রাপ্য। স্বাত্বাধিকারের প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রতিষ্ঠা! দাবীর স্বীকৃতি!

বল বল বল সবে
শতবীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কোথায় সেই শ্রেষ্ঠ আসন! কোথায় আমাদের সেই মা দির্গভূজা নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রু-মর্দিনী মৃগেন্দ্র-পৃষ্ঠ বিহারিণী!

বন্দেমাতরম্!

কাঁদ বাংলা। কাঁদ! আজ তোমার শোকের দিন। হাঁ বঙ্গজননী, তুমি সেদিন কেঁদেছিলে, আমরাও তোমার সংগে সংগে কেঁদেছি। আমরাও সেদিন মিলনের 'রাখীবন্ধন' পালন করেছিলাম।

সর্বত্র হরতাল। কাজকর্ম, গাড়ী চলাচল সব বন্ধ। সবাই গাইছে প্রাণ খুলে 'বন্দেমাতরম্' সংগীত। আর দেশের কবি সেদিন গাইলেন:

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক্
সত্য হউক হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

বাঙালী মরেনি। বাঙালী চিরজীবী। জগৎ-সভায় যাদের আসন পাতা হয়েছে, যে বাঙালী রামমোহন, বিবেকানন্দ, হেম, মধু, বঙ্কিম, রবি, বিপিন, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন,—সে বাঙালীর মৃত্যু কোথায়?

দিকে দিকে তার জয়যাত্রা।

দেশের চারণ কবি তাই আবার গেয়ে উঠ্লেন:

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন টুট্‌বে ততই—
মোদের বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে ততই—
মোদের আঁখি ফুট্‌বে।

মৃতজাতির বুকে নব চেতনার আলোড়ন : সুরু ভারতে স্বদেশী আন্দোলন।

'বয়কট' আন্দোলন। আন্দোলন সুরু হলো প্রথম বাংলা দেশেরই মাটিতে।

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লজপৎ : আমি বিশ্বাস করি এই স্বদেশী আন্দোলনই আমাদের দেশের মুক্তির পথ।

আসন্ন ভারতব্যাপী মুক্তি-যজ্ঞ সুরু হবে, এ তারই প্রস্তুতি!

কংগ্রেসের মধ্যেও দু'টো দল গড়ে উঠ্‌ছে। একদল পুরাতন পন্থী, তাদের নায়ক স্যার ফিরোজ শা মেহ্‌তা; অন্যদল নতুন পন্থী, কাণ্ডারী হলেন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিপিন পাল। একদল চান ধীরে সুস্থে আপোষে মীমাংসা; অন্যদল বললে, আমাদের চাই স্বরাজ্য, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা।

নতুন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

লাল-বাল-পাল।

বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল। ত্রয়ী সম্মিলন।

এদেরই পদাংক অনুসরণে এগিয়ে এলেন শ্রীঅরবিন্দ।

বাইরে প্রকাশ্যে যখন এই আন্দোলন চলেছে, গোপনে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠ্‌ছে তখন একটি দু'টি করে : গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—অনুশীলন সমিতি।

শুধু বঙ্গ-ভঙ্গের রদই নয়, ভারতের স্বাধীনতা চাই।

স্বাধীনতা চাই! স্বাধীনতা!

বিলাতী লবণ, চা, চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে কি স্বাধীনতা হবে? রাষ্ট্রবিপ্লব হবে? লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালান শেখ, সমিতি গঠন করো। বুকের রক্ত তর্পণে আসবে স্বাধীনতা।

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে উঠ্‌ছে।

দলে দলে স্কুলের কিশোর ছেলেরা এসে লাঠি খেলা, ড্রিল, কুচ্‌কাওয়াজ সুরু করেছে।

মিলিটারী ট্রেণিং!

প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো, সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি—স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। সর্বদা সমিতির পরিচালকের নির্দেশ মানিয়া চলিবে।

জংগলাকীর্ণ আম-কাঁঠাল ও নিভৃত আলো-আঁধারী বাঁশ বনের মধ্যে লাঠি খেলা, অশি শিক্ষা ও কুচ্‌কাওয়াজ চলেছে।

লাঠিটা আসলে ত লাঠি নয়। তরোয়াল ও বন্দুকের লড়াই শেখার উদ্দেশ্যেই আইন বজায় রেখে লাঠি খেলার প্রবর্ত্তন।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা! মানুষ আমরা নহি ত মেষ।

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া অন্ধকারে সেই আম্রকাননের ছায়ায় বাঁশঝাড়ের নির্জনতায় এসে সব মিলিত হয়।

গোপনে গোপনে চলেছে শক্তির আরাধনা। মৃত্যু পনে দীক্ষা!

কলকাতা হ'তে আসছে নবযুগের অগ্নিক্ষরা বাণী নিয়ে, যুগান্তর পত্রিকা। সহসা এমন সময় অগ্নিস্ফুলিংগ: গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করে মারা হয়েছে সংবাদ প্রচারিত হলো।

ওদিকে সাগর পারে রুশ-জাপান যুদ্ধে পাশ্চাত্য সম্রাট জারের পরাজয় ও জাপানের জয়।

মহারাষ্ট্র হ'তেও মাঝে মাঝে উদ্দীপনার অগ্নিকণা ছুটে আসে। আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে। কালো মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ ভরা।

১৯০৭ সাল।

নরম ও গরম দলের বিরোধে সুরাট কংগ্রেস ভেংগে গেল।

* * *

আর গোপন বিপ্লব সমিতি! সেখানে বিপ্লবের অংকুর দানা বেঁধে উঠ্‌ছে, একটু একটু করে। কালো মেঘের বুকে লুকানো সেই বজ্র বিদ্যুৎ!

বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা নির্মাণ।

বোমা তৈরী শিক্ষা দিচ্ছেন: হেমচন্দ্র কানুনগো।

১৯০৬ সাল থেকেই একাধিকবার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ-আসামের অত্যাচারী লেঃ গভর্ণর ফুলারকে হত্যা করবার বিশেষ চেষ্টাও হয়ে গেছে। কিন্তু সফল হয়নি কেউ।

ঐ সংগে নতুন করে ফিরিংগীরাজের দমন-নীতি দেখা দিয়েছে।

'বন্দেমাতরম্', 'নবশক্তি', 'সন্ধ্যা',—প্রভৃতি পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে।

জনতা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

নির্ভীক ব্রহ্মবান্ধব, 'সন্ধ্যা'র কর্ণধার, আদালতে অভিযোগের উত্তরে বললেন: বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টায় আমি যে ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত নহি। * * ফিরিংগীরাজ আমাকে জেলে দেয় সাধ্য কি!

খানাতল্লাসীও সুরু হয়েছে।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড।

স্বদেশী মামলার বিচার প্রায়ই তারই এজ্‌লাসে হয়, এবং সামান্যতম দোষেও সে দেয় গুরুদণ্ড। স্বদেশী আন্দোলনে ছেলারা লিপ্ত হলে তাদের প্রতি আদেশ হতো নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের।

১৯০৭, ১লা নভেম্বর: প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন, আলোচনা রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা, সব কিছু বন্ধ করা হলো নতুন আইন জারী করে।

নিত্য নতুন দমন নীতি ফিরিঙ্গীর হুম্‌কি।

বজ্রগর্ভ মেঘ হ'তে অশনি-সম্পাত হলো: ১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল।

—চার—
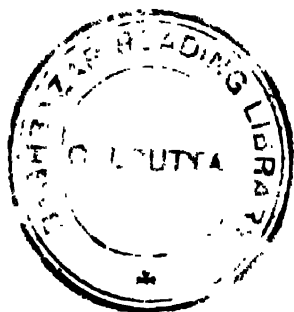
কে তুমি উদাসী, বাংলার পথে ঘাটে মাঠে গেয়ে যাও!

উদাসী একতারাতে একি গান গাও!

একবার বিদায় দে মা,

ঘুরে আসি।

হাসি হাসি পরবো ফাঁসী

দেখবে জগৎবাসী ॥

ক্ষুদিরাম। তোমায় আজ আবার দীর্ঘকাল পরে স্মরণ করছি।

চোখের উপরে যেন ছায়াছবি ভেসে উঠছে, রিক্ত গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের রিক্ততায় কে ওই দধিচী:

এক মাথা রুক্ষ এলোমেলো চুল। দীর্ঘ সরল অগ্নিশিখার মত ঋজু, যেন খাপমুক্ত একখানা ধারালো তলোয়ার।

মাত্র ১৯ বৎসরের তরুণ কিশোর।

মনে পড়ে তোমার দিদিকে কিশোর! সেই যে, যিনি মাত্র তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে তোমায় কিনে নিয়েছিলেন বিধাতার হাত হ'তে!

আজ আমরা এসেছি, সবাই মিলে তোমাকে আবার কিনে নিতে মহাকালের হাত থেকে।

ক্ষুদ দিয়ে নয় ক্ষুদিরাম! এবারে বুকভরা ভালবাসা ও অশ্রুপুষ্পে।

তুমি হয়ত জাননা, তোমার দিদি অপরূপা দেবীকে যখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম: দিদি, আমাদের ক্ষুদিরাম সম্পর্কে কিছু বলুন।

দিদি কেঁদে ফেললেন: আজ আবার উনচল্লিশ বছর পরে ক্ষুদিরামের জন্য কাঁদতে বসেছি। কেঁদে এসেছি চিরদিনই। সামনা-সামনি কাঁদতে পারিনি, লুকিয়ে কাঁদতে হয়েছে। যাকে কিনেছিলাম মাত্র তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে, যাকে বিদায় করেছি গোপনে কাঁদা চোখের জল দিয়ে; কত শাসন, কত গঞ্জনা, কত অবহেলা করেছি বলে মনে মনে বিঁধে রয়েছে—আজ তার শেষ তর্পণ করে অনুতাপ, জালাযন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবো। এই ভাংগা পাঁজরের ভিতর কত কথাই ত আছে!

কেঁদোনা বোন! এ শোকাশ্রু ত তোমায় শোভা পায় না।

অগ্নি কি কোন বন্ধন মানে! সে যে চিরমুক্ত চির স্বাধীন।

১৮৮৯ সাল! ৩রা ডিসেম্বর, সন্ধ্যা পাঁচটা।

একটি শিশু জন্মালো! মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রামে, ত্রৈলোক্যনাথ বসুর ঘরে। রুগ্ন কৃশ একটি শিশু।

ওরে ভাই হয়েছে, ভাই! বোনেদের কি আনন্দ! এর আগে যে দু'টি ভাই মারা গিয়েছে।

উলুধ্বনি দিয়ে তিনটি বোন ভাইকে জানায় আহ্বান।

আগে দু'টি ভাই মারা গিয়েছে অকালে, বোন অপরূপা তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে তাই নবজাত ভাইটিকে কিনে নিলে।

শিশু ক্রমে হামাগুড়ি দেয়, এঘর হতে ওঘরে, কি দুরন্ত কি অশান্ত।

দিদি যাবে শ্বশুর বাড়ী, কোথা হ'তে শিশুটি ছুটে এসে দিদির হাঁটু দু'টো আঁকড়ে ধরে; শিশুটি তখন হাঁটতে শিখেছে যে। ফর্সা, লিক্‌লিকে, মাথায় একমাথা ঠাকুরের জন্য রাখা চুল: যেতে দেবো না।

কেন এ মায়া! কেন এ পিছু ডাক।

খুব শীঘ্রই মায়ার বাঁধন ছিঁড়বে বলেই কি, এই মায়া নিয়ে লুকোচুরি!

দিদির একটি ছেলে হলো: ললিত।

মামা ভাগ্নে পিঠেপিঠি! দু'জনেই সমান দুষ্টু!

দিদি খুঁজছেন: ললিত! ক্ষুদি! ক্ষুদিরাম।

কোথায় ক্ষুদিরাম। ভাগ্নে তখন ছোট্ট লেপটির তলায় মামাকে লুকিয়ে ফেলেছে।

মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন: তোমার মামু কই ললিত?

মুখখানা গম্ভীর করে ললিত জবাব দেয়: জানিনে ত মা!

পরক্ষণেই কিন্তু লেপের তলে মামা ফিক্ করে হেসে ফেলে।

তবে রে দুষ্টু ছেলে! কপট গাম্ভীর্যে মা চোখ রাঙান।

রক্ত আমাশয়ে মা মারা গেলেন, তার নাড়ীছেড়া ধন ক্ষুদিরামকে মাটির মার কোলে তুলে দিয়ে। এই নাও মা তোমার সন্তান।

বালকের বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর।

মায়ের স্নেহ হ'তে এত তাড়াতাড়ি বঞ্চিত হয়েছিল বলেই হয়ত পরবর্তী জীবনে সে মাটির মাকে আপন করে নিতে পেরেছিল।

অদৃশ্য হাতের লক্ষ-কোটি বাঁধনে জননী জন্মভূমি বেঁধেছিলেন ওকে। মা হারা বালক, দিদি অপরূপা নিয়ে এলেন বুকে করে নিজের শ্বশুরালয়ে ভাইটিকে।

দিদির বুকভরা স্নেহের ছায়ায় বালক বড় হয়ে ওঠে। ঠাকুরের মানত রাখা মাথায় বড় বড় চুল, নাকে সোনার তেঁতুল পাতা, পায়ে মরা হাজা ছেলের চিহ্নপ্রমাণ স্বরূপ সরু লোহার বেড়ী!

বেড়ী দিয়ে কাকে বাঁধতে চেয়েছিলে দিদি ?

সে যে বাঁধনকে মেনে নিয়েছিল মুক্তি বলে। সে যে চির বন্ধনহীন।

* * *

যে বাঁধনকে মেনে নিয়েছিল মুক্তি বলে, তাকেই আমি বাঁধতে চেয়েছিলাম মাষ্টার!

দিদির কণ্ঠস্বর বুঝি অশ্রু-বাষ্পে বুজে আসে।

নীলু! আমার নীলু! তোমরা আর আমায় স্তোক দিও না মাষ্টার! আমি ত' শুধু তার দিদিই নই, আমি যে তার মা। আমার বুকের মধ্যেই যে সে মানুষ! তার প্রতিটি দিনের হাসি-কান্না দিয়েই যে আজিও বুকখানা আমার ভরে আছে! সে-রাত্রের কথা, সেই শেষ বিদায়ের রাত্রি, আজিও আমি ভুলিনি।

বর্ষাকাল। গ্রাম। সকাল হ'তেই ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা ঘাটে এক হাটু কাদা ও জল জমে গিয়েছে।

প্রায় দেড় মাস 'পরে নীলু আগের দিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এসেছে।

নীলুর নামে যে পুলিশের ওয়ারেণ্ট বের হয়েছে, দিদির আর তা অজানা নেই।

যে কয়দিন নীলু ছিল না, থানার দারোগা, গ্রামের চৌকিদার ইয়াছিন, দিনে রাতে কতবার যে এসে পলাতক নীলাঞ্জনের খোঁজ করে গিয়েছে।

সেদিনটাই শুধু আসেনি।

এমনি বৃষ্টি বাদলার মধ্যে ঘর হ'তে বের হয় কার সাধ্যি।

রাত্রির অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে আসে, বাইরে প্রকৃতও যেন আরো অশান্ত হয়ে উঠে।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, যেন আকাশ ভেংগে পড়বে।

সোঁ সোঁ হাওয়া, পাল্লা দেয় বৃষ্টির সংগে।

ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, তারই আলোয় নীচু হয়ে কাঠের তক্তাপোষের 'পরে বসে নীলাঞ্জন কি একখানা বই পড়ছে।

দিদি দক্ষিণের পোতায় রান্নাঘরে ব্যস্ত।

দরজায় মৃদু করাঘাত : কে ?

নীলাঞ্জন চকিত দৃষ্টি তুলে দরজার পানে তাকায় : কে ?

নীলু দরজা খোল, আমি সৃষ্টিধর ?

কে ? মাষ্টারদা ? নীলাঞ্জন উঠে বন্ধ দরজাটা খুলে দেয়। দরজা খোলার সংগে সংগে এক ঝলক হাওয়া ও বৃষ্টির ঝাপ টা ঘরে এসে ঢোকে, মুহূর্তে ঘরের একটি মাত্র বাতি নিভিয়ে দেয়।

বাতিটা যে নিভে গেল মাষ্টারদা !

তা যাক্! নৌকা ঘাটে রেডি। রাত্রি দশটায় নৌকা ছাড়বে। মাঝি প্রথমটায় একটু দোমনা করছিল। বসিরের ছেলেটার কিন্তু ভারী সাহস, সে বললে : ডরাও ক্যানে বাপজান, মাষ্টাররে ঠিকই মোরা ষ্টিমার ঘাটকে পৌছামু!

হাঁ বসিরের ছেলে রমজান, ও চিরকালই অমনি ডানপিটে।

সহসা দিদির কণ্ঠস্বর শোনা যায় : ঘরের মধ্যে কে রে নীলু! আলোটা নিভ্‌লো কি করে ?

হাওয়ায় আলোটা নিভে গেল দিদি, মাষ্টারদা এসেছেন।

কে মাষ্টার, যাওনি তুমি তা'হলে, বেশ।

না দিদি যাওয়া হয়নি।

তা আলোটা জ্বাল না, মেঁঝের 'পরে দিয়াশালাইটা আছে দেখ।

আলোটা জ্বালান হলো।

বাইরে বৃষ্টিটা এখন অনেকটা যেন কম।

ভালই হয়েছে মাষ্টার, নীলুর জন্য গরম ভাতে ভাত হয়েছে, ঘরে মুংগলীর দুধে তোলা ঘি আছে, খেয়ে যেও।

খেয়েই যাবো দিদি, অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাই না, তাছাড়া অন্ন আবার কবে দু'মুঠো জুটবে, কে জানে!

এবার এসে ত দেখাই করলে না, সেই গত শুক্রবার এসেছিলে, তারপর আজ এই এসেছো। আমি ভেবেছিলাম হুট্ করে যেমন এসেছিলে, তেমনি হুট্ করেই বুঝি চলে গেল।

হাঁ, গত শুক্রবার সৃষ্টিধর নীলাঞ্জনেরই খোঁজ করতে এসেছিল, কিন্তু নীলাঞ্জন তখনও এসে পৌঁছায়নি।

তোমরা বোস, ভাত হলেই তোমাদের ডাকব, কয়েকটা ডালের বড়া ভেজে নিইগে ঐ সংগে। দিদি আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে।

টোনায় গিয়ে শেষ রাত্রে ষ্টিমার ধরবো, মাষ্টারদা বলে।

দিদিকে কিন্তু এখনও কিছু বলা হয়নি মাষ্টারদা।

না বললেই বা ক্ষতি কি।

না, তা পারবো না মাষ্টারদা। দিদির কাছে আমার কোন কথাই গোপন নেই, তুমিত জান একদিক দিয়ে যে উনি আমার মায়েরও অধিক।

বেশ তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলবো যা বলবার।

* * আহারাদির পর মাষ্টারদাই বলে কথাটা: আমরা আজই রাত্রে চলে যাবো দিদি।

সেকি মাষ্টার! এই ঝড় জলের রাত্রে।

পালাবার এর চাইতে বড় সুযোগ ত আর পাবো না দিদি। কেউই এ ঝড়-জলের রাত্রে সরকারের নিমক শোধ দিতে বের হবে না। তাছাড়া ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

কোথায় যাবে?

কোন কিছু নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই দিদি।

মাষ্টার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে: আর ত দেরী করা চলে না নীলাঞ্জন। তুমি নদীর ঘাটে চলে এসো, আমি একবার সন্তোষের বাড়ী হয়ে যাবো। মাষ্টারদা ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য পা বাড়ায়।

মাষ্টার, শোন। দিদির ডাকে মাষ্টারদা ফিরে দাঁড়ায়।

আমি জানি, তুমি নীলুকে আমার কতখানি ভালবাসো, এবং এও জানি এপথে কত সংকট, কত বিপদ! তবু এইটুকুই আমার আশ্বাস, তুমি ওকে দেখবে। তুমি ওর পাশে আছো?

প্রথমটায় মাষ্টারদা দিদির কথার কোনই জবাব দিতে পারে না। তারপর মুখ তুলে দিদির দিকে তাকিয়ে বলে: একান্তই যদি নিরুপায় হই, তবে আলাদা কথা দিদি! তবে আমি ওর পাশে যতক্ষণ থাকবো, এইটুকুই শুধু তোমায় বলতে পারি, আমার প্রাণ দিয়েও ওকে বাঁচাবো।

আশ্চর্য! সেই নীলাঞ্জনের দিদির কাছে শেষ বিদায়।

আর এজীবনে নীলাঞ্জনের সংগে দিদির দেখা হয়নি।

কতদিন হয়ে গেল, তবু কি সে রাত্রির কথা মাষ্টার ভুলতে পেরেছে।

বাহিরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। কর্দম-পিচ্ছিল পথ ধরে কোনমতে মাষ্টার অন্ধকারে সন্তোষদের বাড়ীর দিকে চলেছে।

সন্তোষের ওখানে ওর পিস্তলটা ও কার্ত্তুজগুলো আছে, যাবার আগে নিয়ে যেতে হবে।

সন্তোষদের বাড়ীতে ওর অবাধগতিবিধি।

মাষ্টার জানত না, আজ দুই দিন সন্তোষের জ্বর। শয্যাগত সে।

সন্তোষের বিধবা মা ও কিশোরী বোন মৃণাল রোগীর শয্যার পাশেই তখনও জেগে বসে।

মাষ্টারের ডাকে মৃণাল উঠে দরজা খুলে দেয়।

কি খবর মাষ্টারদা, এত রাত্রে। সন্তোষই প্রশ্ন করে।

কি, ব্যাপার কি ?

আজ দু'দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি দাদা। ম্যালেরিয়া জ্বর। সন্ধ্যার দিকে ভাল ছিলাম, আবার কিছুক্ষণ হলো জ্বর এলো।

তাইত, আমার জুতোটা নিতে এসেছিলাম যে ভাই !

যা ত মৃণাল ! আমার পড়বার ঘরের পুরাণ আলমারীর মাথায় একটা জুতোর বাক্স আছে, মাষ্টারদাকে এনে দে।

মৃণাল উঠে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি ভাই, চল মৃণাল, আমাকে দেখিয়ে দেও বাক্সটা তুমি। মাষ্টারদাও উঠে দাঁড়ায় এবং মৃণালকে অনুসরণ করে।

ছোট অপরিসর ঘরটা। একপাশে দেয়ালের গায়ে একটা বহুকালের পুরান আম কাঠের আলমারী।

মাষ্টার নিজেই হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নামায়। বাক্স খুলে কাপড়ে মোড়ান পিস্তলটা কোমড়ে বেঁধে নেয়।

ওটা কি ?

পিস্তল !...

তাহলে লোকে যা বলে, সত্যি ?

কি সত্যি মৃণাল ? স্থাণুধর হাসিমুখে মৃণালের প্রসারিত সরল চোখের দৃষ্টির সংগে দৃষ্টি মেলায়।

সত্যিই তাহলে তুমি সন্ত্রাসবাদী ?

সন্ত্রাসবাদী কিনা জানিনা মৃণাল, তবে আমি চাই, ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হোক। আমরা আবার দেশকে আমাদের দেশ বলে জানতে পারি।

লোকে বলে পুলিশ তোমায় ধরতে পারলে ফাঁসী দেবে।

মাষ্টার মৃদু হাসে : তা হয়ত দেবে। এতটুকু সংকোচ নেই কণ্ঠে! পরক্ষণেই দরজার দিকে পা বাড়ায়।

চলে যাচ্ছো ?

হাঁ!

আচ্ছা, আমরা কি দেশের কাজ করতে পারি না ?

কেন পারবে না, দেশ ত কারুর একার নয়। তোমার আমার সকলের।

দেশের সেবায় অধিকার সকলেরই ত আছে মৃণাল।

কিন্তু দাদা যে বলে দেশের কাজে নামতে হলে, আর সব কাজ ভুলতে হয়।

না মৃণাল! সংসারের মধ্যে থেকেও দেশের সেবা করা যায়।

তবে তুমি সংসার ছেড়েছো কেন ? ঘরে তুমি থাক না কেন ? ঘরের মায়া কি তোমার নেই ?

ঘরের মায়া কার নেই মৃণাল! তবে আমার সময় কই। তাছাড়া বিপ্লবী আমি। আমার চোখের সামনে একটি মাত্র আদর্শ: আমার শৃঙ্খলিতা দেশ-জননী।

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে মাষ্টার বলে : মৃণাল, শৈশবে কে কি স্বপ্ন দেখেছিলে, সে স্বপ্নের কথা ভুলে যাও। ভালবাসব, দশজনের মত ঘর-সংসার পাতব, তার জন্য আলাদা মনের দরকার। নিজের বলতে আজ যেমন আমার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তেমনি দেবার মত আজ আর কিছুই আমার নেই। দেশ আমার সর্বস্ব অপহরণ করে রিক্ত নিঃস্ব ভিখারী করে এই বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছে। তোমার মা আছেন, স্নেহময় দাদা আছেন, ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল।

মৃণালের দু'চোখের কোল বেয়ে কেবল অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কোনই জবাব দেয় না।

মাষ্টার আবার যাবার জন্য পা বাড়ায়।

আবার কবে দেখা হবে।

দেখা তুমি আর আমার পাবে না মৃণাল, তবে ?

তবে...

তবে যদি কোন দিন শুনি, তুমি স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসার গড়েছো, তখন একদিন যাবো। দেখে আসবো তোমায়। অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসবো।

বেশ তাই এসো, মৃণালের অশ্রুনত আঁখি বুজে আসে।

শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ, দু'কান ভরে বাজে অবিরাম রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্!...

* * চোখ যখন খুলল মৃণাল, ঘর খালি, শুধু দরজাটা খোলা, বৃষ্টির ছাট্ আসছে, সংগে সংগে হাওয়া।

* * *

উঃ! নদী সেদিন যেন রণ-মুখী! কি ঢেউ! কি বাতাস!

নীলাঞ্জন আগেই পৌছে গিয়েছে, নদীর ঘাটে।

রমজান হাল ধরে বসে আছে মাষ্টারদার প্রতীক্ষায়।

মাষ্টারদা নৌকায় উঠে, একটা বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে বলে নীলু, তুমিও একটা বৈঠা নাও।

নৌকা চলতে সুরু করে, ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে।

ঘর-ছাড়া দিক-হারা যাত্রী কোথায় চলেছো? কোথায় ভিড়াবে তোমার এ তরী?

দেশ দিয়েছে আমায় ডাক।

* * *

দেশ দিয়েছে আমায় ডাক দিদি! তাই চললাম তোমায় ছেড়ে।

আদর্শের সংঘাত বেঁধেছে। ভগ্নিপতি সরকারের চাকুরে। তোষণ-নীতি ও দেশ-প্রীতির সংঘাত।

এমনি করে যদি তোমার ভাই স্বদেশী করে বেড়ায়, আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে! স্বামী বলেন।

বাপ-মা হারা ছোট ভাইটি যে তারই আশ্রিত।

কি জবাব দেবেন অপরূপা দেবী স্বামীর কথার।

কিশোর ক্ষুদিরামের কানে কি সে কথা গিয়েছিল!

* * পড়াশুনায় মন বসে না। তার চাইতে ঢের ভাল লাগে ব্যায়াম ও খেলাধূলা।

১৯০২ সাল: মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতি।

সমিতির উপদেষ্টা ও প্রধান কর্মী : বিপ্লবী সত্যেন বসু !

গোলকুমার চকে—সত্যেনের বাড়ীর লাগোয়া একটা ভাংগা কালীমাতার মন্দির, তারই সামনে একটা চালাঘর : গুপ্ত-সমিতির কেন্দ্র।

কিশোর ক্ষুদিরাম সত্যেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিচক্ষণ দূরদর্শীর বুঝতে কষ্ট হয় না, মায়ের পায়ে উৎসর্গিত ঐ কিশোর। সমিতিতে খেলাধূলা হয়, ব্যায়াম হয়, পাঠচক্র আছে, নিয়মিত পড়াশুনাও চলে।

সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে এসেছে।

মন্দিরের খোলা দ্বার পথে দেখা যায় পাষান বিগ্রহের সম্মুখে প্রদীপ দানে প্রদীপ-শিখাটি কাঁপছে মৃদু মৃদু।

নৃ-মুণ্ডমালিনী, এলায়িত কুন্তলা, লোল-জিহ্বা, সংহারিণী কালীমূর্তি : শক্তির প্রতীক। অসুর দলনী জগন্মাতা !

সত্যেন প্রশ্ন করেন : তোরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিস ত বল ?

একি প্রশ্ন !

সবাই চুপ ! কারও মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই !

সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে চারিদিক থম্‌থম্‌ করছে।

কে দেবে প্রাণ, কোথায় কে আছ এসো বীর ! মায়ের জন্য এগিয়ে এসো।

সহসা এগিয়ে এল, ক্ষুদিরাম : নিশ্চয়ই, আমি দেশের জন্য মরতে পারি।

বেশ তবে ঐ মায়ের মন্দির ছুয়ে প্রতিজ্ঞা কর : সাদা পাঁঠা বলি দিয়ে, সেই রক্তে মাকে আমার তৃপ্ত করবো।

প্রতিজ্ঞা নিলাম।

পরম স্নেহে সত্যেন কিশোর ক্ষুদিরামকে বক্ষের মাঝে টেনে নেন, আলিংগনের বন্ধনে।

১৯০৫ : দুই ভাই জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর সহরের কিশোর ও যুবকের দল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বর্তমান দুর্নীতির অবসান হোক। মুক্তি চাই। মুক্তি !...

বিদেশী দ্রব্য বর্জন করো, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নাও।

১৯০৬, ফেব্রুয়ারী : মেদিনীপুরের এক মারহাট্টা কেল্লায়, বসেছে এক শিল্প প্রদর্শনী। গেটের মাথায় লেখা : সোনার বাঙলা।

কিশোর ক্ষুদিরাম গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে বিলাচ্ছে : দেশদ্রোহ মূলক (?) পুস্তিকা।

পুলিশ এসে বাধা দেয়।

বিদ্যুদ্বেগে পুলিশের নাকে এসে পড়ে ক্ষুদিরামের লৌহমুষ্টির আঘাত। হৈ…চৈ…গোলমাল।

পুলিশ ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক সত্যেন্দ্র সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এলেন দৌড়ে, পুলিশকে বললেন: আরে এ কেয়া কিয়া তুম্‌নে! ডেপুটি সাব্‌কা লেড়কা হ্যায় জানতে হো? কাহে উন্‌কো পাকড়া।

সর্বনাশ! ডেপুটি সাহেবের লেড়্‌কা। পুলিশ মুক্ত করে দেয় ক্ষুদিরামকে। পরে পুলিশ যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, ক্ষুদিরাম তখন তাদের নাগালের বাইরে।

তমলুকে আত্মগোপন করেছে সে।

ছোটখাটো সংঘাতের অগ্নিস্ফুলিংগ দেখা দেয় ক্ষুদিরামকে নিয়ে।

সরকারী ডাক লুঠ, হাটের মধ্যে গিয়ে বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি।

* * শিব মন্দির: মামা ভাগ্নে চলেছে মন্দিরের সামনে দিয়ে।

কত পুরুষ রমণী দেবতার প্রত্যাদেশের জন্য মন্দির দুয়ারে হত্যা দিয়েছে।

কৌতূহলী কিশোর প্রশ্ন করে: ললিত, এরা কেন শুয়ে আছে রে ওখানে অমন করে?

হত্যা দিয়েছে মামা ওরা, জান না, দেবতার দয়া হলে রোগ সারবে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সত্যি! তাহলে আমাকেও ত হত্যা দিতে হয় ললিত।

সেকি মামা! তুমি কেন হত্যা দেবে, তোমার আমার আবার কি রোগ হলো?

হত্যা দেবো এই জন্য যে, বলবো দেবতা ইংরাজকে এদেশ থেকে দূর করে দাও।

শিবঠাকুর যদি সত্যই প্রত্যাদেশ দিতে পারেন, তাহলে আমাকেও নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।

মামা বলে কি! ভাগ্নে মামার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মামার দু'চোখের দৃষ্টি তখন দূরে সন্নিবদ্ধ: বন্দিনী মায়ের শিকল ভাঙার স্বপ্ন!…

আর ওদিকে কলিকাতা মহানগরীতে।

১৯০৭ সাল: কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য মিঃ কিংস্‌ফোর্ড। যত স্বদেশী ব্যাপার সংক্রান্ত মামলার বিচার চলেছে কিংস্‌ফোর্ডের আদালতেই।

আর তার বিচারে লঘু পাপে গুরুদণ্ড চলেছে অবাধে দিনের পর দিন।

দেশের লোক সব তটস্থ হয়ে উঠেছে।

একি অন্যায় জলুম! একি অত্যাচার!...বিচারের নামে একি প্রহসন। রাজ্যরজ্জুটা ওদের হাতে বলে কি যা খুসী তাই ওরা করবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই!

বিপিন পালের বিচারের দিন যেন চরমে উঠে ব্যাপারটা।

বিচার দেখতে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের কিশোর বালক সুশীল সেনও আছে।

শ্বেতাংগ পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার মিঃ হিউ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঐ কিশোরের উপরে বেটন ও ঘুষি চালায়।

পুচ্ছ-মর্দিত শার্দ্দুলের মত কিশোর রুখে দাঁড়ায় প্রতিবাদে: মুষ্ট্যাঘাতে দেয় অত্যাচারের জবাব।

কিংস্‌ফোর্ড ক্ষেপে উঠে: কালা আদমীর এত সাহস। চালাও বেত ওই বালকের সর্বাংগে।

বিস্মিত জনতা: বেত্রাঘাতে জর্জরিত বালক, সকল অত্যাচার সহ্য করে নীরবে শান্ত হয়। তোরা বেত মেরে ভুলাবি আমায় তেমন মায়ের ছেলে নই।

*　　　　*　　　　*

মুরারীপুকুরের উদ্যানে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি।

গুপ্ত সমিতির অন্ধকার কক্ষ: গোপন সভা বসেছে।

অত্যাচারীর দণ্ড দিতে হবে।

এমন শিক্ষা দিতে হবে ঐ অত্যাচারী ফিরিংগীকে যাতে ও বুঝতে পারে মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। অন্যায় জুলুমের আছে প্রতিবাদ।

গোপন সভায় স্থির হয়ে গেল: কিংসফোর্ডের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হলে কঠোর হস্তেই তা দমন করতে হবে।

বোমা ফেলে ওই অত্যচারী ফিরিংগীর শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। কিন্তু কে ফেলবে বোমা!

স্থির হয়ে গেল : দু'টি নাম।

ক্ষুধিরাম ও প্রফুল্ল চাকী!

উনবিংশ শতকে অবশ্যম্ভাবী রক্ত-বিপ্লবের রাত্রি প্রভাতের প্রথম সূচনা : মেঘাবৃত ভারতের উদয়াচলে প্রথম রক্তিমাভায় লেখা হলো দু'টি নাম : ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী!

তারপর একটি দু'টি করে সুদীর্ঘ উনচল্লিশটি বৎসর কালের বুকে লীন হ'য়ে গিয়েছে। তবু ক্ষণিকের বুদ্‌বুদের মত কাল-সমুদ্রের বুকে যে দু'টি নাম জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেল, তার শেষ বুঝি কোন কালেই নেই। যুগ যুগ ধরে ভারতের অন্তঃস্থলে ঐ দু'টি নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো ভক্তি-বেদনা-অশ্রুর স্মৃতিতে।

১৯০৮ : কিংসফোর্ড মার্চ মাসে মজঃফরপুরে দায়রা জজ হয়ে এল।

*   *   *

এপ্রিলের গোড়ার দিকে এক শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশনে, বেলা তখন প্রায় তিনটা হবে, ক্ষুদিরাম গুপ্ত-সমিতির নির্দেশমত চলেছে মজঃফরপুর কিংস্‌ফোর্ডকে চরম দণ্ড দিতে, দেখা হলো দীনেশের (প্রফুল্ল) সংগে।

এর আগে ক্ষুদিরাম কখনও প্রফুল্লকে দেখেনি।

বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার অনির্বান অগ্নিজ্বালা নিয়ে দু'জনে মজঃফরপুরে কিশোরী বাবুর ধর্মশালায় এসে উঠ্‌লো : প্রফুল্লর সংগে একটি গ্লাড্‌ষ্টোন ব্যাগ।

প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে একটি পিস্তল ও ১০টি কার্তুজ দিল : প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষা করো! সে জানত না যে ক্ষুদিরামের কাছে আরো একটি পিস্তল ছিল।

*   *   *

৩০শে এপ্রিল : রাত্রি আটটা। রাত্রির আকাশপটে অনির্বান জ্বলছে অগণিত তারকা।

অদূরে ফিরিংগীদের ক্লাব : আলো জ্বলছে; আনন্দ কলহাসির টুক্‌রো টুক্‌রো আওয়াজ।

সামনে খোলা ময়দানে অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত গাছের ছায়ায় কে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে।

অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি যেন দু'টি অংগার-খণ্ড ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে।

একটি ফিটন গাড়ী এগিয়ে আসছে।

হাঁ ঐ ত! কিংস্‌ফোর্ডেরই ফিটন গাড়ী।

ধ্বক্ ধ্বক্ করে চার জোড়া চোখের দৃষ্টি যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠে।

দুম…দড়াম্!

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ :-ধোঁয়া বারুদের গন্ধ!

দীর্ঘ দিনের বৃটিশ রাজত্বের ভিত্‌টা কি কেঁপে উঠ্‌লে!

বাসুকী আর পুরাতন পৃথিবীর ভার বইতে পারছে না!

* * *

সমগ্র মজঃফরপুর সহরটি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে: মিসেস্ ও মিস্ কেনেডি কোন এক অদৃশ্য আততায়ীর নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

* * *

কার্য শেষ হয়েছে ভেবে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ঘটনাস্থল হতেই নগ্নপদে উর্দ্ধশ্বাসে মোকামা ষ্টেশনের দিকে দৌড়াচ্ছে।

পিছনে আসছে শিকারী কুকুরের দল।

কিছুটা পথ দৌড়ে এসে ক্ষুদিরাম গেল ওয়ালী ষ্টেশনের দিকে, প্রফুল্ল ছুটলো সমস্তিপুর ষ্টেশনের দিকে।

* * *

১লা মে: মজঃফরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে যেন লোক আর ধরে না। অগণিত জনতা।

একটি ট্রেণ এসে দাঁড়াল ষ্টেশনে: সহসা একটি কমপার্‌ট্‌মেণ্ট হ'তে যেন সুমধুর স্বর্গীয় কণ্ঠ ভেসে এল: বন্দে মাতরম!

সমবেত জনতার কণ্ঠ চিরে অভিনন্দন ছুটে এল আনন্দ ঘন সুরে: বন্দেমাতরম্। দেশবাসী আজ দেখতে এসেছে সেই কিশোর কুমারকে। একদা যে নির্ভীক উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিল: দেশের জন্য নিশ্চয়ই আমি প্রাণ দিতে পারি।

সত্য আজ সে মহাসত্যে লীন হ'তে চলেছে।

ব্রিটিশের লৌহ-শৃংখলে বন্দী হয়েছে, আজ সেই কুমার কিশোর ক্ষুদিরাম। মাত্র তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে যাকে দীর্ঘ উনিশ বৎসর আগে তার বড়দিদি যমরাজের নিকট হ'তে ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

মাটীর মা আজ আবার প্রসারিত করেছেন তার দু'টি বাহু: ওরে দে, আমার সন্তান! আমার বাছাকে বুকে ফিরিয়ে দে!

১৯০৮ খৃঃ ২রা মে।

এদিকে গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা নন্দলাল মুখার্জী প্রফুল্লর সংগ নিয়েছে, বন্ধুর ছদ্মবেশে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে।

অকপটে সরল মনে প্রফুল্ল নন্দলালকে বোমা নিক্ষেপের কাহিনী সব খুলে বলে। মুহূর্তে শয়তানের মুখোস খুলে যায়ঃ ছদ্মবেশী কনেষ্টবলদের ইংগিত জানায় শয়তান, প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করবার জন্য।

নিজের ভুল বুঝতে প্রফুল্লর দেরী হয় না। অসহ্য ঘৃণায় সর্বাংগ যেন মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেঃ ছি!···মশাই! আপনি না বাংগালী। বাংগালী হয়ে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন!

সংগে সংগে পিস্তলের কর্ণবিদারী আওয়াজ।

বিস্মিত হতভম্ব নন্দলালের চোখের সামনে বিগত-প্রাণ রক্তাক্ত প্রফুল্লর দেহখানি মাটিতে লুটিয়ে পড়লঃ ইংরাজের বন্ধনোদ্যত লৌহ বলয় হাতেই রয়ে গেল।

ধরিত্রী আপন সন্তানকে দু'বাহু বাড়িয়ে বক্ষে যেন টেনে নিলেন।

চির-মুক্ত চির-স্বাধীন প্রাণঃ তাকে নন্দলালের সাধ্য কি ছিল বাঁধে!

আর সাধ্য কি তার সেই পরদেশী প্রভুর আদেশে বন্দী করে সেই অনির্বাণ দীপশিখাকে।

* * কে এই তরুণ যুবক হাসতে হাসতে যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গেল অবহেলে! দেশের আপামর জনসাধারণ বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় যাকে প্রণতি জানাল।

প্রফুল্ল লহ নমস্কার!

কিন্তু কে এই দুঃসাহসী তরুণ? কিই বা এর পরিচয়!

চলে গেল, কোথায় কে জানে! কিছু দিন 'আগে প্রফুল্লর দাদা একখানা চিঠি পেয়েছিলেন—দাদা আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আমি ব্রহ্মচর্ব নিয়াছি।······

পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।······

পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিঃ মাস দু'ই পরে হিরণ্ময়ী নীলাঞ্জনের একখানা চিঠি পেলেন।

নীলাঞ্জনের চিঠি, নীলাঞ্জন লিখেছে : দিদিগো ! আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি মাষ্টারদার সংগেই আছি সর্বদা। পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।

প্রণাম নিও,

তোমার স্নেহের নীলু।

বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এলো। মেঘের দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আকাশের বুকে লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে ভেসে বেড়ায়। মাঝে মাঝে অবিশ্যি এখনও দু'এক পশ্‌লা বৃষ্টি যে হয় না, তাও নয়।

জমিতে এবার ফসল যেন ধরে না।

পূবের জানালাটা খুললে চোখ পড়ে ঐ দূরে সবুজ সাগরের ঢেউ।

বাতাসে পরিপুষ্ট ধানগাছ গুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে। হরিৎ সাগরের ঢেউ যেন।

আংগিনার সজিনাগাছটায় অজস্র ফুল ধরেছে : মৌমাছিদের মৃদু গুঞ্জন।

চিরদিনের মধুলোভী ওরা।

মুংগলী গাইটার নতুন বাচ্ছা হয়েছে।

ওর দুধ খেতে নীলুর খুব ভাল লাগে। রহিম ঘরামী আবার ঘরের চালগুলিতে নতুন করে খড় তুলে দিয়েছে, তার উপরে হোগ্‌লা পাতা, নীলুই বলেছিল এবারে ঘরের চালে খড়ের উপরে না দিয়ে হোগ্‌লা পাতা দিতে।

ঘর বাড়ী বিষয় আশয়, সবিইত তার !

সাজান ঘর দুয়ার ফেলে কোথায় সে ছুটাছুটি করে, ঘর-ছাড়া দিক্ হারা।

হিরণ্ময়ীর চোখের কোলে জল ভরে উঠে : হায়রে বন্ধনহীন গ্রন্থি !

স্বামীর কথা আর ভাল করে মনেও পড়ে না।

অথচ যার জন্য উনি সব ছেড়ে চলে এলেন, সেও আজ ওকে ভুলতে চায়। আমার জন্য চিন্তা করো না। পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছি।

দেশের ছেলে ! দেশ তোমাকে ডাক দিয়েছে। দেশ জননী তার আদরের দুলালকে ঘর হ'তে বাহির বিশ্বে টেনে নিয়ে গিয়েছেন : যেখানে তুমি 'পরমানন্দের' সন্ধান পেয়েছো। তোমাকে আর পিছু ডাকব না।

১৮৫৭র ঝিমিয়ে পড়া ভারতে আবার যেন আসে নবচেতনার সাড়া। আগেই বলেছি। নরম ও গরম দলের মতানৈক্যে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।

এদিকে একদল মরণজয়ী মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে : হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু !

গোপন বিপ্লবীচক্র গড়ে উঠেছে যে একটি দু'টি করে অনেক, সে সংবাদও হিরণ্ময়ীর অজানা নেই। তাদেরই দলভুক্ত ঐ মাষ্টার ও তার বড় সাধের নীলাঞ্জন, নীলু!

কতটুকুইবা জানত দেশ সেদিন ঐ মরণজয়ীদের কথা। জানি শুধু প্রফুল্ল নামে এক দুঃসাহসী তরুণ কিশোর ছিল, যে দেশ-মাতৃকার শৃংখল মোচনের প্রতিজ্ঞায় দিয়ে গেল প্রাণ হাসিমুখে না করি একটি কাতর শব্দ।

বগুড়া জিলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিহার গ্রামে প্রফুল্লর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ চাকী ও মাতা স্বর্ণময়ী। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান প্রফুল্ল। পুত্র লাভের আশায় আশায় দীর্ঘ সতের বৎসর কাল কার্তিক পূজা করবার পর স্বর্ণময়ীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। ১৮৮৮ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেদিন যখন শঙ্খ ও উলুধ্বনি উঠেছিল স্বর্ণময়ী কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে, "গৃহের মঙ্গল শঙ্খ নহে তার তরে।" প্রফুল্লর ডাক নাম ফুলু। দুই বৎসর বয়সের সময় প্রফুল্ল পিতাকে হারায়। মনোযোগী ছাত্র। লেখাপড়া করে কিন্তু তার চাইতেও বেশী আকর্ষণ খেলা-ধূলা ও ব্যায়ামে।

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রফুল্ল। ঐ সময়ই সে পড়াশুনায় ইস্তফা দেয়। বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলনে সেও ঝাঁপ দিল।

নিয়মিত খেলা ধূলা ও ব্যায়ামে যৌবনের প্রারম্ভেই প্রফুল্লর দেহে যেন শক্তির জোয়ার এসেছিল। উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষপট, আজানুলম্বিত বাহু, নির্মল দৃঢ় মুখশ্রী।

রংপুরের স্বনাম-খ্যাত দেশ কর্মী ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ চক্রবর্তী প্রফুল্লের সহধ্যায়ী। রংপুরে যে বিপ্লব সমিতি গড়ে ওঠে স্থানীয় তরুণদের নিয়ে প্রফুল্ল ও সুরেশ তার মধ্যে অন্যতম ছিল। পরে ঐ সমিতির কেউ কেউ যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর বৈপ্লবিক সতীর্থ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হয়। বারীন্দ্র ঘোষেদের নির্মিত প্রথম বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে আচম্কা বিস্ফোরণ হয়।

প্রফুল্লর ভগিনীপতি অমর নন্দী বলেন: আজও সেই উজ্জল মুখখানা মনে ভেসে ওঠে। বেশী কথা বলত না; কোন কথা জানতে চাইলেই একটু হাসত। মিষ্টি হাসি, বড় ভাল লাগত হাসিটি তাঁর।

গুপ্ত বিপ্লবীচক্রের তিনজন নেতার আদেশে মজঃফরপুরের দায়রা জজ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে প্রফুল্ল মজঃফরপুর যায়।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র দত্ত লিখলেন: আমি প্রফুল্লকে ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী পড়িতে দিয়াছিলাম।

রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে প্রফুল্ল একজন ছিল।

কতই বা বয়স হবে, সতের কি আঠারো বছর বয়স হয়ত তখন; রংপুর আগড়ার সব চাইতে সেরা ছেলে: লোহার মত শরীর।

অকস্মাৎ একদিন প্রফুল্ল গৃহ ত্যাগ করে চলে গেল: দেশের ডাক যার দু'কান ভরে বেজেছে, ঘরের মায়া তাকে কি পিছু টান দিয়ে ধরে রাখতে পারে।

সহস্র বান্ধব মাঝেও যে সে একাকী!

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি, পূর্ববঙ্গ-আসামের কুখ্যাত অত্যাচারী লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড্‌ ফুলারের নাম বিপ্লবী সমিতির খাতায় উঠে: তাকে হত্যার প্রচেষ্টা হয়: বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার এলেন রংপুরে, তার চোখে পড়ল ১৪।১৫ বৎসরের একটি কিশোর। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র!

সবুজ অগ্নিশিখার মত উদ্ধত জ্বালাময়ী।

আপনার তেজে দীপ্তিমান।

প্রফুল্লর সহপাঠী আরো দু'টি কিশোর ছিল সেদিন, পরেশচন্দ্র মৌলিক ও নলিনীকান্ত গুপ্ত।

কিছু অর্থের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কোথা হ'তে আসবে সেই প্রয়োজনীয় অর্থ।

পরামর্শ করে স্থির হলো: ডাকাতী করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে, নরেন গোঁসাই, হেমচন্দ্র কানুনগো, প্রফুল্ল ও পরেশ ডাকাতী করবার জন্ত প্রস্তুত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই সংগে ব্যর্থ হলো ফুলার বধের প্রচেষ্টাও।

১৯০৭ সাল।

ঘরের বাঁধন কেটে গেল, দেশের ডাকে।

প্রফুল্ল কলকাতায় মুরারীপুকুরের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে এসে নাম লেখাল আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত দেশের জন্ত।

অলক্ষ্যে দেশ-জননী তরুণ কিশোরের ভালে এঁকে দিলেন রক্ত-তিলক।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।
দাদার মনে চিন্তা, প্রফুল্ল হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়।

মাষ্টারের কথাগুলো শুনলে সত্যিই বুক কাঁপে: যদি সত্যিই শোন কোন দিন আমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে দুঃখ করো না দিদি, আর ফেল না খানিকটা চোখের জল, কারণ জেনো দেশের জন্য আমাদের সামান্য প্রাণ দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল, এর চাইতে বেশী কিছুই নয়।

তাহলে সত্যিই তোমরা বিপ্লবীদের দলে নাম লিখিয়েছো মাষ্টার!

মাষ্টার কোন কথা বলে না কেবল মৃদু মৃদু হাসে।

কিন্তু কেন এ ভয়ানক কাজে নাম লেখালে মাষ্টার!

সময় যদি পাই কোনদিন দিদি, এ প্রশ্নের জবাব তোমায় সেদিন দেবো, কিন্তু আজ নয়। দেশকে ভালবাসার নাম যদি বিপ্লব হয়, তাহলে বলবো এত বড় অন্যায় জোর জবরদস্তি ইহসংসারে আর নেই।

কিন্তু তোমাদের এ মুষ্টিমেয়র প্রচেষ্টা অতবড় শক্তিশালী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে কতটুকু মাষ্টার!

সংখ্যা দিয়েই সব-কিছুর বিচার হয় না দিদি। তাহলে কুরুক্ষেত্র রণে অক্ষৌহিণী সৈন্য পেয়েও কৌরবের পরাজয় ঘটত না। ধর্মযুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী।

আজ না হয় কাল, না হয় পঞ্চাশ বছর পরে আমরা জয়ী হবোই, সেদিন হয়ত আমরা অনেকেই বেঁচে থাকবো না, কিন্তু যারা থাকবে সেদিন, তাদের অনাগত আনন্দই ত আজকের আমাদের পুরস্কার। তাছাড়া তুমিত গীতা পড়েছো দিদি: মা ফলেষু কদাচন। কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের পরিচয়।

* * কত দিন চলে গেল, নীলাঞ্জন সেই যে ঝড়জলের রাত্রে ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর এল না। তারপর!...

* * *

হাঁ। তারপর সুরু হলো সেই মরণ-জয়ী তরুণ কিশোরের বিচার, ইংরাজের আদালতে। যে দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে আজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে চলেছে, আজ তাকে সমর্থন করতে একমাত্র স্থানীয় উকিল কালিদাস বাবু ছাড়া আর কেউ এগিয়ে এল না, পরে এসেছিলেন সতীশ চক্রবর্ত্তী!

বিদ্রোহী-

নির্ভীক কিশোর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। যা কিছু তার বলবার সবই ত' সে অকপটে বলেছে, এবং বিচারের যা ফলাফল হবে, তা'ত জানতে কারো সন্দেহ মাত্র নেই; তবু এ প্রহসন কেন ?

'অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করতে গিয়েই আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই, দায়রা জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। এর পশ্চাতে কারো প্ররোচনাই ছিল না। দীনেশের সংগে আমার পরিচয় 'যুগান্তর' অফিসে। আমরা হু'জনে একত্রে মজঃফরপুর আসি। সংগে একটি গ্লাড্‌ষ্টোন ব্যাগে অনান্য জিনিষপত্রের সংগে 'বোমা'টিও ছিল।'

মুক্তি-সেনার অকুণ্ঠ জবানবন্দী।

* * বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন : ব্রিটিশ রচিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের ধারা। তাই সে এবার পাঠ করে শোনাতে চায় ক্ষুদিরামকে।

তুমি এ অপরাধ করেছো কি ?

হাঁ, একাজ আমি করেছি।

বিস্ময়ে স্তব্ধ বিচারপতি। এবং নির্বাক উপস্থিত ছিল যারা সেদিন সেই বিচারশালায় সকলেই।

ক্ষুদিরাম, তোমার কাউকে কি দেখতে ইচ্ছা করে ?

হ্যাঁ! শেষ বারের মত আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে দেখতে ও আমার দিদি আর তার ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছা হয়।

তোমার মনে কোন রকম দুঃখ আছে ?

না, কোন দুঃখ নেই।

কোন রকম ভয় লাগছে কি ?

ভয় !……নির্ভীক কিশোর হাসে।

বিচার হয়ে গেল : মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

ক্ষুদিরামের দিদি অপরূপা দেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় : ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সালে, যখন রাত্রি শেষ হ'য়ে ভোরের আলো ফুটছে, তখন হলো ক্ষুদিরামের ফাঁসী মজঃফরপুর কারাগারে।

আমি কাঁদতে পারিনি, দেশের লোক হায় হায় করে উঠ্‌লো।……

অপরূপা দেবীর লেখনি বার বার থেমে যায়। বৃদ্ধার ছানি-পড়া চোখের দৃষ্টি স্মৃতির অশ্রু বিথারে ঝাপসা হয়ে যায়। তিনি তবু লিখে যান : কলকাতা

বাংলা, সারা ভারতে সুরু হলো বোমা পিস্তলের যুগ...মাত্র অল্প কয়েকটা বছর। মেল ব্যাগ লুঠের পর যখন প্রথম টের পেলাম, ঝাঁকড়া চুল, পায়ে লোহার বেড়ী পড়া, সেই মা-মরা ছেলে চিরকালের জন্ম ক্রমশঃ আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে—তখন থেকেই অস্পষ্ট ভয়ে লক্ষ্য করে চলেছি তার গতিবিধি। খোঁজ করেছি রাজ্যের উৎকণ্ঠা নিয়ে। ভুলিনি সে-কথা, ক্ষুদিরাম বলেছিল : আগুনেই তার বুকের আগুন নিভবে। হয় ইংরাজের চিতার আগুনে, না হয় তার নিজের চিতার আগুনে।

* * শবদেহ বহন করে নিয়ে চলেছেন কালীদাস বাবু ও আরো জনকয়েক।

পথের দু'ধারে সারা সহর যেন ভেংগে পড়েছে আজ।

গণ্ডকের তীরে চিতাশয্যা রচিত হলো।

জ্বলে উঠ্‌লো আগুন!

অভিমানী কিশোর তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে নিজের চিতার আগুনেই নিজের বুকের আগুন নিভিয়ে।

বাতাসে ছড়িয়ে গেল সেই চিতা-ভস্ম, বাংলার দিক হ'তে দিকে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিংগের মত : যার শেষ নেই, যার সমাপ্তি নেই।

তাইত আজিও উদাসী বৈরাগীর কণ্ঠে সেই চিতাভস্মের আভাস পাই :

হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
দেখবে ভারতবাসী!

ক্ষুদিরাম, কে বলে ইংরাজের ফাঁসীর দড়িতে তোমার মৃত্যু ঘটেছে? কে বলে তোমার দেহ গণ্ডকের তীরে চিতাভস্মে লীন হয়ে গিয়েছে?

আত্মার মৃত্যু কোথায়?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

তাইত স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার খুলে রেখেছি আজিও, আবার একদিন বসন্ত বাতাসে তোমার আহ্বান সংগীত ভেসে আসবে আমাদের ঘরে ঘরে, যেদিন শুভ-শংখ-নিনাদে দিকে দিকে ঘোষিত হবে স্বাধীন ভারতে, যারা তোমারই মত ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান, তাদেরই জীবন দেওয়ার কাহিনী।

সময়ের সংগে সংগে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ বদ্‌লেছে : সম্মুখ-যুদ্ধে কামান গোলাগুলি দিয়ে—১৮৫৭ হ'তে গুপ্ত সংগ্রাম, ১৯০৬—যে বোমা পিস্তলে এবং তারও পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং ক্রমে ১৯৪২ য়ের অগ্ন্যুৎসবে।

কিন্তু আজিকের এই স্বাধীনতার ক্ষণে যারা সকলে স্মৃতির পটে বার বার ঝিলিক জাগিয়ে যায়, তাদের ত কই ভুলতে পারি নে।

তাইত প্রণাম জানাই যারা আমাদের আগে গিয়েছেন তাদেরই বার বার।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর প্রাণ দান: অসংকোচে পরম নির্ভীকতার সংগে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ, শংকিত করে তোলে ফিরিংগী প্রভুদের।

তারা এবার স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে হোমানল হ'তে সহসা ঐ ক'টি অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হলো, সে শুধু ভয়ংকরই নয়, মৃত্যুর মতই অমোঘ।

অচিরে সেই হোমানলকে নির্বাপিত না করতে পারলে তাদের এত দিনকার কায়েমী রাজত্বের বনিয়াদ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

অতএব আগুন নিভাও।

মহাসত্যের ইংগিত মাত্র ঐ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী।

মাংসাশী শকুনি পক্ষবিস্তার করেছে নীল নভোতলে: ধারালো বাঁকা নখর, রক্ত-লোলুপ।

ভারতের শস্যশ্যামলা মাটিতে পড়েছে তার কুৎসিত ছায়া।

ইনাম ও রূপেয়ার লোভে একদল ঘৃণ্য পশু অন্ধকারে ছদ্মবেশে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরছে: মীরজাফর, মীরজাফরের বংশধরেরা, যারা বার বার জাতীয় জীবনে এনেছে অভিশাপ, কলংক, বেদনা, গ্লানি।

এরা কোন দেশের, কোন জাতির বা কোন বিশেষ কালের নয়। এদের মন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্র! বিশ্বাসের বুকে ছুরি হানাই এদের ধর্ম!

যুগে যুগে এরাই মানব ধর্ম, সভ্যতা, ও সত্যকে করেছে কলুষিত।

মানবাত্মাকে করেছে অপমানিত।

সিরাজ হ'তে সুরু করে মহারাজ নন্দকুমার, মংগল পাঁড়ে, তাঁতিয়া তোপি প্রফুল্ল চাকী, কানাই, সত্যেন প্রভৃতি এবং পরবর্তী কালে আরো অনেকের বুকের রক্তে ও প্রাণ দানে এদের স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। আরো স্পষ্ট হয়ে।

কিন্তু কই তবুত ঘুম ভাংগেনি, চেতনা হয়নি।

এদের কি কোন দিনই আমরা চিনবো না। এ রক্তবীজের বংশধরের কি মৃত্যু নেই! চিরদিনই কি এরা পৃথিবীর হাওয়া কলুষিত করবে বিষবাষ্পে। মানুষের সহজ চলার পথকে করবে ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল।

যাই, আবার বিপ্লবীদের সাধন কক্ষে ফিরে যাই: যেখানে দলে দলে কিশোর,

তরুণ যুবকেরা এসে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে : মাগো তোর শিকল ছিঁড়ে ফেলবো আমরা আবার।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত মেষ!

দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

সেই ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বরোদার উচ্চ বেতনের কাজ ছেড়ে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রী হ'য়ে বাংলার রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে এসে উদয় হয়েছিলেন, বিপ্লববাদের তদানীন্তন অবিসম্বাদী ভাবী নেতা তিলকের সহকর্মী শ্রীঅরবিন্দ।

জাতিয় শিক্ষা ত ফিরিংগীদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ মাত্র, ফল্গুধারার মত তখন দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে চলেছে জীবন দানের সাধনা।

১৯০৫ সনে শ্রীঅরবিন্দ লিখিত "ভবানী মন্দির" দিলে মৃত্যু সাধনার প্রথম ইংগিত। আসন্ন প্রলয়, ঝটিকার পূর্বাভাষ। মহারণ্যের বুকে অরণি সংঘাত-সঞ্জাত বনানীর লক্ষ লোল জিহ্বার প্রথম স্ফুলিংগ।

মরা গাংগে এলো জোয়ার : ফুলার বধের প্রচেষ্টা, 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ, ঢাকুরিয়ার ও পরে মানিকতলা-বাঘমারীর বাগানে বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠা।

লোক-চক্ষুর অন্তরালে সেদিনের সে সাধনা, সর্বপ্রথম প্রকাশ পেলে জনাস্তিকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর হস্তনিক্ষিপ্ত বোমার অগ্নি-ঝলকে।

মানিকতলার বাগান। একদল তরুণ যুবক সেখানে থাকে।

কারও হাতেই একটি পয়সাও নেই, ঘর-ছাড়ার দল, তু'বেলা তু'মুঠো তাতেই সবে সন্তুষ্ট! দলপতি বারীন আবার ঘোর ব্রহ্মচারী। জীর্ণশীর্ণ কংকালসার দেহ প্রশস্ত কপাল, দীর্ঘায়ত টানা টানা তু'টি চক্ষু তারকা, গভীর অতলস্পর্শী দৃষ্টি, স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ উন্নত মোটা নাসা। কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করে জানে, এও হয়ত তাদেরই একজন।

অদ্ভুত ছেলে ঐ বারীন: কঠিন অংক শাস্ত্রকে কিছুতেই যখন করায়ত্ত করা গেল না, কলেজের গেট দিয়ে বের হ'য়ে এল, মা সরস্বতীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে।

কবিতা লেখে, যন্ত্রের তারে তারে তোলে সুর-ঝংকার; কখনো চায়ের দোকান দিয়ে ব্যবসা সুরু করে, কখনো অন্য কাজে দিয়েছে ডুব।

অথচ অর্থশালী পিতার সন্তান। অর্থের ত কোন অভাবই নেই।

সামান্য পুঁজি পঞ্চাশটি মাত্র টাকা সম্বল করে এসেছিল 'যুগান্তর' কাগজ চালাতে। ঘরছাড়া ছেলে উপেন্দ্রনাথের সংগে দেখা যুগান্তর অফিসে। কত আশার কথা।

এ তুমি দেখে নিও উপেন, দশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবেই।

এত বড় সুযোগে কি ছাড়া যায়, উপেনও পোট্‌লাপুট্‌লী নিয়ে এসে দলে ভিড়ে যায়।

শুধু উপেন কেন, মানিকতলার বাগান-বাড়ীতে একে একে অনেকেই এসে জুটেছে, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর আরো অনেকে।

দেশের স্বাধীনতা চায় ওরা। দেশকে স্বাধীন করবে আবার। মৃত্যুর শংকা পর্যন্ত নেই।

রুদ্র বৈশাখ। প্রচণ্ড তাপে পৃথিবী যেন ঝলসে যায়।

রাত্রে ছেলেরা সব অন্নের থালা নিয়ে আহারে বসেছে। নিজ হাতে তৈরী অন্নব্যঞ্জন।

বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। ওদেরই এক চেনা বন্ধু ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

ওরা সকলে একসংগে মুখ তুলে তাকায়: ব্যাপার কি হে, এই অসময়ে।

দুঃসংবাদ আছে ভাই, খবর পেলাম শীঘ্রই তোমাদের এ বাগানে পুলিশ খানাতল্লাসী করতে আসবে। বোমার বিস্ফোরণে নিরীহ কেনেডি পরিবার ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় এবং ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর দুঃসাহসিকতায় ব্রিটিশ প্রভুর টনক নড়েছে।

ধরপাকড়, খানাতল্লাস, কারাদণ্ড: সরকারী নিষ্পেষণ সুরু হয়েছে দিকে দিকে।

তোমরা এক কাজ করো, বাগান ছেড়ে কয়েকদিন তোমরা না হয় অন্যত্র গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে থাক।

ক্ষেপেছো এই রাত্রে? ঠ্যাং ধরে টেনে বাগান হ'তে বের না করে দেওয়া পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি। একজন বলে উঠে।

* * *

গ্রীষ্ম রাত্রি শেষ হয়ে এল। পূর্বাকাশে আসন্ন প্রত্যুষের রক্তরাঙা ইসারা। শুধুই কি তাই! অগ্নিযুগের রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। ক্ষুদিরামের হস্ত নিক্ষিপ্ত বোমার আগুনে তাই আকাশ লাল।

প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের বুকের রক্তের এ অরুণিমা।

সিঁড়িতে অনেকগুলো ভারি বুটজুতোর মচ্ মচ্ শব্দ শোনা গেল।

একটু পরেই বন্ধ দুয়ারে করাঘাত: Open the door!

সেই রোগা ছেলেটি উঠে দরজা খুলে দেয়।

অপরিচিত ভারী বিদেশী কণ্ঠে প্রশ্ন এলো: Your name!

Barindra Kumar Ghose!

বাঁধো ইস্‌কো।—

সুরু হলো খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার। একে একে সবাই বন্দী হয়। নীচের আম বাগানে নিয়ে গিয়ে সব জড়ো করে।

তচ্‌নচ্ হচ্ছে বাগানবাড়ী! কয়েকটি বোমা ও আগ্নেয় অস্ত্রও মাটি খুঁড়ে বের হলো।

ওদিকে ঐ রাত্রেই গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শকুনির দল আকাশে ছেয়ে ফেলল। তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে সব ছিন্নভিন্ন করে দেবে। বাংলা দেশের উপর দিয়ে যেন এক ঝড় বয়ে যায় শকুনির পক্ষ চালনায়।

অনেকেই গ্রেপ্তার হলো। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, হৃষিকেশ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পূর্ণ সেন এবং আরো অনেকে। শেষে চৌত্রিশজনের বিরুদ্ধে সুরু হলো রাজদ্রোহের মাম্‌লা।

সেই সংগে এলো কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, আর ভিড়ের মধ্যে ছিল মীরজাফরের বংশধর বিখ্যাত শ্রীরামপুরের গোঁসাই বাড়ীর একটি সুদর্শন ছেলে নরেন গোঁসাই।

বিচার ত সুরু হলো হৈ চৈ করে। কিন্তু যাদের বিচার হবে, তাদের স্বন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। একান্ত বেপরোয়া নির্বিকার।

হৈ চৈ করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চারিদিক উচ্চকিত করে কোর্টে আসে সব, আবার বিকালে সব ফিরে যায় কারাগারে। কারাগার ত নয়, এ যেন ওদেরই ঘরবাড়ী।

শ্রীঅরবিন্দ একপাশে চুপটি করে বসে থাকেন, ছেলেদের হট্টগোল বাঁচিয়ে।

ভাংগা ভাংগা মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের ইসারা। ওর বেভুল! এপথ তোর নয়।

যমুনা-পুলিনে বাঁশরী বাজে, শ্রীরাধা উন্মনা হয়ে উঠেন। মৃণ্ময়ী মা চোখের পরে ভেসে উঠেন চিন্ময়ী রূপে। এই গোলযোগের মধ্যে হঠাৎ ওদের কানে এলো এক দুঃসংবাদ।

ওদেরই দলের একটি ছেলে নরেন নাকি রাজসাক্ষী হয়ে স্বীকৃতি দেবে বলেছে।

সর্বনাশ! এ আবার কি?

চঞ্চল হয়ে উঠে অনেকেই, শান্তি সাগরে অশান্তির ঝড় জাগে। ঢেউ উঠ্‌ছে—পড়ছে—ভাংগছে!

রোগা সাধারণ চেহারার একটি ছেলে, কথা বলে খুবই কম। ভাসা ভাসা দু'টি চোখ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিরীহ শান্ত: চন্দননগরের ছেলেটি, কবে কোন্ ফাঁকে এসে এই দলে ভিড়েছিল, কেউ হয়ত তেমন নজরও দেয়নি।

এমনিই হয়, সে বলে: দেশ মুক্ত হোক আর না হোক, আমি হবো।

সত্যিই ত! তোমায় বাঁধবে কে? তুমি যে চিরবন্ধনহীন, তখনত বুঝিনি সেদিন!

নরেনের ব্যাপার শুনে, কানাইও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল হয়ত কিছুক্ষণের জন্য!

কিন্তু আশ্বাসের বাণী হয়ত ভেসে এসেছিল অলক্ষ্যে: ওঠ বীর জাগ! এ অন্যায়ের কণ্ঠ চেপে ধর! কে? কে তুমি?

আমায় চেন না বন্ধু, আমি ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম! বন্ধু, আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম।

ওদিকে চন্দননগরের একগৃহে একটি বিধবা মহিলা এ সংবাদ শুনে আক্ষেপ করছেন, কেউ কি এমন নেই, এই দুরাত্মাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়।

জননী ব্রজেশ্বরী! তুমি কি জানতে না মা, তোমারই নাড়ীছেঁড়া ধন

কানাই, তোমার মনের আশাকে পূরণ করতে অলক্ষ্যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। শয়তানে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

*　　*　　*

সত্যেনের শরীর ভাল নয়, সে হাসপাতালে, জেলের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন সকালে সবাই শুনলে, কানাইয়েরও শরীরটা খারাপ লাগছে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে কানাই হাসপাতালে চলে গেল।

রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
বীর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

শৃংখলিতা দেশ-মাতৃকার মুক্তির বেদনায় যাদের অন্তর কেঁদেছিল এবং যারা সেই মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে অবহেলে হাসিমুখে দিয়ে গেল প্রাণ, এমন বীর সৈনিকদের মধ্যে যাদের আমরা কোনদিনই ভুলতে পারবো না, আজ এই স্মরণিকার পাতায় পাতায় তাদেরই ছবি বার বার ফুটে উঠ্‌ছে: ক্ষুদিরাম, কানাই, প্রফুল্ল, সত্যেন, এদের বুঝি তুলনা নেই! এদের মধ্যেও সবার চাইতে বেশী মনে পড়ে, কানাই আর ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম সেই মাত্র উনিশ বছরের তরুণ কিশোর, আজিও পুণ্যতোয়া গণ্ডকের তীরে যার চিতা-ভস্ম বায়ুভরে ভারতের দিক হ'তে দিগন্তে উড়ে উড়ে যায় অলক্ষ্যে স্মৃতির নীল নভোতলে। যার পুণ্য স্মৃতির সুরভি বিথার আজিও বাংলার উদাসী বাউলের একতারায় ও কণ্ঠে কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে চলেছে, এবং বহু জনবিপ্লবীর ঊর্ধ্বে যার আসনটি পাতা রইলো, চিরদিনের চিরকালের জন্য, তারই পাশে দেখি আমাদের কানাইকে যেন।

মনে পড়ছে কংসের অন্ধকার কারাগৃহের এক ক্ষুদ্র কক্ষে দেবকীর গর্ভে এক মহাবীর্যবান পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন; কংসের অত্যাচারে জর্জরিত পৃথিবীকে রক্ষা করতে।

আজিও আমরা সেই পুণ্য দিনটিকে ভক্তিনতচিত্তে স্মরণ করি: জন্মাষ্টমী।

১৮৮৭র ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন, বহুবর্ষ পরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে চন্দননগরের এক অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে জননী ব্রজেশ্বরীর কোল জুড়ে জন্ম নিল এক শিশু। অনাগত বিপ্লবের বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ—যে স্ফুলিংগ কিছুকাল ধরে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে থেকে সহসা ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর প্রজ্বলিত

মহাগ্নিশিখায় আত্মপ্রকাশ করে, চির অনির্বাণ, চির ভাস্বর হয়ে গেল ২রা নভেম্বর।

১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর : আলিপুর জেল হাসপাতাল।

রাজপক্ষের সাক্ষী নরেন গোঁসাই, আজ হয়ত অনেক গোপনীয় কথাই আদালতে প্রকাশ করবে। অতএব সত্যেন মন স্থির করে ফেললে : যেমন করেই হোক সাক্ষী দেওয়ার আগেই নরেনকে শেষ করতে হবে। মারণ অস্ত্রও পৌঁছে গিয়েছে।

কানাই চুপি চুপি বলে : আমিও তোমার সাথী হবো।

সত্যেন প্রথমে রাজী হন না, কিন্তু পরে কানাইয়ের পীড়াপীড়িতে মত দেন।

ঠিক হলো প্রথমে সত্যেন মারবেন, এবং তিনি ব্যর্থ হলে, কানাই।

জেল হাসপাতালে দোতালার ওপর,, সিঁড়ির পাশে সত্যেন চুপটি করে বসে আছে নরেনের প্রতীক্ষায়, উদ্বেলিত হৃদয়।

আর কানাই একটা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে জেলহাসপাতালের ডিস্‌পেনসারির পাশে সিঁড়ির সামনে পায়চারী করছে অন্যমনা। নরেন এলো, সংগে দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী গার্ড।

সত্যেনের সংগে আজকাল ওর খুব ভাব, সত্যেন ওকে আশ্বাস দিয়েছে, এ ঝামেলা আমার পোষাবে না, আমিও ভাই তোমার মত রাজসাক্ষী হবো।

তাই প্রত্যহই হচ্ছে দু'জনে কত শলা-পরামর্শ আজও নরেন এসেছে সত্যেনের সংগে পরামর্শ করতে।

আচম্‌কা যেন মেঘাবৃত আকাশে দামিনী ঝলক দেখা দিল : বুকের সামনে উদ্যত পিস্তল সত্যেনের হস্তধৃত!

ট্রিগারের শব্দ উঠ লো খুট্ করে, কিন্তু ওকি কার্তুজত আগুন দিল না!

ব্যর্থ হলো সত্যেনের প্রচেষ্টা। কিন্তু পালাবে কোথায় শয়তান বিশ্বাসঘাতক!

বাঘের মত লাফিয়ে এল কানাইলাল। প্রাণভয়ে পাগলের মত ছুটছে নরেন, এক এক লাফে একটার পর একটা সিঁড়ি ডিংগিয়ে।

দুম্। দুম্ দুড়ুম্!······

সচকিত আতংকিত হয়ে উঠে সমগ্র জেলটি। ঢং ঢং ঢং পাগলাঘণ্টি বেজে চলে মুহুর্মুহু!··

দে দোল দোল! দে দোল! বাসুকী স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

১৮৮৭র জন্মাষ্টমী তিথির আজ ব্রত উদ্‌যাপন হলো ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৮ য়ে।

বিশ্বাসঘাতক তার পাপের মাশুল মিটিয়েছে কড়ায় গণ্ডায় : অসাড় নিঃস্পন্দ, গোঁসাই বংশের কলংকই শুধু নয়, দেশের ও জাতির কলংক নরেন গোঁসাই, অগ্নিযুগের মিরজাফরের স্বপ্ন-সাধ মিটেছে।

কানাই ও সত্যেনকে হাসপাতাল হ'তে ৪৪ ডিগ্রীর দিকে নিয়ে গেল।

মরণজয়ীদের বিচার স্বরু হলো।

তুমি দোষী কি নির্দোষ।

I decline to plead not guilty। নরেনকে আমিই খুন করিয়াছি। সত্যেন এব্যাপারে কোনরূপেই লিপ্ত ছিল না, যদিও সে সেখানে ছিল।

Revolverটি কোথায় পেলে ?

কোথায় পেয়েছি ? মৃদু হাসি ফুটে ওষ্ঠের পরে : ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে ওটি দিয়ে গিয়েছে।

জজ সাহেবের রায় ঘোষিত হলো : কানাই ও সত্যেনের মৃত্যুদণ্ড।

একটি দু'টি করে দিন, মাস, বৎসর চলে গেল। কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শরৎ, কত হেমন্ত, কত শীত এলো গেল।

পুরাতন পৃথিবী, একঘেয়ে পৃথিবী ঘুরে চলেছে তেমনি তার চির চেনা চক্রপথে।

দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে আকাশ যেন পুড়ে একেবারে খাক্ হয়ে যাচ্ছে।

সূর্য মধ্যগগনে : নীল নভোতল যেন সূর্য কিরণে চোখে ধাঁধা লাগায়।

হিরণ্ময়ীর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মাষ্টার একবার আড় চোখে দেখ্‌লে : কাঁদুক ! বাধা দিয়ে লাভ কি !

মাষ্টার বাইরের দিকে তাকায় খোলা জানালা পথে : ধূ ধূ করছে একটা খোলা মাঠ। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদল ওখানে অসংখ্য টেম্পরারী সেড্ তুলে সন্যনিবাস তৈরী করেছিল। দিবারাত্র নাকি ঐ সামনের রাস্তাটা কাঁপিয়ে বড় বড় লরি ছুটতো, উড়্‌তো ধূলো। সে কি শব্দ। যুদ্ধ থেমে গেছে আজ, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে ভারতে, চলে গিয়েছে তারা।

এখানে এবারে নতুন বসতি হবে, তারই তোড়জোড় চলেছে। ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়াটা !

হলুদ ধোঁয়ার মত রৌদ্র, মাথাটার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে। গ্রীষ্ম হাওয়ায় ঘুম ঘুম পায়ঃ দু' চোখের পাতা বুজে আসে।

অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলোর শিখা। আলোর শিখাটা কাঁপছে থির্ থির্ করে। অস্পষ্ট আবছা এক নারী মূর্তি! শুভ্র থান পরিধানে, কারা-কক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছেঃ কে? জননী ব্রজেশ্বরী না?

ধীর অকম্পিত পদবিক্ষেপে ব্রজেশ্বরী একটি অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। একটি তরুণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে গীতা পাঠ করে চলেছে।

কানাই।

কে,…মা?

তোকে একবার দেখতে এলাম বাবা?

আমার জন্য কিছু ভেবো না মা! আমি বেশ আছি।

তোর কি খেতে ইচ্ছা হয়, বল্‌ত বাবা?

যা দরকার সব-কিছুইত পাচ্ছি মা আরত আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।

* * চোখের 'পরে যেন স্বপ্নের মত ছবি ভেসে উঠ্‌ছে। রাত্রি শেষ হয়ে এল। পূর্বাচলে উষার রক্তিম রাগ। নগ্নপদে কারা ঐ নিঃশব্দে গংগার ধারে জেলখানায় ছোট্ট যে দুয়ারটা দিয়ে মেথররা যাতায়াত করে, সেখানে এসে দাঁড়াল।

গংগায় বোধ হয় জোয়ার এলঃ কল কল ছল ছল শব্দ ভংগ।

শুকতারাটা এখনও আকাশের এক প্রান্তে জল জল করছে, নেভেনি!

সহসা শংখধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ আকুল হয়ে উঠেঃ আজ যে ৮ই নভেম্বর।

গংগার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত শীত করে।

ওদিকে তখন জেলের মধ্যেঃ প্রহরী ছোট্ট একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রস্তুত!

হাঁ। আমি প্রস্তুত।

মর্ত্যলোক হ'তে সে ধ্বনি সংগীতের মূর্চ্ছনার মত মহাশূন্য পথে ভেসে গেল বুঝি অদৃশ্য কোন সুরলোকেঃ হাঁ। আমি প্রস্তুত!

হোমাগ্নি শিখার মত ঊর্ধ্বে উঠ্‌ছে যেন ওংকারধ্বনিঃ আমি প্রস্তুত!

কতকাল চলে গেল, আজিও কি প্রস্তুতির শেষ হলো না : ভারতের মাটিতে বিদ্রোহের এ প্রস্তুতি কি কোন দিনই শেষ হবে না। ভারত কি চিরদিন এমনি বিপ্লবের পথেই চলবে!

রাত্রির শেষ। আলো ছায়ায় অপূর্ব এক জ্যোতি-শিখা!

জানিনা ভগবান, তুমি সত্যিই আছো কিনা? তোমায় দেখিনি, তোমায় জানি না। যে শুচি ও নির্বিকল্প শান্তির মধ্যে তুমি ধরা দেও, তারও হদিস্ পাইনি কোন দিন। কেবল শুনেছি সেই মহামানবদের জীবনী প্রসংগে, যারা তোমায় উপলব্ধি করতে পেরেছে, যারা আস্বাদন পেয়েছে তোমার সত্য সুন্দর স্বর্গীয় আনন্দানুভূতির তারাই নাকি সত্যিকারের অমৃতের পুত্র!

আজ এই রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে, নির্জন ভাগীরথী তীরে যাকে আমরা বুক পেতে নিতে এসেছি, তখনও ত জানিনা সেও পেয়েছিল অমৃতের সন্ধান!

অমৃতের পুত্র!

ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গলিপথে ধরাধরি ক'রে বয়ে নিয়ে এল বস্ত্রাবৃত একখানি দেহ!

নিঃশব্দে চুপে চুপে।

অশ্রু দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করে দিও না : এ স্বর্গীয় দৃশ্যের আধিকারী হ'তে দাও ক্ষণেকের তরে। নিঃশব্দে শব দেহটিকে বহন করে এনে তুলে দেওয়া হলো শ্মশানযাত্রীদের হাতে। এই নাও! তোমাদের কানাইলাল!

মুখের 'পর হ'তে আচ্ছাদন অপসারিত হলো : আহা! যেন এক স্তবক প্রফুল্ল কমল। চিন্তা নেই, বিষাদের ছায়া মাত্র নেই, নেই এতটুকু চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস।

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান! জীবন ও মৃত্যুর অপূর্ব সন্ধি! ভগবান অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে সেই অনন্ত ভগবানের লীলাও বুঝি অনন্ত।

Long live Kanailal!

নিঃশব্দে শ্মশানযাত্রীরা শবদেহ বহন করে এগিয়ে চলেছে : কানাইয়ের অগ্রজ আশুবাবু, বন্ধু মতিলাল রায়!

আশুবাবুর কানে সেই ইউরোপীয় ওয়ার্ডারের কথাটি যেন এখনও ঝম্ ঝম্ করে বাজছে! বিদেশী সে, তবু সে জানে দিতে সৈনিকের সম্মান : He is a wonderful chap!

আর মতিলাল ভাবছেন, কানাইয়ের সেই কথাগুলি : মনে করো না জেলে পচবার জন্য এই কাজে নেমেছি, আন্দামানে বা ফাঁসী কাঠে নিরীহ মেষের মত

প্রাণ দিতে জন্মেছি। তাই কি কানাইয়ের ফাঁসীর পর একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি এসে বারীনকে জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?

সূর্য উঠ্‌ছে! রক্তাক্ত সূর্য। কানাইয়ের প্রাণের রক্তে রাঙান ১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বরের তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠন তলে নব অংশুমালী।

রাজপথ 'পরে যেন আর লোক ধরে না। ঘরে ঘরে বাতায়ন যায় খুলে।

শুভ শংখধ্বনিতে আকাশ ও বাতাশ মুহুর্মুহু মথিত হয়।

পুষ্পমাল্য বরিষণ! নিক্ষিপ্ত হচ্ছে মুঠি মুঠি পুষ্প ও অসংখ্য গীতা।

সমস্ত কলকাতা সহর যেন বাধ-ভাংগা বন্যার মত আলোড়িত হয়ে ছুটেছে শবদেহের পিছু পিছু।

পুষ্প মাল্যে চন্দন কাষ্ঠে সুগন্ধি ঘৃতে বহ্নিমান চিতা।

শোকাশ্রু মোচন করছে হাজারো নরনারী সেই প্রজ্বলিত চিতা পার্শ্বে।

স্মৃতির তাজমহল আমাদের পুণ্যেতোয়া ভাগীরথী তীরে রচিত হলো কানাইয়ের চিতাভস্মে তাই বুঝি।

একটি চিতার আগুন নিভ্‌তে না নিভ্‌তে দ্বিতীয় চিতার আগুন উঠ্‌লো জ্বলে ২৩শে নভেম্বর, শহীদ সত্যেনের নশ্বর দেহ ঘিরে।

Kanai was brave, but Satyen was braver!

বৃটিশ সিংহ ভীত ত্রস্ত! ভারতের মাটিতে না জানি কি সর্বনাশার বীজ ছড়িয়ে আছে। ভারতে কায়েমী স্বার্থের লোহার ভিত্‌টা বুঝি নড়ে উঠে।

কে জানত একটি সাধারণ বাংগালী যুবকের মধ্যে এত বড় প্রচণ্ড অগ্নি-স্ফুলিংগ লুকিয়ে আছে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ্‌!

অগ্নিযুগের দ্বিতীয় বিপ্লবের, প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের মন্ত্রগুরু সত্যেন্দ্রনাথ!

ভাংগাচোরা স্বাস্থ্য, নিরীহ গোবেচারী গোছের একটি তরুণ, যার সম্পর্কে ডাক্তাররাও সন্দেহ করেছেন, ছেলেটি বুঝি ক্ষয় রোগে ভুগছে। হয়েছিল ক্ষয় রোগ কিছুদিন। তবু সেই রোগজর্জর দেহ যেন জানত না কোনদিন ক্লান্তি এতটুকুও। নিঃশব্দে ১৯০২ সালে একজন বিপ্লবী নেতার হাতে তার দীক্ষা

হয়েছিল মেদিনীপুরের কোন এক নিভৃত গোপন কক্ষে। গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হলো রক্তের স্বাক্ষরে।

সত্যেন আর বারীন কিন্তু মামা আর ভাগ্নে। অনেক সময় মতানৈক্য দেখো দিয়েছে মামা ও ভাগ্নের মধ্যে : তবু দেশকর্মী অচল, অটল। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতার গুপ্ত সমিতির মধ্যে কাজ করে, মতানৈক্যে সত্যেন আবার ফিরে এলো মেদিনীপুরে। একটি অন্ধকার তেতলা পোড়ো বাড়ী : সমিতির আস্তানা।

সেখানে এসে একে একে জোটে সত্যেনের পাশে ক্ষুদিরাম, শচীন ও নিরাপদ রায়। ছেলে ত নয়, যেন খাপখোলা এক একটি বাঁকা তলোয়ার। প্রদীপ্ত বহ্নি-শিক্ষা। আস্তানায় প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী কালীমূর্তির চোখ দু'টো ঝলমল্ করে। তোরা আমারই সন্তান।

ঘাত প্রতিঘাত! সমুদ্র বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

অবশেষে সামান্য সন্দেহের অজুহাতে সত্যেন ধরা পড়ে অতর্কিতে।

মেদিনীপুর জেলের মধ্যে বসেই সত্যেন সংবাদ পেল তার প্রিয় শিষ্য ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেছে ১১ই আগষ্ট!

দু'বিন্দু অশ্রু হয়ত গড়িয়ে পড়েছিল অলক্ষ্যে দু'চোখের কোল বেয়ে সত্যেনের।

তারপর একদিন সেখানে হ'তে তাকে আনা হলো আলীপুর জেলে।

দু'দিন না যেতেই রুগ্ন স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে সত্যেন গেল জেল হাসপাতালে।

আচম্‌কা একদিন তার কানে এলো নরেন গোঁসাইয়ের কুকীর্তি!

বলে কি? Approver হবে নরেন গোঁসাই!

যে একদা রক্তচন্দনের তিলকে বিপ্লবে দীক্ষা নিয়েছিল, কেমন করে যে সেই নরেন গোঁসাই আবার একদিন নিজের সর্বাংগে কলংককালি লেপন করে সেই সংগে সমগ্র জাতির ভালে এঁকে দিলে দুরপনেয় কলংকমসী সেও হয়ত এক রহস্যই! সে রহস্যের মীমাংসা হলো অল্পদিনের মধ্যেই পিস্তলের অগ্নি-ঝলকে!

দিনের পর দিন আত্মীয়ের চোখের জল, স্ত্রীর অশ্রুসজল মিনতি, নরেনকে হয়ত বিচলিত করেছিল। কিন্তু আরো যারা সেদিন তার দলে ছিল তাদের, কই বিচলিত করতে ত পারেনি এতটুকুও! তাদের সমগ্র দৃষ্টি জুড়ে কেবল মাত্র একটি কথাই জেগেছিল, স্বদেশ আমার, জননী আমার।

জননী আমার। আমার পরাধীন দেশ-মাতৃকা।

সেখানে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, নেই কোন বন্ধন, মায়া-মমতার পিছুটান, তাই হয়ত তাদের সকল কিছুর মীমাংসা দেশপ্রেমের মধ্যে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

নির্বিকল্প সন্ন্যাসী দেশপ্রেমের সন্ন্যাসে সর্বত্যাগী!

সত্যেন অস্থির হ'য়ে উঠে : এ সর্বনাশ কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না।

নিঃশব্দে গোপনে এল মারণ অস্ত্র! মৌখিক সৌজন্যের ছদ্মবেশের তলে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়।

এগিয়ে আসছে বিচারের নির্মম অনুশাসন : ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সাল।

ইউরোপীয় বন্দী ও দেহরক্ষী হিগিন্‌সকে নিয়ে অন্যান্য দিনের মত নিঃশংকচিত্তে নরেন এলো সত্যেনের কাছে। সত্যেন তাকে আশ্বাস দিয়েছে, সেও নরেনের মতই রাজসাক্ষী হবে। রাজসাক্ষী নয়, হতভাগ্যের পাপমুক্তির শেষসাক্ষী!

দু'জনে কথা বলছে, সহসা এমন সময় ছোট এতটুকু এক ইস্পাতের নলের ছিদ্রমুখে ঝলকে উঠে মৃত্যুর অগ্নি-শিখা। ব্যর্থ হলো সত্যেনের লক্ষ্য! এলো এগিয়ে ব্রজেশ্বরীর স্নেহের দুলাল কানাই।

* * * *

এগিয়ে আসছে ক্রমে সেই চরম দিনটি।

ইংরাজের বিচারে সত্যেনের ফাঁসীর দিনটি : ২১শে নভেম্বর।

কানাই চলে গিয়েছে : পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তটে তার চিতাভস্ম আজিও ছড়িয়ে আছে।

২১শে নভেম্বরের সেই প্রভাত এলো। জল্লাদের বেশে আমরাই বিদেশী রাজার অনুশাসনে আমাদের সত্যেনের গলায় এঁটে দিলাম ফাঁসীর রজ্জুটি! আমাদের হাত একটুও কাঁপেনি সেদিন!

৭ই নভেম্বর, ৮ই নভেম্বর, ৯ই নভেম্বর

তিনটি দিনই স্মরণ আছে আমাদের আজিও।

কেন তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজারকে যতীন্দ্র চৌধুরী হত্যা করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, আর যতীন্দ্রকে ধরিয়ে দিল বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব।

মহারাজের তক্ততাউস সম্মানিত হয়েছিল নিশ্চয়ই!

ইংরাজ প্রভু পিঠও চাপড়ে দিয়েছিল : বাহবা ! জিতা রহো বেটা !

পর দিন : ৮ই প্রত্যুষে এক মহাজ্যোতিষ্কের কক্ষচ্যুতি হলো ফাঁসীর দড়িতে !

৯ই কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হলো নন্দলালের বক্ষ রক্তে বিপ্লবীর অলক্ষ্য হস্ত নিক্ষিপ্ত পিস্তলের অগ্নি ঝলকে।

নরেন গোঁসাইয়ের মত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুকের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে। বেচারা (?) নাকি তার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানাতে চলেছিল, অথচ জানতে পারেনি যে তার পারঘাটের নিমন্ত্রণ পত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেছে আগেই নিয়তির দুর্লংঘ লেখনীতে। মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী !

হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরাজ সরকার দেশবাসীর ’পরে : কঠোর দমন নীতি ! ফাঁসী, কারাগার, আন্দামান ! অজস্র বেতনভুক্ত শকুনিতে দেশের আকাশ কালো হ’য়ে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির পক্ষ নিয়ে আদালতে এসে দাঁড়ালেন।

দেশবন্ধু ! যে অগ্নিস্ফুলিংগ একদিন পরবর্তীকালে দেশপ্রেম ও বৈরাগ্যের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হ’য়ে ব্রিটিশ সরকার ও সমগ্র দেশবাসীকে অভিভূত করেছিল, প্রথম তার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আদালতে আত্মপ্রকাশ। ঢাকা জিলার তেলীরবাগের দাশবংশের স্বর্ণ দেউটি !

যার স্মরণিকায় ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গেয়েছিলেন :

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি
করে গেল দান॥

ইংরাজের আদালতে বিচার প্রহসন শেষ হলো : বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড।

উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায় এদের সকলের প্রতি আদেশ হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নয় বৎসরের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হলো পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ ও নিরাপদ

রায়ের, এবং অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানের ও শিশির সেনের হলো সাত বৎসর দ্বীপান্তর।

কৃষ্ণজীবন সান্ন্যালের এক বৎসর কারাদণ্ড। সতের জনের মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আবার আপীলে বারীন ও উল্লাসের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। হেমচন্দ্র ও উপেন বাড়ুয্যের দণ্ড পূর্ববৎ বহাল থাকে। তবে অন্যান্য যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। অপর সকলের কিছু কিছু কমে যায়। বালকৃষ্ণ কানে মুক্তি পান।

১৯০৭-১৯০৮ অগ্নিবিপ্লবের প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ। দেশোদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টার ইতি!···যে সতের জন বিপ্লবীকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাদেরই অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ।

হাইকোর্টের রায় বের হবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আন্দামান যাত্রীরা কারাগৃহের মধ্য হ'তে শেষবারের মত তাহাদের প্রিয় জন্মভূমিকে দেখে জাহাজের অন্ধকার কয়েদী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলে। বংগোপসাগরের সুনীল জলধি মথিত করে অর্ণবপোতটি ভেসে চলে।

বিদায় জননী, বিদায়: Adieu! my native land adieu! হে আমার জন্মভূমি দূরযাত্রীর প্রণাম লও! * * পড়ে রইলো পশ্চাতে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেনের স্মৃতি: জাহাজ ভেসে চলে আন্দামানের দিকে কালাপানি পার হয়ে।

জাহাজ এসে যখন চতুর্থ দিবসে তীরে ভীড়ল, একজন স্থূলকায় খর্বাকৃতি ফিরিংগী ওদের দিকে তাকিয়ে বললে: Well! you see that block yonder! It is there that we tame lions!

হাঁ ঠিকই। কঠিন সত্যটিই অন্তর হ'তে ফুটে বের হয়েছিল ফিরিংগীর। অযোধ্যা হ'তে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছিলেন সত্যের পালনে, শ্রীরামচন্দ্র যদি আমাদের পূজা পেয়ে থাকেন, সেদিনকার ঐ নির্বাসিতরাও চিরদিন আমাদের পূজা পাবে। পাবে আমাদের চিত্তের অকুণ্ঠ প্রণাম। কারণ তারাও জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সত্য পালনের জন্য নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছিল নিজ জন্মভূমি হ'তে দূর কালাপানি পারে আন্দামান দ্বীপে।

সেদিনকার সেই নির্বাসিতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আবার আমরা কালাপনি পার হয়ে ফিরে যাই বাংলার মাটিতে, যে মাটিতে তারা বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে গেল স্বাধীনতার অংকুরোদ্গমের আশায়।

* * * দেশপ্রেম যে অপরাধ নয়। শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিই বোধ করি তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নবীন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের যুক্তিকে আদালত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শার্দুলের হুংকারের মত চিত্তরঞ্জনর কণ্ঠ হ'তে যে আবেদন সেদিন বলিষ্ঠ দাবী জানিয়েছিল, পরাশ্রিত পদানত নির্জীব সমগ্র বাংগালী তথা সমগ্র ভারতীয়ের পক্ষ হ'তে সে দাবীর রেশ যেন আজিও বহুবছর পরেও দেশ ও জাতির মর্মে মর্মে ঝংকৃত হয়ে ফিরছে ওংকার ধ্বনির মত। আজকে নয়, অনেক দিন পরে, যেদিন বিস্মৃতির গর্ভে আজিকার এই মতানৈক্য তলিয়ে যাবে, আজিকার এই বিচারের মত-বিভেদ লোকে ভুলে যাবে, এবং আজকের দিনে যাকে নিয়ে এত গোলমালের ও বিভেদের সৃষ্টি, সেই শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় নেবার বহুকাল পরেও 'দেশপ্রেমের কবি' বলে, জাতির ভবিষ্যৎ বক্তা ও বিশ্বপ্রেমের প্রতীক বলে তার স্মরণিকায় বিশ্ববাসী প্রণাম জানাবে ভক্তি-লুণ্ঠিত অশ্রু-নীরে। তার তিরোধানের বহুকাল পরেও তার অমৃত মধুর বাণী কেবল মাত্র ভারতেই নয়, বহু সাগর ও ভূমি পার হয়ে গিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে দূর দূরান্ত।

মিথ্যা হয় নাই সেদিনকার সেই তরুণ আইনজীবীর কথা: সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রণাম তাই একদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে ও সুরে:

'অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!···
হে বন্ধু, হে 'দেশবন্ধু,' স্বদেশ আমার···

মুক্তি লাভ করেই শ্রীঅরবিন্দ, এলেন চিত্তরঞ্জনের বাসভবনে: দু'জনে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলো। দু'জনেই পরস্পরের প্রতি চেয়ে থাকেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টিতে হয়ত পরস্পরের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। এরপর অরবিন্দ সেই সময়কার রাজনীতিতত্ত্ব প্রচারে নিজেকে নিয়োগ করলেন। বারীন, উল্লাস, উপেন প্রভৃতি সুদূর দ্বীপান্তরের লোহার বেড়ী পরে ফিরিংগীর অকথ্য অত্যাচারে দেশপ্রেমের মাশুল দিচ্ছে। অশ্বিনী বাবু, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি নেতারা অন্তরীণাবদ্ধ, লোকমান্য তিলক সুদূর মান্দালয় জেলে আবদ্ধ। মর্দিতপুচ্ছ শার্দুলের মত শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে তখন অপমান ও ব্যর্থতার খাণ্ডবদাহন চলেছে।

'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে লেখনী মুখে সেই নিরন্তর দহনের অগ্নি-স্ফুলিংগ আত্মপ্রকাশ করলে: আমরা ত' বে-আইনী করি

না। আমাদের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট ভারতের স্বাধীনতা। যাহারা চণ্ডনীতিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আসিবার আবশ্যক নাই। যাহারা একান্ত তোষণনীতির অনুগামী, তাহারাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক; কিন্তু আমাদিগকে, লক্ষ্য স্থলে পৌছিতেই হইবে।

সহসা অতর্কিতে আবার অগ্নি-স্ফুলিংগ দেখা দিল : ১৯১০ : ২৪শে জানুয়ারী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ, বহু কুকীর্তির হোতা পুলিশের ডিঃ সুপারিন্‌-টেনডেণ্ট্ শামসুল আলম হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। অতর্কিতে একটি তরুণ সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হয় : Are you Shamsul Alam !

Yes !

Here you are ! সংগে সংগে ছোট্ট একটি আগ্নেয়াস্ত্র আকস্মাৎ অগ্নি-উদ্গীরণ করে! গুড়ুম্!...

উৎক্ষিপ্ত ধূম্ররাশির মধ্যে রক্তাক্ত শামসুল আলম সিঁড়ির 'পরে গড়িয়ে পড়ে : শেষ কাতরোক্তির সংগে।

দেশদ্রোহীর চরম পুরস্কার! যুবক ধরা পড়ে। সেদিনকার সেই নির্ভীক তরুণ কে? বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত! বিচারে তার ফাঁসী দেওয়া হয়। ঘটনায় প্রকাশ পায় বীরেন্দ্র, যতীন্দ্র মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়েই নাকি শামসুল আলমকে হত্যা করে, যতীনের সংগে অরবিন্দের যথেষ্ট সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠতা।

অতএব দোষ অরবিন্দরই : বৃটিশের রোষকষায়িত দৃষ্টি গিয়ে অরবিন্দের প্রতি পতিত হলো। ১৯০৯ : ১০ই ফেব্রুয়ারী আরো একটি অগ্নি-স্ফুলিংগ দেখা দিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস। মামলার সময় ঐ মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সাহেবকে বুঝিয়ে দিত। শুধু তাই নয় আশু বিশ্বাস, কানাই ও সত্যেনের মোকদ্দমায়ও সরকার তরফে থেকে ওকালতী করেছে। খরচের খাতায় আশু বিশ্বাসের নাম আগেই উঠে গিয়েছিল।

গোপন সভায় তার চরমদণ্ডের দিনও ধার্য হয়ে গিয়েছিল। বেলা প্রায় পৌনে চারটে, আলিপুর সুবারবন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত। কাজকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে, আদালতের পূর্বদ্বারে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আশু বিশ্বাস গাড়ীতে উঠ্‌তে যাবে, মৃত্যুদূত গর্জে উঠ্‌ল : গুড়ুম্।

লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। প্রাণভয়ে আশু বিশ্বাস লাইব্রেরীর দিকে মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়ায়।

আবার পিস্তলের গর্জন শোনা গেল, লক্ষ্য বর্থ হলনা সেবার।

হতভাগ্য বুকের রক্ত দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

অনেকেই হয়ত আজ সেই বীর দেশ-পূজারীর নাম পর্যন্ত জানেনা।

বহুকাল পরে নমস্কারের সংগে সংগে তার নামটি আবার উচ্চারণ করছি : চারুচন্দ্র বসু! খুলনা জিলার শোভনা গ্রামে বাড়ী।

ছেলেটি ছিল বিকলাংগ : দক্ষিণ হস্তটি ছিল নুলো।

ক্ষমতা পর্যন্ত নেই দক্ষিণ হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র ধরবার। কাজেই হাতের সংগে দড়ি দিয়ে অস্ত্রটি বেঁধে রেখেছিল।

কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে গুরুভার বিপ্লব-সমিতি তার স্কন্ধে বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিল, তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি।

চারুচন্দ্র ধরা পড়লো পুলিশের হাতে।

পরের দিনই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা উপস্থাপিত করা হলো :

হুকুম জারী হ'লো : মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ করা হোক।

নির্ভীক তরুণ বললে : দায়রায় পাঠাচ্ছেন কেন? আমাকে কালই ফাঁসী দিন্!

* * ফাঁসীর দড়িতেই চরুচন্দ্রের বিচার শেষ হয়, ইংরাজের আদালতের সু-বিচারে।

আগুন যেন নিভেও নেভে না।

ফাঁসীর রজ্জুকে উপহাস করে, দূর কালাপানি পারে অন্দামানের লৌহবেষ্টনী ও শত প্রকারের নির্লজ্জ কুশ্রী অত্যাচারকে ব্যঙ্গ করে যেন থেকে থেকে তবুও বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিংগ আকাশে ফুটে উঠে প্রোজ্জ্বল রক্তিমাভায়।

ভারতের মাটি হ'তে অলক্ষ্যে অগ্নি-স্ফুলিংগ উড়ে গেল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে মহামান্য ব্রিটিশ বাহাদুরের খাস রাজধানী লণ্ডন সহরে পর্যন্ত।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হউসের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল মদনলাল ধিংড়া : সাহসী ভারতীয় যুবক। কঠোর প্রতিজ্ঞায় তার দু'টি চক্ষু যেন আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকে। কানাই সত্যেনের চিতাভস্ম যেন তাকে গিয়ে স্পর্শ করেছে : লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের জাহাঙ্গীর হল : [illegible] উৎসব সেদিন! গীত-বাদ্যে হাস্যে-লাস্যে হলঘরটি আনন্দমুখর বহু অভ্যাগতের উপস্থিতিতে

১লা জুলাই রাত্রি আটটা। বাইরে আলোকমালায় শোভিত কর্মব্যস্ত লণ্ডন নগরী। প্রীতিভোজের উৎসব সভায় বহু অভ্যাগতের মধ্যে লণ্ডনস্থ ভারত দপ্তরের [illegible] এ. ডি. সি. এবং ভারত-সচিব লর্ড মর্লির অন্যতম সহকারী কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিও উপস্থিত।

উৎসব তখনও শেষ হয়নি, লঘুচিত্তে কার্জন ওয়াইলি হাসিমুখে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পাশে পাশে মিষ্ট হাসির সংগে কথাবার্তা বলতে বলতে, মদনলাল ধিংড়া। হঠাৎ কোথা হ'তে কি হলো: মুখের হাসি রূপান্তরিত হলো অবিমিশ্র ঘৃণার বিদ্যুতে। তড়িদ্‌বেগে ওভারকোটের পকেট হ'তে মদনলাল কার্জনের অলক্ষ্যে ছোট্ট একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে উচিয়ে ধরল কার্জন ওয়াইলির প্রতি।

পিস্তলের অগ্ন্যুদ্‌গারের সংগে সংগে চারিদিক সচকিত হয়ে উঠে, গুড়ুম্! ওয়াইলীর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল রক্তাপ্লুত হয়ে।

মদনলাল আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়। মদনলাল ধৃত হলো।

ধৃত অবস্থায় তার পকেট অনুসন্ধান করে কতকগুলো কাগজ পাওয়া যায়: তার মধ্যেই পাওয়া যায় কার্জন ওয়াইলীর হত্যার নিদর্শন: 'ভারতীয় যুবকদের প্রতি নির্বিচারে কারা ও প্রাণদণ্ডের আদেশের ক্ষীণ প্রতিবাদ হিসাবে আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ইংরাজের রক্ত মোক্ষণের চেষ্টা করিলাম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক হত্যা একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।' স্তম্ভিত হয়ে যায় সমগ্র লণ্ডনবাসী। চারিদিক ঘোর সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠে।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্যারিস হ'তে Times কাগজে লিখলেন:...আমি এইরূপ হত্যাকে হত্যা (murder) আখ্যা দিতে পারি না। আমার মতে যাঁরা এইরূপ রাজনৈতিক হত্যানুষ্ঠান করেন, তারা প্রকৃতই ধর্মার্থে কার্য করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্যেই দেশ স্বাধীন হইবে। দেশের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত বলিয়া ইহা গর্হিত হইতে পারে না।......আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, ইংরাজ যদি ভারত ত্যাগ না করে, তবে তাহাদের ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

Erelong there will be a catastrophy which will stagger humanity unless the British withdraw from India!

ইংরাজের দেশের মাটিতে, ইংরাজের আদালতে, ইংরাজের তৈরী আইনে বিচার সুরু হলো ২৩শে জুলাই। বিচার করলে লর্ড এনভারষ্টোন: রায় দেওয়া হলো: মৃত্যুদণ্ড!

সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে জন্মভূমির বহু দূরে, পরদেশীরা মদনলালের গলায় ফাঁসীর দড়ি পড়িয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে। দেশের জন্য স্বজন-পরিত্যক্ত দেশপ্রেমিক সুদূর বিদেশের মাটিতে রজ্জুবন্ধনে শেষ নিঃশ্বাসে আত্মদান করে গেল। আমরাত ভুলি নাই কোন দিনই, তারাও ভুলবে না, যারা সেদিন বিচারের নামে প্রহসন করতে বসেছিল, সেই প্রহসনের দরবারে ভারতীয় যুবকের সেই অকুণ্ঠিত ঘোষণা : Thank you my Lord I am glad to have the honour of lying for my country.

কে বলেছে মদনলাল তুমি মৃত! জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত-ইতিহাসের পাতায় তোমায় স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইবে চিরকাল।

তোমার মৃত্যুহীন অমর পায়ে ভারতবাসী চিরদিন দেবে ভক্তিনত নমস্কার। চিরঞ্জীবী নায়ক : কবির ভাষায় বলি :

মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়।

* * *

তুমি কি জান না বীর : দেহের বিনাশ ঘটলেও, তোমার 'তুমি' সেদিন যা ছিলে, মৃত্যুর পরও তোমার 'তুমি' তেমনিই আছে!

য এনং বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তে ন বিজানীতো নায়ং হন্তি না হন্যতে।

মদনলালের গ্রেপ্তারের সংগে সংগে লণ্ডনে সেই সময় মহারাষ্ট্রীয় যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের জন্য সাভারকারকে জাহাজে বোম্বাই প্রেরণ করা হয়। অকুতোভয় দুর্জয় সাহসী ঐ মহারাষ্ট্রীয় যুবক বীর সাভারকার।

ভারতের পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক। তাঁতিয়ার দেশের লোক দামোদর রাধীনতার অগ্নিময় জ্বালা তার অন্তর ও বাহিরকে সর্বদা জ্বালিয়েছে। তাঁতিয়ার আদর্শ তকেও করেছে উদ্বুদ্ধ!...

কিন্তু জাহাজ যখন দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছেচে, এমন সময় গভীর রাত্রে ঐ দুঃসাহসী যুবক জাহাজের পোর্টহোলের ফোকড় দয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরের জলে। রাত্রির অন্ধকারে সাগরের সীমাহীন

জলরাশি ফুঁসে গর্জায় : কালো জল ত নয়, যেন লক্ষ কোটি বিষধর কালনাগিনী। এতটুকু ভয় নেই, নিঃশব্দে সাঁতড়ে দামোদর ফরাসী দেশে গিয়ে উঠে, সেখানকার পুলিশের হাতে আত্মসমর্পন করলে। চোরে চোরে মাসতুত ভাই : অতএব ফরাসী পুলিশ ইংরাজ পুলিশের হাতে দামোদরকে সঁপে দিল।

* * তারপর একদিন বোম্বায়ের আদালতে দামোদরের বিচারের প্রহসন বসল। বিচারে হলো তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড !

দেশপ্রেমের পুরস্কার হলো : অন্ধ কারাগার !

* * *

তবু কি নির্বাপিত হয় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা : জ্বলে ভারতের মাটিতে আকাশে বাতাশে চির অম্লান, চির অমলিন। অত্যাচার, ফাঁসী, নির্বাসন, কিছুতেই কি ভয় নেই এদের। নাজানি কি দিয়ে গড়া এরা। তবু এরা দেবে প্রাণ, তবু মাথা পেতে নেবে চির নির্বাসন-দণ্ড, হাসিমুখে তুলে নেবে কারাযন্ত্রণার অগ্নিদাহ, সর্বাংগ পেতে নেবে নির্মম অত্যাচারের শত লাঞ্ছনা।

* * হাসিমুখে চির নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে দামোদর বিদায় নিল জন্মভূমির মাটি হতে। লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলীকে হত্যার সপ্তাহ তিনেক পূর্বে নাসিকে বিনায়ক সাভারকারের ভ্রাতা গণেশ সাভারকারের নামে 'লঘু অভিনব ভারত খেলা' নামে একখানা কবিতা পুস্তকের প্রকাশের জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ব্রিটিশ শাসকগণ তাকে ১৯০৯এর ৯ই জুন দ্বীপান্তরিত করে।

বিচার করেছিল শ্বেতাংগ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন্। বিনায়কের চির নির্বাসন দণ্ডের কিছু দিন না যেতে যেতেই মিঃ জ্যাকসনের মাথায় অকস্মাৎ নীলাকাশের বুক হ'তে নেমে এল বজ্র, চরম দণ্ড : মৃত্যু !

শ্বেতাংগর রক্তপাত! শিকারী কুকুরের দল হন্যে হ'য়ে উঠল : নির্মম অত্যাচারের চাবুক হেনে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও খানাতল্লাসী করে দুদিনেই তোলপাড় করে তুলল সমগ্র নাসিক সহরটি। বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হলো ঐ হিড়িকে। দেখা গেল একটি মাত্র শ্বেতাংগ কর্মচারীর হত্যার সূত্রটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র নাসিক সহরটি জুড়ে এতদিন ধরে গোপনে গোপনে চলছিল এক বিরাট গুপ্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা :

কিন্তু আসলে এই বিপ্লবের মূল কোথা হ'তে কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? বোম্বাই হ'তে গোয়া পর্যন্ত যে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূভাগ, তারই নাম কংকন।

এইখানে একশ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের বাস ছিল: এদের বলা হতো চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী। মহারাষ্ট্র কুলপ্রদীপ বীরেন্দ্র-কেশরী শিবাজী মহারাজের পৌত্র যখন সাতরার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় তার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কংকনের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ঐ ব্রাহ্মণই প্রধান মন্ত্রিত্বকালে পেশোয়া উপাধি নিয়ে পরবর্তী কালে দাক্ষিণাত্যের রাজা হয়ে বসেন। একজন পেশোয়ার নাবালকত্বের কালে নানা ফারনবীশ নামে একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ান। তারই আধিপত্যকালে দাক্ষিণাত্যের দেশস্থ ব্রাহ্মণদের শাসনবিভাগ হ'তে উচ্ছেদ করে চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের একে একে এনে শাসন বিভাগে নিযুক্ত করা হতে থাকে। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রীয়দের সংগে যে যুদ্ধে ইংরাজ ক্ষমতা হস্তগত করে, তাহা প্রধানতঃ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের সংগেই ঘটেছিল। ইংরাজ শক্তির কাছে অতীত অপমানের লজ্জা ও গ্লানি, যা একদা ক্রম-ক্ষীয়মাণ ক্ষমতা ও ঘরোয়া বিবাদের জন্য মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হৃতরাজ্য ও লুপ্ত আধিপত্যের মধ্যে অন্তরের অন্তঃস্থলে সঞ্চিত হয়ে তুষের আগুনের মত এই দীর্ঘকাল ধরে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, বহুকাল পরে নাসিকের 'অভিনব ভারত সমিতির' সভ্যদের মধ্যে যেন তাই মূর্ত হয়ে উঠ্‌তে চেয়েছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সেই লজ্জাকর অন্তর্বেদনারই পরিস্ফুটন আমরা পেয়েছিলাম সমসাময়িক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যেই।

তাই হয়ত মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবের বহ্নি-শিখা ফুটে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত আলোয় আমরা দেখতে পেয়েছি মুখ্যত চিৎপাবন ব্রাহ্মণদেরই পুরোভাগে: চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ, লোকমান্য তিলক, পরাঞ্জপে ইত্যাদি। একমাত্র সাভারকারই ঐ গোষ্ঠীর নন।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাতনামা মনীষী, চিরস্মরণীয় রাজনীতিক, নির্ভীক রাণাডে ও গোখ্‌লেও ছিলেন ঐ চিৎপাবন গোষ্ঠীর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই তেজস্বী, তিক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর অবদান চিরদিন থাকবে অম্লান ও স্মরণিকার পাতায় চির উজ্জ্বল চির ভাস্বর।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার সূত্র ধরে ধরে যাদের গ্রেপ্তার করে বিচার সুরু

করা হলো, তাদের মধ্যে সাতাশ জনকে কারাদণ্ড, তিন জনকে ফাঁসী দিয়ে তবে তার সমাপ্তি ঘট্‌লো।

এমনি করেই বিপ্লবের প্রস্তুতি দেশ হতে দেশান্তরে ভারতের সর্বত্র আগুনের শিখায় বিস্তৃত হ'য়ে চলেছে তখন।

কোথা হ'তে কেথায় চলে এসেছি, বিপ্লবের অগ্নি-মশাল বহন করে নদ-নদী গিরি-কান্তার বনভূমি অতিক্রম করে ছুটে চলেছি দেশ হ'তে দেশান্তরে, বিদ্রোহী ভারতের অগ্নি-জ্বালা, এ কি কোনদিনই নিভ্‌বে না?

শ্রীঅরবিন্দের বুঝি আর দেশে থাকা হলো না। গোপনে ভগিনী নিবেদিতা জানালেন: আর বিলম্ব করো না, যত শীঘ্র পার ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাও। বৃটিশ সরকার তোমাকে আবার গ্রেপ্তার করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে! এবার বিনা বিচারেই তোমাকে গ্রেপ্তার করে চির-অন্তরীণ করবার ব্যবস্থা করেছে। তোমার নামে ওয়ারেন্টও বেরিয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা হ'তে পালিয়ে চন্দননগরে গিয়ে উঠলেন। বিপ্লবী মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করে রইলেন।

তারপর একদিন এলো সুযোগ: এক গভীর রাত্রে শ্রীযুক্ত অমর চট্টোপাধ্যায় নৌকার করে গোপনে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গিয়ে সৌমেন ঠাকুরের পরিচয়ে ফরাসী জাহাজ 'ডুপ্লে'তে উঠিয়ে দিলেন। এমনি করেই এক অক্লান্তকর্মী দেশপ্রেমিককে গোপনে ফিরিংগীদের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে পণ্ডিচেরীর পথে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম সাশ্রু-নেত্রে! তারপর আরো কতদিন চলে গেল, তারপর সেই পলাতক অরবিন্দ, শ্রীঅরবিন্দ দেশের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে মানুষের বৃহত্তর মুক্তির পথ নির্দেশ দিয়ে গেলেন! প্রণাম হে ঋষি তোমায়!

আবার চল ফিরে যাই, বংলার শস্যশ্যামলা মাটিতে: যেখানে বহু রক্ত-বিপ্লবের চিহ্ন বার বার মুক্তির আশায় ঝিলিক হেনে গিয়েছে। কলিকাতায় 'যুগান্তর' দলের নেতৃত্বে বিপ্লবী গুপ্ত সংঘ গড়ে উঠার সংগে সংগে অতি গোপনে আর একটি গুপ্ত সমিতিও ধীরে ধীরে আশার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠ্‌ছিল: অনুশীলন সমিতি: যার শাখা-প্রশাখা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বাংলার মাটিতে মাটিতে গোপনে গোপনে বহু দূর পর্যন্ত রস সঞ্চার করেছিল। যদিও ঢাকা ও কলকাতাই ছিল ঐ সমিতির প্রধান কেন্দ্র। এক সময় কেবল মাত্র ঢাকাতেই ছিল অনুশীলন সমিতির পাঁচশত শাখা।

সে ১৯০৫-৬ সালের কথা : ঢাকা সহর যেন হঠাৎ প্রাণাবেগে চঞ্চল ও উর্মিমুখর হয়ে উঠেছে। সেই বংগভংগের যুগ : স্বদেশী আন্দোলন।

বিপ্লবী নেতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান পাণ্ডা পুলিন দাস ও ব্যারিষ্টার পি. মিত্র ঢাকা সহরে এসে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে গেলেন : আপোষ-নীতি নয় আর! বিলাতী লবণ বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে আর যাই হোক স্বাধীনতা আসবে না দেশের। চাই-রাষ্ট্রবিপ্লব! লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালনা শিক্ষা কর। সমিতি গঠন কর। দলে দলে নির্ভীক যুবা তরুণ কিশোর ছেলেরা সমিতিতে এসে নাম লিখাচ্ছে : আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলছে স্থির উদাত্ত কণ্ঠে : প্রতিজ্ঞা কর সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি, স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। সর্বদা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব। নিভৃতে অন্যের অলক্ষ্যে চলল সব হাজার হাজার একলব্যের সাধনা, আম কাঁঠাল ও বাঁশবনের মাঝে। তৈরী হ'তে থাকে বংকিমের স্বপ্নে দেখা আনন্দমঠের সন্তানদল।

বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে চালু ও সজীব রাখতে হলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন : এখন সেই অর্থ কোথা হ'তে কেমন করে আসবে, বিপ্লব সমিতির নেতাদের এই হলো চিন্তা। অবিশ্যি দেশের কয়েকজন সহানুভূতিশীল ধনী-লোক গোপনে গোপনে সমিতিকে অর্থ সাহায্য করতেন, কিন্তু সমুদ্রের নিকট তা গোষ্পদের মতই সামান্য। সমুদ্র প্রমাণ চাহিদা কি সামান্য পুষ্করিণীর জলে কভু পূরণ হয়।

এদিকে আবার কিছু দিন বাদে সরকারের শ্যেন দৃষ্টির ভয়ে ঐ সব ধনীরাও হাত গুটিয়ে নিল। সমিতির পরামর্শ সভায় স্থির হলো : ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সুরু হলো বাংলায় রাজনৈতিক বা স্বদেশী ডাকাতি।

১৯০৮ সালের ২রা জুন : মানিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে শশী সরকার নামে এক কুখ্যাত ধনশালী ব্যক্তি ছিল। আশেপাশে অনেকগুলো নামকরা চোর ডাকাতের লুঠের মাল সব শশীর কাছেই গচ্ছিত থাকত। ভণ্ড শশী নির্বিঘ্নে ভদ্র মুখোস পরে চোরাই মালের কারবার করে সিন্দুক ভরিয়ে তুলত। সর্বদাই শশীর বাড়ীতে প্রচুর স্বর্ণালংকার ও কাঁচা রূপা মজুত থাকত। সমিতির সভ্যদের কাছে এ গোপন তথ্যটি অজ্ঞাত ছিল না।

আশুতোষ দাসগুপ্ত, অমৃত হাজরা, শচীন বাড়ুয্যে প্রভৃতি ত্রিশজন যুবক

ছ'খানি বড় নৌকায় লাঠি, বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি নিয়ে ঢাকা হ'তে রওনা হলো। সকলেই মুখে মুখোস এঁটে গিয়েছিল।

যাহোক, ২রা জুন শশী সরকারের বাড়ী লুণ্ঠন করে প্রায় পনের হাজার টাকা মূল্যের অলংকার ইত্যাদি সহ সকলে এসে ঢাকায় পুলিন বাবুর নিকট উপস্থিত হয়। এর পর আরো একটি বড় রকমের স্বদেশী ডাকাতি হয় ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরের অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে। ৩১শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলাস্থ নড়িয়া বাজারে আর একটি ডাকাতি হয়। সামান্য কিছু টাকা পাওয়া যায়। পর পর এই ভাবে কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতির ফলে সরকারের পুলিশ তখন হন্যে কুকুরের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দায় দেশ গেছে ছেয়ে: গোয়েন্দারা সভ্যের তালিকায় নাম লিখিয়ে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে। এদের মধ্যে কয়েক জনের নাম: নগেন্দ্র রায়, হেমেন্দ্র রায়, উপেন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। এমনি করেই দিন যায়। এমন সময় ১৯০৮য়ের ডিসেম্বর মাসের ১২ই, ১৪নং সংশোধিত ফৌজধারী আইন সরকার পাশ করলে। এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের মর্জিমত নির্দিষ্ট কতকগুলি অপরাধের ক্ষেত্রে জুরী বা এসেসার ছাড়া হাইকোর্টের তিনজন জজকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চেতে বিচারের ব্যবস্থা করা হলো। বড়লাটকে এই আইনানুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করবার ক্ষমতা দেওয়া হল।

ঐ কুখ্যাত আইনের প্যাঁচে ফেলেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভৃতি যাবতীয় তরুণদের মুক্তি-প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কণ্ঠ চিপে শ্বাস রোধ করা হলো, বলা হলো: ওসব বে-আইনী কাণ্ড, বন্ধ করো। তারও আগেই বরিশালের অক্লান্ত কর্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়, পুলিন দাস ও ভূপেশ নাগকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ: আশুতোষ দাসগুপ্ত কলকাতায় চলে এলেন।

আশুতোষ কলকাতায় এসে পি, মিত্রর সংগে দেখা করলেন। তিনি কলকাতায় অনুশীলন সমিতিতে বাস করতে লাগলেন। এদিকে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল: গবেশ ওরফে যতীন চট্টোপাধ্যায় নামে এক যুবক অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। পুলিশের ধাপ্পায় পড়ে ভড়কে গিয়ে সে সমিতির অনেক গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। দেশদ্রোহী বিশ্বাসহন্তা গবেশকে হত্যা

করতে গিয়ে সমিতির লোকেরা ভুলক্রমে তার ভাইকে গুলি করে মারলে। ১৯১০ : ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিন দাস মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এলেন : কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না পুলিশের কর্তৃপক্ষ গোপনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁদ পেতে জাল গুটাতে ব্যস্ত। ১৯১০ : ৩রা আগষ্ট রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার জাল গুটান হলো : ৪৫ জন গ্রেপ্তার হয়। রমনার একটি নির্জন বাড়ীতে আদালতের স্থান নির্দেশ হলো।

বিচারপতি নিযুক্ত হলো মিঃ বেন্টিক। মহাসমারোহে চলল সরকারের বিচার প্রহসন : দীর্ঘ ২।৩ মাস ধরে সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়া হলো; এবং মামলা দায়রা সোপর্দ করা হলো। ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাড়ীতে ১৯১১, ২রা জানুয়ারী জজ মিঃ কুট্‌সের আদালতে বিচার বসে। মানিকতলা বোমার মামলার প্রখ্যাতনামা শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস এবারেও স্থির থাকতে পারলেন না, ছুটে এলেন ঢাকায় আসামীদের (?) পক্ষ সমর্থন করতে। মামলার শেষে রায় বেরুল : পুলিন দাসের সাত বৎসর ও আশুতোষের ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর, বাকী একুশজন মুক্তি পেল।

পুলিন বাবু ধৃত ও বিচারে দ্বীপান্তরিত হওয়ায় অধুনা-লুপ্ত বিখ্যাত সংবাদ-পত্রসেবী দৈনিক ভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন অনুশীলন সমিতির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন।

এদিকে ১৯০০র সেপ্টেম্বর মাসে ইনস্‌পেক্টার শরৎ ঘোষ গুলিবিদ্ধ হলো গুপ্ত বিপ্লবী-সংঘের নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হিরণ্য গুপ্ত, দুটি তরুণের হাতে।

ঢাকার আগুন নিভতে না নিভতে ঢাকা হ'তে বরিশালে বিপ্লবের অগ্নি-শিখা বিস্তৃত হলো।

১৯১০-১৯১৩।

ঢাকায় যখন বিপ্লবসমিতির গঠন চলেছে অনুশীলন সমিতির নাম দিয়ে, স্বাধীনতাকামী একতাবদ্ধ দুর্জয় তরুণদের নিয়ে, বরিশালেও তখন তার প্রেরণা পৌঁছে গিয়েছিল, এবং বরিশালের অনুশীলন সমিতিতে যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন, যতীন ঘোষ পরিচালক ও অল্পবয়স্ক দুর্ধর্ষ যতীন রায় (ওরফে, ফেণ্ড রায়)। বরিশালের ষড়যন্ত্র মামলার নাম দিয়ে বৃটিশ সরকার আবার জাল বিস্তার করল : জাল তুলে যখন আনা হলো, বহুজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে দেখা গেল। অভিযোগও ছিল বহু। এগারটি জায়গায় ডাকাতি, যেমন হলদিয়া, কলারগাঁও, দাদপুর, পণ্ডিতসার, গাউদিয়া, স্বকার, মাদারীগঞ্জ,

বিড়ঙ্গল, কুমিল্লা সহর, লাঙ্গলবন্দ প্রভৃতি। এছাড়া, গোলকপুরে বন্দুক চুরি, সারদা চক্রবর্ত্তীকে খুন করা প্রভৃতি অভিযোগও ঐ ষড়যন্ত্র মামলায় আনা হয়।

দুই দফায় বিচার শেষ হয়: প্রথম দফায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ষড়যন্ত্রের জন্য ২৩ জনের মধ্যে ১৪ জনকে মুক্তি দিয়ে বাকী রমেশ আচার্য্য ও যতীন রায়ের বার বৎসর দ্বীপান্তর। রোহিণী গুপ্ত, নিবারণ কর ও যতীন ঘোষের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর, প্রিয়নাথ আচার্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র বণিক, গোপাল মিত্র প্রভৃতির সাত বৎসর কারাদণ্ড। নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু ও দেবেন্দ্র ঘোষের পাঁচ বৎসর কারাবাস হয়।

১৯১৫, ২৯ মে: দ্বিতীয় দফায়, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী ও খগেন চৌধুরীর বিচার হয়। মামলার রায় প্রকাশিত হলো: ১৯১৬ সনে। বিচারে এঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর, অন্যান্যদের ১০ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। পরে অবিশ্যি শেষোক্ত প্রতুল ও রমেশের মুক্তি মেলে হাইকোর্টের পুনর্বিচারে ও অন্য তিন জনের দশবৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ব্রিটিশ সরকার ও তার চেলা চামুণ্ডারা তখন বাংলা দেশের সর্বত্র জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে সুরু করছে। অক্লান্তকর্মী অত্যুৎসাহী বিপ্লবী-চক্রেরও কাজ চলেছে পুরোদমে। যেখানে যত বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর দল ঐ সব বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, চক্রান্ত করেছে, অত্যাচার করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

১৯১১, ১০ই এপ্রিল: বিক্রমপুর রাউৎভোগের গোয়েন্দা মনমোহন দে ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী দিয়ে ফিরবার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলো।

ময়মনসিংয়ের গোয়েন্দা দারোগা রাজকুমার রায়কে মারা হয় ১৯১১, ১৯শে জুন।

নারায়ণগঞ্জের দারোগা মনোমোহন ঘোষ নিহত হন ১৯১১, ১১ই ডিসেম্বর।

১৯১২, ২৪শে সেপ্টেম্বর বন্দুকের গুলিতে কনেষ্টবল রতিলাল ও সারদা চক্রবর্ত্তী নিহত হয় জুন মাসে। পর পর বিপ্লবীদের এই তৎপরতায় বাংলা দেশ যেন সচকিত হয়ে উঠে। বাংলার মাটিতে বিপ্লবের রক্ত-স্রোত বইতে থাকে।

১৯১১, সোনারংয়ে আর একটি মামলা হয়, মামলায় অভিযুক্ত হন সোনারং

জাতীয় বিদ্যালয়ের চৌদ্দজন শিক্ষক ও ছাত্র। ১১ই জুলাই ঐ মামলার সরকার পক্ষের তিন জন সাক্ষী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলো। মামলার ফলাফল: সাত জনের প্রতি দণ্ডাদেশ হল।

* * *

বৃটিশ-সরকার স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, ভারতের মাটিতে সর্বত্র গুপ্ত বিপ্লবীসংঘ গড়ে উঠেছে, এবং গোপনে গোপনে তারা বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাতে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না: তাদের

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনা হীন।

বাংলা দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে পরাক্রমশালী বৃটিশ বাহাদুরের যেন কতকটা 'সাপের ছুঁচো গিলবার' মত অবস্থা হয়েছিল। কারণ আমলাতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রের কাছে মর্যাদাই আসল, এবং সেই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জনগণের কোনরূপ স্বার্থের কাছেই সেই মর্যাদাকে তারা বিসর্জন দিতে যে সম্মত হতে পারে না, এ'ত অবধারিত। সেই সময়কার গভর্ণমেণ্টের মর্যাদাবোধ সম্পর্কে লর্ড মিণ্টোর একটি মাত্র উক্তি এখানে প্রসংগত উল্লেখ করলেই হয়ত ব্যাপারটা কারো বুঝতে তেমন কষ্ট হবে না।

লর্ড মিণ্টো বলেছিলো: গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের আন্দোলনের কাছেও বশ্যতা স্বীকার করবে না, বা উপরের কর্তাদের হুকুমের কাছেও আত্মসমর্পণ করবে না, তারা যা করবেন, সেটা একান্ত ভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত ও প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ। কাজেই আমলাতান্ত্রিক এই স্বৈর শাসনের মর্যাদা রক্ষা করে তথা বাংলা ভারতের উগ্র জাতীয় আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের জন্য শাসকেরা এক নতুন পন্থা বের করলে। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে যে দরবার অনুষ্ঠিত হলো, তাতে ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের কয়েকটা প্রদেশের সীমানা নতুন ভাবে বণ্টনের কথা ঘোষণা করলে।

এই সীমানা পুনর্বণ্টনের মধ্যেই কৌশলে বিভক্ত বংগভূমিকে আবার জোড়া লাগান হলো। ধন্য চক্রী ইংরাজ। ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করা হলো। দিল্লী হলো এবারে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী।

বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে পশ্চিম বাংলা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে একজন লেঃ গভর্ণরের শাসনাধীন করা হলো। আসামকে পূর্ব বংগ হ'তে

বিচ্ছিন্ন করে, একজন চীফ্ কমিশনারের 'পরে শাসন ভার অর্পিত হলো। এই ভাবে আবার উভয় বংগকে জোড়া লাগিয়ে সপরিষদ একজন গভর্ণরের উপরে সমগ্র যুক্ত ভূখণ্ডের শাসন দায়িত্ব ভার অর্পন করা হলো।

চক্রী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের অভিসন্ধি সাময়িক ভাবে সফল হলো। দেশের চিরবিপ্লবী নেতাদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। ১৯০৭ সালে স্থরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর জাতীয়তাবাদীরা প্রায় সকলেই দেশের মধ্যে তদানীন্তন একমাত্র প্রকাশ্য ও আইনসংগত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হ'তে সরে এসেছিলেন। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লোকমান্য তিলক মহারাজের কারাদণ্ড, পাঞ্জাব কেশরী লাজপত রায়ের দেশান্তর, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিন পালের গতিবিধির পরে খবরদারী এবং শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ ও বিপ্লবীচক্রের 'পরে ইংরাজ সরকারের অকথিত জঘন্য অত্যাচার প্রকাশ্যে যেন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের উগ্রতায় অল্প বিস্তর ভাবে সাময়িক মন্দা আনলেও ভিতরে ভিতরে ভারতের নাড়ীতে তখনও অতি গোপনে চলছিল আর একদল বিপ্লবীর অগ্নি-সাধনা। যে দুর্নিবার প্রেরণা দেশের যুবগণের অন্তরে এসে সাড়া জাগিয়ে ছিল, তার সমাপ্তি সেদিনত দূরের কথা আজিও বুঝি হয়নি। বিদ্রোহী ভারতের সেদিনকার সে মুক্তির জন্য অগ্নি-সাধনা আজিও তেমনি চলেছে এবং ভারতের এই মুক্তি পূর্ণ হবে জাতির পরম এক স্বার্থগন্ধহীন আত্মনিবেদনের মাঝে। আজিকার এই রাজনীতিক নেতার দল যতদিন এই পরম সর্বাংগ সুন্দর মুক্তির মন্ত্রে না দীক্ষিত হবেন, ততদিন অখণ্ড ভারতের খাঁটি মুক্তি রূপ কিছুতেই নেবে না। না! না! মুক্তির নামে পাশ্চাত্য দেশগুলির মত ভারতের চলতে থাকবে নানা স্বার্থের হানাহানি ও ছিন্নমস্তার আত্মঘাতিনী লীলা। সে যাই হোক: বংগভংগ রোধ হলেও শ্বেতাংগ শাসকগোষ্ঠীর লৌহকঠিন বজ্রমুষ্ঠি এতটুকুও শিথিল হলো না। নিত্য নতুন দমন নীতি প্রায় অব্যাহত ভাবেই দেশের উপর দিয়ে পৈশাচিক ভাবে চলতে লাগল।

সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন, বিপ্লবপন্থীদের প্রকাশ্য দমননীতির এই বেড়াজালের মধ্যে প্রকাশ্য আন্দোলন একপ্রকার অসম্ভব দেখেই বিপ্লবীচক্রের আন্দোলন নিঃশব্দে ফল্গুধারার মত অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে গুপ্ত পথে প্রবাহিত হয়ে চলল।

প্রাচ্যে তখন একটা বিপর্যয় ঝড়ের মত চারিদিক কালো করে অত্যাসন্ন হ'য়ে

আসছে। তখনকার সেই আন্তর্জাতিক পরিবেশই ভারতের গুপ্ত মুক্তি-আন্দোলনের আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পায়। উপর্যুপরি কয়েকবার ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে বিপ্লবীচক্র তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, সহসা যেন এমন সময় বয়ে এল অনুকূল বাতাস। আগষ্ট ১৯১৪ সাল: সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে ঘনঘোর ঘটায় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সাম্রাজ্যলোভীদের হিংস্র নখরাঘাতে চারিদিকে বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

ভারতে যখন গুপ্ত বিপ্লবীসংঘ খণ্ড খণ্ড বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মাথা তুলে জাগছে, সুদূর প্রাচ্যে জার্মানীতে একদল ভারতীয় বিপ্লবী ভারতের বিরাট এক স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গোপনে গোপনে আয়োজন চালাচ্ছেন। ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবীচক্র কাজ চালিয়ে গিয়েছে ধীর মন্থর গতিতে। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রের ও গোলাগুলির অভাব তাদের অত্যন্ত বেশী বোধ করতে হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবীসংঘের অনেক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা অস্ত্রের অভাবেই অনেক সময় নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সামান্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি তাদের হাতে যা এসে পৌছাত, কিছুটা তার ফরাসী চন্দননগর হ'তে গোপনে সরবরাহ হয়েছে, কিছু হয়েছে বিদেশ হ'তে চোরাকারবারীদের হাত দিয়ে, অতিরিক্ত মূল্যে। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ না হলে বড় রকমের একটা সশস্ত্র বিপ্লব যে সম্ভবপর নয়, একথা বিপ্লবীরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল। ঐ কারণেই হয়ত সুদূর জার্মানীতে কয়েকজন বিপ্লবী নেতা গিয়ে বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। জার্মানী হতেই হরদয়াল কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিরাট মুক্তিকামী দল গড়ে তোলেন। হরদয়াল দিল্লীর বাসিন্দা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে পড়াশুনা করে ষ্টেট্ স্কলারসিপ নিয়ে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিন্তু যে মুক্তির বেদনা অহর্নিশি তার প্রাণে আগুনের মত জলছিল, তা তাকে স্থির থাকতে দেয়নি; পড়াশুনায় ইতি দিয়ে হরদয়াল দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন। কালিফোর্নিয়া থেকে হরদয়াল 'গদর' নাম দিয়ে এক পত্রিকা প্রকাশ সুরু করেন। এবং ক্রমে ঐ 'গদর' পত্রিকাকে ভিত্তি করে 'গদর-দল' নামে বিরাট এক সংঘ গড়ে উঠে। জার্মানীতে থাকাকালীন সময়েই হরদয়াল, বরকৎউল্লা ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সাহায্যে সুদূর প্রাচ্য ও কাবুলের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কাবুল হ'তে জার্মাণরা মুসলমানদের যে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে, তাহাই

কালে "রেশমী-চিঠি ষড়যন্ত্র" রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐ সময়ে বিপ্লবীরা আরো একটি প্রচেষ্টা করেছিল, বাটাভিয়া ও শ্যামের পথে অস্ত্র আমদানী করে বাংলার সর্বত্র অস্ত্র ছড়িয়ে সমগ্র বঙ্গভূমে এক মহা বিপ্লবের সূচনা করবেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংগে সংগে গদর দল স্থির করে, বহু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে, ভারতে আসবে। এবং সেই পরিকল্পনানুযায়ী 'কোমাগাতা মারু' জাহাজে শিখ গদর নায়ক বাবা গুরুজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট গদর দল ভারতের দিকে রওনা হয় স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য।

গুপ্তচরের মুখে এ সংবাদ শ্বেতাংগ প্রভুদের কর্ণগোচর হ'তে দেরী হয়নি। এক বিরাট সশস্ত্র বিপ্লবের আশু সম্ভাবনায় তারা সচকিত হয়ে উঠে: 'কোমাগাতা মারু' বজবজ এসে পৌছানর সংগে সংগেই গদর দল, শুন্‌লে, তাদের ডাংগায় নামতে দেওয়া হবে না। যখন তারা দেখ্‌লে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝি স্বপ্নবৎ হাওয়াতেই মিলিয়ে যায়। কূলে এসে তরী ডুববে! অসম্ভব! তখনই পরামর্শ করে স্থির হলো: অস্ত্রমুখে তারা সকল বাধা অতিক্রম করে জন্মভূমিতে পদার্পণ করবে। বীর স্বাধীনতাকামী সৈনিকরা মৃত্যুপণে রুখে দাঁড়াল।

গর্জে উঠ্‌লো একসংগে অকস্মাৎ বন্দুক ও রিভলভার: সুরু হলো বাধাদানকারী সমগ্র পুলিশবাহিনীর 'পরে গুলিবৃষ্টি। বন্দুকের গুলিতে এলো প্রত্যুত্তর।

সকলে সচকিত হয়ে উঠে, হাজারো মিলিত কণ্ঠের উচ্চ চিৎকারে: ওয়া গুরুজী কি ফতে। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! গুলিবর্ষণ করতে করতে স্বদেশ প্রেমিকের দল গুলি খেয়ে কতজনে রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হয়, কত সৈনিকের শেষ নিঃশ্বাস বায়ু হিল্লোলে মিলিয়ে যায়। দু'পক্ষেই গোলাগুলি চালায়।

পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে আহত হলো; ২০।২৫ জন শিখ নিহত হলো। শেষ পর্যন্ত তারা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রমুখে পরাজিত হল। দলের নেতা বাবা গুরুজিৎ সিং ২৯ জন সংগীকে নিয়ে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। বাকী ৬০।৭০ জন পুলিশের হাতে বন্দী হলো।

বন্দী শিখদেদের বিচারার্থে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হলো। হাওয়ার বেগে কলকাতায় গদর দলের সংগে শ্বেতাংগদের সংঘর্ষের কাহিনী পাঞ্জাবে ভেসে এল। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় এই সংবাদে একেবারে যেন ক্ষেপে হয়ে উঠ্‌লো: বিপ্লবীদের সংগে পিরোজপুরে পুলিশের এক সংঘর্ষ হলো। চৌ বিমান ষ্টেশন বিপ্লবীরা লুঠ করলো। এই সময়ই বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুপণে এগিয়ে আসেন। যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাংলার সমস্ত বিপ্লবী দলকে একত্রে মিলিত করবার চেষ্টা করছেন তখন।

রাসবিহারী বসু। গায়ের রং ময়লা : উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান এক যুবক।

১৮৮৪ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারীর জন্ম। রাসবিহারীর পিতা বিনোদ বিহারী বসু ছিলেন সিমলাতে সরকারী ছাপাখানার Head Assistant. ছেলের লেখাপড়ায় তেমন মন নেই : অথচ নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়ামে অত্যন্ত পটু। আর একটি বিশেষ গুণ ছিল রাসবিহারীর, ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুরুমুখী, মারহাটি প্রভৃতি অনেকগুলো বিভিন্ন ভাষায় অদ্ভুৎ দখল।

১৯০৮ সালে ২রা মে যখন মুরারীপুকুরের বাগানে খানাতল্লাসী হয়, সেই সময় সেখানে কাগজপত্রের মধ্যে রাসবিহারীর দু'খানা পত্র পাওয়া যায়। সেই সময় বিপদের আশংকায় শশীভূষণ রায়চৌধুরী রাসবিহারীকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেন। রাসবিহারী কিছুকাল ঐ সময় দেরাদুনেই থাকেন।

১৯১০।১১ : রাসবিহারী দেরাদুনে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে সেখান হ'তে চন্দননগরে যাতায়াত করেন। ঐ সময়ই প্রকৃত পক্ষে রাসবিহারীর প্রাণে স্বাধীনতার আকাংখা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তার মনে হয় মুরারীপুকুরের দল ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির কর্মপন্থাই ঠিক। এবং সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাবেন স্থির করেন, দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে। দিল্লীতে আমিরচাঁদের সংগে রাসবিহারীর আলাপ হলো। আমিরচাঁদের চেষ্টায়, বালমুকুন্দ রঘুবর শর্মা, বালরাজ, হনুমন্ত সহায় ও দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতির সংগে যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটে। এঁরা সকলেই গদর দলের নেতা হরদয়ালের ভক্ত ও অনুবর্ত্তী। অবশেষে রাসবিহারী হরদয়ালের সংগেও পরিচিত হলেন।

আরো কিছু দিন পরে রাসবিহারী বাংলাদেশে এসে ১৫।১৬ বৎসরের একটি সুশ্রী তরুণ, বসন্ত বিশ্বাসকে দেরাদুনে সংগে করে নিয়ে গেলেন।

* * দিল্লী মহানগরী

১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বর : রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেওয়ান ই-আম এর দিকে চলেছে। ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে সে প্রথম রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

বিরাট উৎসব। অগণিত মানুষের ভিড়, কত রাজা মহারাজা, সরকারী

কর্মচারী, সৈনিক, এক বিরাট শোভাযাত্রা। রাজপথের ধারেই পাঞ্জাব ন্যাসনাল ব্যাংকের সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী।

বহুলোক ভিড় করেছে দর্শন আকাংখায় সেই বাড়ীতে। দোতলায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছে, সেই ভিড়ের মধ্যে একটি সুশ্রী তরুণীও তার জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু কেউ জানেনা সেই সুশ্রী তরুণীটির আসল ও সত্যিকারের পরিচয়। পাশ হ'তে কে প্রশ্ন করে, তেরি নাম ক্যা বহিন্ ?

মৃদু সলজ্জ হাসিতে তরুণী জবাব দেয় : মেরি নাম ! লীলাবতী !

বলার সংগে সংগে তরুণী যেন নিজের গাত্রবস্ত্র সামলায় ওকি ! সর্বনাশ গাত্রবস্ত্রের তলে লুকায়িত ওটা কি ? একটা সাংঘাতিক বোমা, না ? হাঁ তাইত ! বোমাই ত !

শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে ক্রমে কাছে : আচম্‌কা লীলাবতী বস্ত্রান্তরাল হ'তে বোমাটি বের করে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। মুহূর্তে চারিদিকে হৈ চৈ হুলুস্থুল পড়ে যায়। লর্ড সাহেব আহত হয়েছে, শোভাযাত্রা ছত্রভংগ হয়ে গেল। আহত লর্ড হার্ডিঞ্জকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। চারিদিকে হৈ হল্লা গোলমাল, এই ফাঁকে লীলাবতী সরে পড়ে।

অল্প কিছুদূরে রাস্তার এক পাশে রাসবিহারী উদগ্রীব উৎকণ্ঠায় আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। লীলাবতীকে দ্রুতপদে ঐ দিকে আসতে দেখে রাসবিহারী এগিয়ে আসেন : বসন্ত !

হাঁ ! কাজ হাসিল। তাহলে আমাদের লীলাবতী মোটেই তরুণী নয় ! শ্রীমান বসন্ত ! ধন্যি ছেলে। ধন্যি বুকের পাটা ! সমগ্র দিল্লী নগরী জুড়ে তখন ধর পাকড়, খানাতল্লাসী সুরু হয়েছে, ওরা দু'জনে সেই ডামাডোলের মধ্যে একেবারে ষ্টেশনে চলে আসেন। বসন্তকে লাহোরের গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে দেরাদুনের গাড়ীতে চড়ে বসলেন রাসবিহারী।

দেরাদুনে এসে রাসবিহারী দিব্যি খোস্ মেজাজে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ান, বড় বড় শ্বেতাংগ কর্মচারীদের সংগে আলাপ পরিচয় হয়। বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ ! কি ভয়ংকর কাজ। এক সভা হলো, সভাপতির আসন অলংকৃত করে রাসবিহারী তীব্র ওজঃস্বিনী ভাষায় বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ, এই গর্হিত কার্যের প্রতিবাদ করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। শ্বেতাংগ দল বললে : **Oh ! what an angel Rash behari.**

দেখতে দেখতে তিন মাস ঐ ঘটনার পরে অতিবাহিত হয়ে গেল : ১৯১৩,

২৮শে মার্চ আইনের একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হলো : পিনাল কোডের ১২০ 'ক' ধারা : ঐ আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি খুন করবে, সে ছাড়াও তার দলে থেকে যে বা যারা তাকে সাক্ষাৎ পরামর্শ দিয়েছে, এমন যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে খুনের সময় সে উপস্থিত না থাকলেও প্রথম ব্যক্তির মত তারও সমান দণ্ড হবে।

বড় লাটকে বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর রাসবিহারী ও লাহোরের গুপ্তচক্রের অন্যান্য বিপ্লবীরা স্থির করে : বাংলা দেশে জগৎশশীর আশ্রমের বাপারে যে গর্ডন সাহেব লিপ্ত ছিল, এবং যাকে খুন করতে গিয়ে বোমার আঘাতে মৌলবী বাজারে বিপ্লবী যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তাকে এবার চরম দণ্ড দিতে হবে। কিছুদিন আগে গর্ডেন সাহেব মৌলবীবাজারে যখন হাকিম ছিল, তখন জগৎশশী-আশ্রমে নির্দোষদের পরে অকথ্য অত্যাচার করে ছিল। নিরীহ ডাক্তার ক্যাঃ মহেন্দ্র দেকে গুলি করে হত্যা করে ছিল। অতএব গর্ডনের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তারপর গভর্ণর স্যার জেমস্ মেষ্টনকে ও বড়লাট যখন কর্পূরতলায় আসবে তাকেও চরম দণ্ড দিতে হবে। এই সব কাজ করতে হলে কিছু বোমার প্রয়োজন।

১৯১৩ : মার্চে রাসবিহারী চন্দননগরে গিয়ে কয়েকটা বোমা নিয়ে এলেন। ১৯১৩, ১৭ই মে : প্রথমেই বিপ্লবী বসন্ত গর্ডনকে লাহোরের লরেন্স উদ্যানে বেড়াতে এলে সাইকেলে চেপে এসে বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু গর্ডনের কোন ক্ষতি হয় না, রামপদর্থম নামে একজন দারোয়ান নিহত হলো। বিপ্লবীদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। পুলিশের কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঐ হত্যার রহস্য ভেদ করতে পারলে না।

* * ১৯১৩ : ২১শে নভেম্বর রাজাবাজারের অমৃত হাজরার বাড়ী খানা-তল্লাসী করে পুলিশের কর্তৃপক্ষ। ঐ সময় একজন সভ্যের পকেটে একটি সাংকেতিক চিঠি ছিল। এবং ঐ চিঠির ভিতর থেকেই পুলিশ দিল্লীর বিপ্লবী আমিরচাঁদ ও আরও কয়েক জনের নাম জানতে পারলে। আর এই পত্রের সাহায্যেই পুলিশ বুঝতে পারে দিল্লীতে একটি বিপ্লবী সংঘ কাজ চালাচ্ছে। সংগে সংগে আমিরচাঁদের বাড়ী খানাতল্লাস করা হয় এবং অনুসন্ধানে দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পুলিশ জানতে পারলে। দিল্লীতে ধরপাকড়

সুরু হলো; রাসবিহারী তখন লাহোরে। দীননাথও তখন লাহোরেই ছিল। পুলিশ দীননাথকে গ্রেপ্তার করলে। বিপ্লবী গুপ্তচরের মুখে রাসবিহারী সে সংবাদ জানতে পেরে' ঐ রাত্রেই ট্রেনে চেপে দিল্লীতে চলে গেলেন।

অসম সাহসী ছিলেন এই বিপ্লবী রাসবিহারী। মুহূর্তে তিনি বেশ বদল করে চেহারার সম্পূর্ণ অদল বদল করে ফেলতে পারতেন, অনেকগুলো ভাষায় দখল থাকার দরুন তার পক্ষে যখন তখন ছদ্মবেশ ধারণ করাটা খুবই সহজ ছিল। কখনো বাংগালী, কখনো শিখ, কখনো পাঞ্জাবী, কখনো উড়িয়া, কখনো মদ্রদেশীয় রূপে তিনি সরকারের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে ভারতের সর্বত্র আত্মগোপন করে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী জীবন যাপন করছেন। তাঁর হৃদয়ে দেশের মুক্তির জন্য যে অনির্বাণ হোমানল জলত, তার দাহনে তিনি যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। এক বিরাট, বিপুল সশস্ত্র বিপ্লব প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি দীর্ঘ দিনের ব্রিটিশ শাসনের চির অবসানের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, জীবনে তা সফল হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য হলেও চির আশাবাদী রাসবিহারী কোনদিন সামান্য হতাশাকেও প্রশ্রয় দেননি। অক্লান্ত কর্মী বিপ্লবীর সেদিনকার সে জীবনকাহিনী, তার পরবর্তী জীবনের ধারার সংগে হয়ত কোন মিলই ছিল না, কিন্তু তবু এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে সন্ত্রাসবাদের যুগে রাসবিহারীর মত বিপ্লবীর সত্যিই প্রয়োজন ছিল এই ভারতে।

পরবর্ত্তী কালে তার চাঞ্চল্যকর কর্মতৎপর জীবনের সংগে আর এক বাংগালী বিপ্লবীর অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে: বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্র নেতাজী। তিনিও রাসবিহারীর মতই যেন স্বপ্ন দেখেছিলেন: রক্ত দিয়েই ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। Give me blood I will give you freedom!

কিন্তু যা বলছিলাম। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় হতভাগ্য দীননাথ রাজসাক্ষী হয়ে নিজেদের সব গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়। পুলিশে এতদিনে রাসবিহারীর নাম জানতে পারে। বিচারে বালরাজ ও বসন্তকুমারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, ও আবেদবিহারীর হলো ফাঁসির আদেশ।

প্রিয়দর্শী বসন্তকুমারের অল্প বয়স থাকায় শ্বেতাংগ জজ তার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ দেয়, কিন্তু গভর্ণমেন্ট লাহোর হাইকোর্টের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে: তারা জজ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, অতএব আবার

বিচার হোক। আপিলে পূর্ণবিচারে রায় দেওয়া হলো: Basanta to be hanged by neck till death.

যথা সময়ে নির্ভিক কিশোর হাসি মুখে ফাঁসির দড়িটি গলায় পরে, দেশের তরে প্রাণ দিয়ে গেল। ইংরাজের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হলো।

এতদিনে নিঃসন্দেহে পুলিশ রাসবিহারীর নাম জানতে পেরেছে: সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলে: রাসবিহারীর মাথার দাম ৭৫০০৲। কিন্তু কিছু হলো না। পুরস্কারের অংক আরো বাড়িয়ে দেওয়া হলো: বার হাজার টাকা!

সদাজাগ্রত ধূর্ত ব্রিটিশ প্রহরীর চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে রাসবিহারী তখন কাশীতে মিছরী পোকরায় বসে আছেন নানা ছদ্মনামে ও ছদ্মপরিচয়ে। ঐ সময়কার আর একজন বিপ্লবী, ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় যাঁর কীর্তিকাহিনী চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে, বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়! সশ্রদ্ধ নমস্কারে তাঁর অমর স্মৃতিকে দৃষ্টির শতদলে মেলে ধরছি অশ্রুনিবেদনে।

যে একদল তরুণ একদা স্বপ্ন দেখেছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আবার একদিন শৃংখলিতা ভারতভুমির মুক্তি আসবে, আসবে আবার দেশের লক্ষ কোটি মুমূর্ষু হৃতসর্বস্ব, সর্বহারা জনগণের হারানো স্বাধীনতা, তাদেরই একজন ছিলেন: যতীন্দ্রনাথ। এই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি উল্টে গেলে আমরা বহুবার দেখেছি: যখনই কোন জাতি তার পরাধীনতার লৌহ শৃংখল মোচনে সংগ্রামী হয়েছে, তখনই তাকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন না কোন বৈদেশিক শক্তির অল্প বিস্তর সাহায্য নিতে হয়েছে। এবং বহুক্ষেত্রে এও দেখা গিয়েছে, যে কোন কারণেই হোক না কেন বহু বিদেশী সে প্রচেষ্টায় তাদের সাহায্যও করেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও নরম ও গরমদলের মত ও পন্থার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদল মৃত্যুঞ্জয়ী যুবক যখন স্বাধীনতার পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালতে জীবনমরণ পণ করেছিল, তখন সুদূরের জার্মাণী সেই পঞ্চপ্রদীপে অনেকটা তৈল সিঞ্চন করেছিল। কিন্তু আকস্মিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই সাহায্যের তৈলটুকু যেন ফুরিয়ে এল।

কিন্তু তবু চির আশাবাদী বিপ্লবীর দল হতাশ হলো না; ভারতের এক-প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশের শত অত্যাচার ও শ্যেনদৃষ্টিকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের সাধনার পথকে সুগম করে তুলতে অবহেলে বহু জীবন

দিয়েছিল ডালি। এবং সেই সংগ্রামের পীঠস্থানই ছিল শস্য শ্যামলাং মলয়জ শীতলাং এই বঙ্গভূমি, আমামাদের বাংলা দেশ। কত শহীদের বুকের রক্তে আজিও বুঝি বাংলার মাটি তাই রক্ত-রক্তিম; স্মৃতির বিস্মরণদ্বারপথে আজো দেখি চলেছে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের নিঃশব্দ মিছিল। মৃত্যুগহন পার হ'য়ে যাদের পদধ্বনি আজিও শুনি অমৃত লোক হ'তে ভেসে ভেসে আসে দূর হ'তে কাছে, আরো কাছে। সেই দূর ও নিকটেরই একজন যতীন্দ্রনাথ। যার অমর কীর্তিকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় ভক্তিনত চিত্তে গেয়ে গেল আমাদেরই আর এক বিদ্রোহী কবি কম্বুকণ্ঠে :

"বাঙ্গালীর রণ দেখে যারে তোরা রাজপুত, শিখ, মারাঠী, জাঠ,
বালাশোর, বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদিঘাট।"

* * ১৯১৪র য়ুরোপীয় যুদ্ধের ঘনঘটায়, যখন বিশ্বের আকাশ জুড়ে জমে উঠ্‌ছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ, বহু বিপ্লবী যারা তখনও গোপনে গোপনে মৃত্যুপণে দেশের মুক্তির জন্য প্রথম দলের বিপ্লবীদের ব্যর্থতার পর আবার প্রস্তুত হচ্ছে, যতীন্দ্রনাথ তখন সেই সব বাংলার বিপ্লবীদের আবার একত্রে মিলিয়ে হাতে হাত মেলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আর বাংলার বাইরে চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী রাসবিহারী।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময় ঢাকা সমিতি চন্দননগরের দলের সংগে মিলিত হয়ে যায়, কাশীর দলও ঐ ঢাকা সমিতির চেষ্টাতেই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সংগে পরিচিত হয়। ক্রমে ঐভাবে এক বিরাট বিপ্লবীচক্র গড়ে উঠে : পূর্ব বাংলা হতে স্বরু করে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত। ঢাকা, চন্দননগর, কলকাতা, কাশী, লাহোর, দিল্লী জুড়ে এক রক্তরাখিতে যেন বাধা পড়ে এক বিরাট প্রাণশক্তি! কলকাতার রাজাবাজারে অমৃত হাজরা (ওরফে শশাঙ্ক) বোমার কারখানা গড়ে তুলেছে, কাশীতে রাসবিহারী ও শচীন সান্যালের মিলিত চেষ্টায় চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। বেনারস, সিক্রোল, দানাপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, মীরাট, দিল্লী, রাওলপিণ্ডি ও লাহোরের সমস্ত সিপাহীদের মধ্যেও একযোগে বিপ্লবের ডাক পৌঁছে গিয়েছে। তারা আবার স্মরণ করছে অতীতের ফেলে আসা ১৮৫৭র সেই চিরস্মরণীয় দিনগুলো। তরুণ বিপ্লবী হিরণ্ময় ব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় নিত্য নিয়মিতভাবে অমৃত হাজরার কাছ হ'তে বোমা ও [illegible] আদান প্রদান চলেছে।

চেম্পাকরাম পিলাই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে, হরদয়াল, বরকত উল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি বার্লিনে থেকে, য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়া তুরস্ক, আফগানিস্থান, জাপান প্রভৃতি দেশগুলোতে যাতে ইংরাজ বিদ্বেষ জাগে তার জন্যে প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। সুফি অম্বাপ্রসাদ ও অজিৎ সিং পারস্যে ও কাবুলে থেকে বিদ্রোহীদের কাজ করে যাচ্ছেন। চারিদিকে চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি!

'কোমাগাতামারু'র ঘটনার অল্পকাল পরে কাশীতে এসে গোপনে হাজির হলেন সুদূর আমেরিকা হ'তে গণেশ দত্ত পিংলে ও বিনায়ক রাও কাপ্‌লে দুই জন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী। পরামর্শ করে স্থির হলো: বিনায়ক বাংলা ভাষা জানেন, অতএব তিনি বাংলা দেশ ও এলাহাবাদে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যাবেন। আর পিংলে যাবেন পাঞ্জাবে। রাসবিহারী ও শচীন সান্যাল থাকবেন কাশীতে।

এদের সংগে কর্তার সিংও ছিলেন, তিনিও পিংলে ও বিনায়কের সংগে সংগে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতে সুরু করলেন। দামোদরস্বরূপ গেলেন এলাহাবাদের সৈনিক নিবাসে ছদ্মবেশে সৈনিকদের দিতে বিপ্লবের আহ্বান। কাশীর সৈন্য শিবিরে গেলেন বিভূতি হালদার ও প্রিয়নাথ। রামনগরে বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়ে। সিক্রোলে দিল্লা সিং। জব্বলপুরে নলিনী মুখার্জী। রাসবিহারী ঘুরতে ঘুরতে পিংলের সংগে এলেন অমৃত সহরে।

চারিদিকে বিপ্লবের অগ্নি-আহ্বান পৌছে গিয়েছে: শীঘ্রই ভারতের একপ্রান্ত হতে আর প্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌বে—প্রস্তুত হয়ে থাকুন।

ঢাকা হ'তে লাহোর অবধি বিদ্রোহের বিপুল আয়োজনে নেতারা ব্যস্ত।

ঢাকা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে তখন শিখ সৈন্য ছিল। লাহোরের শিখ ষড়যন্ত্রকারী সেনারা ঢাকার শিখদের সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য পরিচয় পত্রও পাঠিয়ে দিয়েছে।

ময়মনসিং ও রাজসাহী স্কুলের জংগলে তরুণ যুবকেরা সন্ধ্যার পর কুচ-কাওয়াজ অভ্যাস করছে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণকৌশল শেখার জন্য বাংগালী যুবকেরা তখন বর্তমান 'রণনীতি' ইত্যাদি বই পড়ে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চয় করতো।

গদর দল আমেরিকায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর জার্মাণীর সাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতে অস্ত্র

পাঠাবার ব্যবস্থা করে। হাজার হাজার শিখ ও প্রবাসী ভারতীয় বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে ফিরে আসছিল। ত্রিশ হাজার রাইফেল দু'হাজার পিস্তল, হাত বোমা, ও বিস্ফোরক পদার্থ, লক্ষ লক্ষ কার্তুজ ও বুলেট ইত্যাদি জাহাজে প্রেরিত হবে বলে নাকি ভারতে সংবাদও পৌঁছে গিয়েছিল বিপ্লবীদের কাছে। অস্ত্রশস্ত্রত আছেই, লক্ষাধিক টাকাও নাকি ঐ সংগে আসছে।

পরপর চার পাঁচখানা অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বিদেশ থেকে এসে বঙ্গোপ-সাগরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে এলোও,—কিন্তু পথিমধ্যে সরকারের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারল না। সব বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল। ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের গোপন পরামর্শ চলতে থাকে জার্মাণীর ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্রে, তারা আন্দামান নির্বাসিত বারীন, উল্লাসকর, হেমদাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতিকে মুক্ত করে জার্মাণীতে নিয়ে যাবে। ভারতের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি প্রায় শেষ: বিপ্লবীচক্রের গোপন অধিবেশনে স্থির হলো, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তর ভারতের সর্বত্র একযোগে সিপাহী-মণ্ডলী কোষমুক্ত অসি নিয়ে সংগ্রামে হবে অগ্রসর। নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে মন্দিরে শয়তান প্রবেশ করল, রক্ত পূজার আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এল, লখাইয়ের লৌহবাসরে চুল প্রমাণ ছিদ্র পথে প্রবেশ করলে: দুর্দান্ত কালনাগিণী! এক যবন ডেপুটি সুপারিটেন্‌ডেন্টের কৌশলে কাল-নাগিণী গোয়েন্দা কৃপাল সিং কখন যে লৌহবাসরে প্রবেশ করেছে, কেউ তা জানে না। কৃপাল সিং অতি গোপনে সরকারের দপ্তরে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। হতভাগ্য চাঁদ সদাগরের লৌহবাসরেও মৃত্যু প্রবেশ করল।

সরকারের দপ্তরে সংবাদটা পৌঁছানর কিছু পরেই, বিপ্লবীদল জানতে পারলে কালনাগিণী তার মৃত্যু ছোবল হেনেছে। দুয়ার বন্ধ হলো, কৃপাল সিংকে বন্দী করা হলো। এবং ২১শে বদলিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করা হলো জাগরণের।

কৃপাল সিং নজরবন্দী: বাইরে বের হবারও তার পথ নেই কোন, তাকে নিহত করাও যায় না একেবারে, এখুনি তাহলে পুলিশ সজাগ হয়ে উঠ্‌বে সুরু হবে ধরপাকড়! এত আয়োজন সব হবে ব্যর্থ!

বিপ্লবীচক্রের কেউ কেউ তখনও কিন্তু জানেনা যে কৃপাল সিং সরকারের

গুপ্তচর। এই ত্রুটির ফাঁক দিয়েই কাল সাপ কোন ফাঁকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আবার গিয়ে পুলিশে সংবাদ দেয়! না, না ২১শে নয়, ১৯শে!

পাঞ্জাব প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট: স্যার মাইকেল ও'ডায়ার আর কালবিলম্ব না করে এক ছাউনী হ'তে অন্য ছাউনীতে সৈন্য অদল বদল করে ফেলল।

নানা জায়গায় সুরু হলো জোর খানাতল্লাসী, বহুবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো? দোষী নির্দোষ বহু লোককে লাহোরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

১৯শে ফেব্রুয়ারীর পরিকল্পনা হলো ধূলিসাৎ।

রাসবিহারী কাশীতে আত্মগোপন করলেন: শচীন সান্যাল ও পশুপতি গেলেন বাংলাদেশে। নগেন্দ্র দত্ত ও প্রিয়নাথ গেলেন চন্দননগরে।

রাসবিহারীর মাথার দাম এখন ১২৫০০৲ তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের জন্য—৭৫০০৲ টাকা

লাহোর ,, ,, —২৫০০৲ ,,

বেনারস ,, ,, —২৫০০৲ ,,

ওদিকে জার্মাণীর ভারতীয় বিপ্লব কেন্দ্র হ'তে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সুফি অম্বাপ্রসাদ, প্রভৃতি কয়েকজন তুরস্কে এসে পৌঁচেছেন।

তুরস্ক থেকে এলেন ওরা আফগানীস্থানে, আমীরের দরবারে।

বিশেষ কোন আশা মিলল না আমীরের কাছ হ'তে; শ্বেতাংগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সে নারাজ! যদিও আফগানীস্থানের মন্ত্রী দেখালে সহানুভূতি।

কিন্তু সেপাইদের একযোগে ১৯শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তাদের আফগানীস্থানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভারত ও কাবুলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, সমগ্র ভারত জুড়ে বিপ্লব অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও মিলিয়ে গেল নিশার স্বপনের মতই।

'জানি আমাদের শক্তি কম, কিন্তু তবু প্রচেষ্টা চাই। বার বার আঘাত হেনে হেনে ও বদ্ধ দুয়ার একদিন খুলবই! একশত বার যদি বিফল হই, একশত একেবারে হবো সফল নিশ্চয়ই।' চির আশাবাদী মুক্তিযজ্ঞের সৈনিক!...

বিপ্লবী কর্তার সিং ও হরনাম সিং কাবুলের পথে আবার অগ্রসর হলেন: কিন্তু রাস্তায় যে সেপাইদের তিনি বলতে গেলেন দেশের জন্য অস্ত্র ধরতে, তারাই তাদের ধরিয়ে দিল বিশ্বাসঘাতকতা করে। রক্তবীজের বংশধর!

বিষ্ণু পিংলে লাহোরে সর্বত্র ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী হচ্ছে শুনে মীরাটে এলেন পালিয়ে, লাহোরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মীরাটের সৈন্যদের জাগাতে হবে : সংগে ছিল তার ১০টি বড় রকমের মারাত্মক বোমা।

আবার কাল সাপের আবির্ভাব : মীরাট সৈনিক নিবাস।

পিংলে সৈনিকদের বলছেন : এখনও তোমরা করছো কি! সব একত্রে অস্ত্রধারণ কর। এগিয়ে এসো বীর, শৃংখলিতা মাকে তোমাদের মুক্তি দাও। ধারালো অসির আঘাতে আঘাতে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দাও তার সর্বাংগের লৌহ-শৃংখ।

একজন মুসলমান দফাদার এগিয়ে আসে হিংস্র সর্পের মত নিঃশব্দে : ভেইয়া মেরা সাথ আও! ··ম্যায়নে সব ইনতাজার কর ছুংগা!

পিংলে নিঃশংকচিত্তে সেই যবন দফাদারের সংগে এগিয়ে এলেন।

ছু'জনে কথাবার্তা বলতে বলতে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে এসে দাঁড়ায় : সামনে সর্বনাশ! ওকি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী!

পিংলের ছু'চোখের তারা দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হয়।

সংগের একটি ছোট বাক্সে বোমাগুলি ভরা ছিল : বোমার বাক্স সমেত পিংলে ধরা পড়লেন, ১৯১৫ : ১৯শে মার্চ।

মাত্র কয়েকদিন আগে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাগীরথীর তীরে সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়লো হয়ত পিংলের।

* * * নির্মল সলিলা ভাগিরথী বয়ে চলেছে একটানা, কুল কুল বীচিভংগে। সন্ধ্যার মন্থর বাতাসে ভাসিয়ে আনে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার সংগীতধ্বনি। দেবাদিদেব বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতির সময় হলো বুঝি।

ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

সিঁড়ির পরে ছু'টি আবছা মূর্তি চুপে চুপে কথাবার্তা বলে : রাসবিহারী ও পিংলে।

পিংলে তুমি যে কাজে যাচ্ছ তাতে কত বিপদের সম্ভাবনা অছে তা জান নিশ্চয়ই। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু অনিবার্য্য! কথাটা ভেবে দেখেছো কি? অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ শিখার মত এক ঝলক্‌ হাসি বিপ্লবীর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠে ক্ষণেকের তরে : মরা বাঁচা আমি কিছু জানিনা। যখন যা আদেশ দেবেন তখন তা পালন করবোই। তাতে মৃত্যুকেও যদি আলিংগন করতে হয়, ত' হবে! বীর সৈনিক! Order is order!

পায়ের তলায় একটানা বয়ে চলে ভাগীরথীর নির্মল স্রোত : মা গংগে ভুলছো কি সেই চির অম্লান সন্ধ্যাটির কথা! কবে কোন অতীতে তোমার কূলে বসে এক ধূসর সন্ধ্যার আবহাওয়ায়, ভারতের এক বিপ্লবী সৈনিক মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে নিজের সংকল্পে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, স্মৃতির অন্ধকার হ'তে আজিও কি সেই অশ্রুত প্রাণাঞ্জলির প্রতিজ্ঞা তোমার কুলু কুলু নিনাদকে ওঁকার ধ্বনির মত পূর্ণ করে তোলে না—রচেনা আবর্তের পর আবর্ত। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বসন্তকুমার, বালমুকুন্দ, কর্তার সিং, জগৎ সিং প্রভৃতি অনেকের মত পিংলেও একদিন হাসিমুখে দেশের প্রতি শেষকৃত্য প্রাণাঞ্জলিতে দিয়ে গিয়েছিল : সমস্ত জাতির ঐ সকল পরমাত্মীয়রা, যারা আত্মীয় হতেও পরমাত্মীয়, বড় আপনারজন, তাদের কথাত' কোন দিনই আমরা ভুলতে পারবো না। এখনো তাদের কথা মনে হলে দু'চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে আসে! প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দুর্নিবার কান্নার ঢেউ জাগে। বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠে!

মানুষের ছদ্মবেশে ভুবনচারী দেবতার দল, অমেরা যেন ভুলে না যাই, এই ভারতের মাটির পথেই তোমরা একদিন হেঁটে গিয়েছো : হেসেছো, কেঁদেছো! স্বপ্ন দেখেছো দেশকে আবার করবে স্বাধীন মুক্ত। তোমাদের পদরেণু আজিও ভারতের মাটির পরে মিশে আছে, সেই মাটিতেই মাথাটি আমাদের নোয়াই বারবার শতবার প্রণামের অশ্রুপুষ্পে : ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

শ্বেতাংগ বণিকের বিচার সভায় সুরু হলো বিচার-প্রহসন একে একে :

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা : অভিযোগ : গদর পত্রিকা, কোমাগাতামারুর যাত্রীদের অবস্থা ও পরিণতি, রাসবিহারীর প্রচারকার্য, গণেশবিষ্ণু পিংলের সহায়তা, সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি : প্রথমবারে আসামী হয় ৬৬ জন।

১৯১৫, ৯ই নভেম্বর মামলা দায়রায় সোপর্দ করা হয়।

১৯১৬, ২০শে এপ্রিল : দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা :

ফলাফল : ২৪ জনের ফাঁসি, ২৭ জনের দ্বীপান্তর। এবং অনেকের ৫, ৭, ১০ বৎসরের মেয়াদে দীর্ঘ কারাবাস।...

ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ করে : গণেশবিষ্ণু পিংলে, বিষেণ সিং, জগৎ সিং, সুরণ সিং, সুরণ সিং (২) হরণাম সিং, ও কর্তার সিং।

রাজসাক্ষী দশজন ভাঁদের মধ্যে মুলা সিং ও সুচা সিং ছিল।

হাজার চেষ্টা করেও বিপ্লবী রাসবিহারীকে শ্বেতাংগ শিকারী কুকুরের দল ধরতে পারেনি। পালিয়ে গেলেন তিনি ছদ্মবেশে সহকর্মী ও বাল্যবন্ধু পশুপতিকে সংগে নিয়ে কাশী হ'তে ফরাসী চন্দননগরে। * * * ফরাসী চন্দন নগর :

একটি ব্রাহ্মণ এসেছেন সেখানে, স্থির সৌম্য মূর্তি! গলদেশে শুভ্র উপবীত, মস্তকে শিখা। কেউ এসে পায়ের ধূলো নেয়, কেউ নেয় আশীর্বাদ!

কয়েকদিন চন্দননগরে কাটিয়ে ব্রাহ্মণ এলেন নবদ্বীপে : এক বৈরাগীর আশ্রমে। প্রতাপ সিং সে সংবাদ পেয়ে বৈরাগীর আশ্রমে এলো ব্রাহ্মণের সংগে দেখা করতে।

কে প্রতাপ সিং! এসো ভাই!

এ বেশ কেন?

বিদেশে যাচ্ছি ভাই! এখানে আর কোন সুবিধা হবে না। বিদেশে গিয়ে আবার নতুন করে চেষ্টা করবো।

আবার কবে দেখা হবে?

তাত জানিনা।

হয়ত আর এ জীবনে দেখা নাও হ'তে পারে।

প্রতাপের দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

কাঁদছ কেন প্রতাপ।...ছিঃ বিপ্লবীর চোখে জল শোভা পায় না।

* * নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ এলেন আবার চন্দননগরে।

একখানা চিঠি : সহকর্মী বিভূতিকে!

'ভাই আমি পাহাড়ের দিকে যাইতেছি! দু'ই বৎসর পরে আবার আসিব।

সব ভার শচীন্দ্র ও গিরিজাবাবু (নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) র 'পরে তুলে দিয়ে গেলাম।

১৯১৫ : ১২ই মে দ্বিপ্রহর; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ছদ্ম নামে জাপানের টিকিট কেটে, ব্রাহ্মণ (?) এক জাহাজে যাত্রী হলেন।

পরিচয় দিলেন, বিশ্বকবি জাপান ভ্রমণে যাবেন, পি, এন, ঠাকুর তাই আগে থাকতে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবেন জাপানে।

বিপ্লবী রাসবিহারী জাপানে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

বিপ্লবী রাসবিহারীর স্মৃতির 'পরে এইখানেই যবনিকাপাত হোক তার স্মৃতির প্রতি প্রণতি জানিয়ে! ···কারণ দুর্বলতাকে বাদ দিয়ে মানুষ নয়, মানুষ ভালবেসে সুখী, ভালবাসা পেয়ে হয় ধন্য! কিন্তু প্রেমের স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবীকে পথভ্রান্ত করবো না। তাই যে বিপ্লবী রক্তক্ষত চরণে অগ্নিদগ্ধ ভারতের মাটি হ'তে নিল-বিদায় কোন এক বৃহত্তর স্বপ্নের আহবে, তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে স্মৃতির রোমন্থন করবো না।

* * *

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: বাঘা যতীন!

ক্ষুধিত শার্দুলের হুংকারকে অবহেলা করে যে বাংগালী বীর বাঘা যতীন হয়েছিলেন, যার অশ্রুতর্পণে আজিও বুড়িবালামের তটভূমি জাতির তীর্থক্ষেত্র হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো চিরকালের জন্য, সেই বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ এই বাংলার শ্যামলিমার মধ্যেই প্রথম প্রাণ-স্পন্দন লভেছিল। কে বলে রে বাংলার ঘন সবুজের প্রাচুর্যে ঢাকা পড়েছে তার ত্যাগের গৈরিক। কে বলে বাংগালী যুদ্ধ করতে জানে না! কে বলে বাংগালী সামরিক জাতি নয়!

জোর করে আইনের প্যাঁচে ফেলে বাংগালীকে শ্বেতাংগর দল একদিন অস্ত্রহীন না করলে বুঝতাম তোমাদের এই রাজ্যস্বপ্ন কোথায় থাকত!

১৮৫৭ সাল হ'তে ফিরিংগীরা যত কলংকের কালি নির্বিবাদে আমাদের গায়ে ছিঁটিয়ে এসেছে, তার সওয়াল জবাব তারা পেয়েছে বহুবার এই পদদলিত হৃতসর্বস্ব ভারতবাসীর অস্ত্রমুখে: সেই বহু সওয়াল জবাবেরই একটি খণ্ডাংশ: ১৯১৫ সনের বুড়িবালামের তীরে পাঁচটি বীর বাংগালী যুবকের অস্ত্র ও গোলাগুলির মুখে অগ্ন্যুদগারে ও রক্তাঞ্জলিতে!

বিপ্লবের হোমাগ্নিশিখা হ'তে এক ঝলক অগ্নি যেন সহসা বাংলার আকাশকে রক্তায়িত করে ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল দিগন্তে, পশ্চাতে উত্তর বাংলার জন্য রেখে গেল স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপ্রতিজ্ঞা।

গল্প নয়, নয় কাহিনী: মাত্র ৬৭ বৎসর আগে এই বাংলা দেশেরই ছায়া-সুনিবিড় শান্ত পল্লী কয়া, কুষ্টিয়া মহকুমায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বহে গেছে গড়াই নদীটি।

উমেশচন্দ্র মুখার্জীর স্ত্রী শরৎশশী দেবীর গর্ভে ১৮৮০, ৮ই ডিসেম্বর একটি শিশু জন্মাল। দিন যায়, শিশুর বয়স বাড়ে: মার যেমন ছেলে অন্তপ্রাণ,

ছেলেরও তেমনি মা অন্তপ্রাণ। কি দুষ্টুই যে ছেলেটি হচ্ছে দিনকে দিন, অথচ মা দেন তার দুরন্তপনায় উৎসাহ।

এইত' চাই! এমন নাহলে ছেলে, এমন নাহলে মা!

রাস্তায় একটা কুকুর তাড়া করেছে, ছেলে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসে রন্ধনরতা মাকে পশ্চাত হ'তে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে: মা! মাগো!

কিরে? অমন করে ছুটে এলি কেন?

একটা কুকুর মা।

মা উঠে দাঁড়ান, উনুনের পাশ হ'তে একটা কাঠ তুলে নিয়ে বললেন: যাও এই কাঠটা দিয়ে কুকুরটাকে মেড়ে তাড়িয়ে দাও গিয়ে। যাও।

ছেলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়: মায়ের চক্ষুত নয় যেন অন্ধকারে দু'টি জলন্ত মশাল-বর্তিকা। ছেলে হাত বাড়িয়ে দেয়।

বালক কিশোর আরো নির্ভীক আরো দুর্দান্ত হয়।

মা ও ছেলে গড়াই নদীতে স্নান করতে গিয়েছে। মা ছেলেকে দু'হাতে তুলে জলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, ছেলে আবার সাঁতরে এসে মাকে ধরে।

বাঘা যতীনের মা যে!

এমন মায়ের ছেলে না হলে কি শুধু হাতে কেউ বাঘের সংগে লড়তে পারে।

পড়াশুনার সংগে সগে শরীর-চর্চাও চলতে থাকে: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! সত্যম শিবম্ সুন্দরম্!

সেবারে কয়াগ্রামে হঠাৎ বাঘের উৎপাত দেখা দিয়েছে; এর বাড়ীর ছাগল, ওর বাড়ীর গরু ব্যাঘ্ররাজ নির্বিবাদে হজম করে চলেছেন।

যতীনের কানে যখন কথাটা পৌছাল, আর দেরী নয়, কয়েকজন সংগীকে সাথে নিয়ে চললে কোথায় বাঘ ঘাপটি মেরে বসে আছে খুঁজে বের করতে।

দলের মধ্যে যতীনের এক জ্ঞাতিভ্রাতার হাতে এক বন্দুক ও যতীনের হাতে একটি ছোরা। মাত্র এই হাতীয়ার সম্বল ব্যাঘ্র শিকারের অভিযানে।

ব্যাঘ্ররাজের দেখা পেতে বিলম্ব হলো না: সংগে সংগে বন্দুক ছুটলো। সর্বনাশ! লক্ষ্য ভ্রষ্ট! বিরাট এক হুংকার ছেড়ে ব্যাঘ্র মশাই দিলেন এক লাফ একেবারে যতীনের ঘাড়ের 'পরে। বীর জননীর বীর সন্তান: একহাতে ক্রুদ্ধ বাঘের গলাটা লৌহবেষ্টনীতে জড়িয়ে অন্য হাতে যতীন সুরু করলেন ছোরা চালাতে। শক্তিতে কেউ কম যায় না: তেজও কারু কম নয়।

অবশেষে মানুষের শক্তির কাছে পশুশক্তি হার স্বীকার করলে।

যতীনের অবস্থাও সংগীন। তারপর দীর্ঘকাল ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীর চিকিৎসাধীনে থেকে যুবক ভাল হয়ে উঠ্‌ল! লোকে বল্লে 'বাঘা যতীন'!

মুখে মুখে নামটা প্রচার হয়ে গেল সর্বত্র : বাঘা যতীন। বাঘের সংগে লড়াই করে বাঘকে মেরে যে হলো বাঘা যতীন!

আর এক দিনের ঘটনা : ভারতের শ্বেতাংগ প্রভু পঞ্চম জর্জের সিংহাসনে আরোহণের উৎসব সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে।

কলকাতা সহরও রোশনাই আলোক-মালায়, লাল, নীল, সবুজ, নারাংগী—যেন ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছে চারিদিকে অগুন্তি মনুষের।

একটা গাড়ীর ছাতে কয়েকজন বাংগালী ভদ্রলোক বসে আলোক শোভা দেখছে। সহসা কোথা হতে জনকয়েক কাবুলী সেখানে এসে হাজির। জোর যার মুলুক তার। অতএব কাবুলীরা গাড়ীর ছাতের উপর থেকে ভদ্রলোকদের একপ্রকার জোর করেই নামিয়ে দিয়ে, নিজেরা গিয়ে গাড়ীর ছাতের 'পরে ঠেলে উঠ্‌ল। গাড়ীর মধ্যে বসে কয়েকজন ভদ্রমহিলা : ধূলি-ধূসরিত নাগরা শোভিত পদ যুগল কাবুলীদের ঝুলছে মহিলাদের প্রায় মুখ ছুঁয়ে। নিরুপায় ভদ্রসন্তান কয়টি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে নিজেদের গৃহলক্ষ্মীর অবমাননা দেখছে। উপায় কি!

ভিড়ের মধ্যে একজনের নজর কিন্তু এড়ায়নি ব্যাপারটা : সিংহপুরুষ বাঘা যতীন হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলেন এবং নিমেষে কাবুলবাসীদের ঘাড়ে ধরে নীচে নামিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার শান্ত-শীতল শ্যামলিমার সুনিবিড় ছায়াতলেই রয়েল বেংগল টাইগার ঘুমিয়ে থাকে এবং সেখানে কাবুলের পাহাড়ী দুর্দান্ত শক্তিকেও মাথা নীচু করতে হয়। ব্যাঘ্ররাজ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন : বাংলার মাটিতে মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা হুংকার শোনা যায় : আকাশ-বনানী কেঁপে কেঁপে উঠে।

১৮৯৮ সালে এ্যান্ট্রান্স পাশ করে যতীন্দ্রনাথ এলেন এফ্‌, এ. পড়তে কলকাতায়। সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন। পাঠ্যপুস্তকে কোন আকর্ষণই যেন নেই : বুকের তলে তলে জলছে পরাধীনতার তুষের আগুন, শান্তি তার কোথায়! কলেজ ছেড়ে দিয়ে সুরু করলেন ষ্টেনোগ্রাফী শিখতে।

বোধ হয় ষ্টেনোগ্রাফীতে মন বসে গিয়েছিল, চট্‌পট্‌ ব্যাপারটা করায়ত্ত করে নিলেন। ছোটখাটো দু' এক জায়গায় চাকুরী করে, স্থায়ী চাকুরী

নিলেন বাংলা সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের কাছে।

ব্যাপারটা শুধু অবিশ্বাস্যই নয় কেমন যেন হাস্যকরও মনে হয়: পরাধীনতার গ্লানি, দাসত্বের অবমাননা, কিশোর কাল হতেই যে মনের মধ্যে এনেছিল বিষের জ্বালা, আজ সে কেমন করে সেই দাসত্বকেই মেনে নিল, সেটাই আশ্চর্য্য!...

না এ সেই বিশ্ববিধাতারই ইংগীত তাই বা কে জানে! গিরিকন্দর হ'তে যে ধারা উচ্ছল আবেগে নেমে এসেছে, তাকে রোধ করা যায় না: পথভ্রান্ত পথিক ইতস্তত তাকায় পথের সন্ধানে: পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

নবকুমার চকিতে পশ্চাতের দিকে তাকালেন: আহা কি রূপ! আলুলায়িত-কুন্তলা...নিরাভরণা এ কি কোন বনদেবী? না না বনদেবী নন: শৃংখলিতা ভারতমাতা। দু'নয়নে অশ্রুধারা। কেমন করে তোমায় মুক্ত করবো মা? কোন্ পথে যাবো? আমায় পথ দেখাও।

কল্পলোকে ভেসে উঠে একটি পথ, যে পথের প্রান্তে শৃংখলিতা দেশ জননী: যার অশ্রুআবিল দু'টি চক্ষু, ম্লান দীপবর্তিকা: সে পথ, ঘন দুর্যোগ যে পথের সাথে জড়িয়ে আছে, যে পথ কণ্টকে কণ্টাকাকীর্ণ। সংগ্রামের পথ: পথিকের পথচলা হয় সুরু।

বিপ্লবীর সাধনা হলো সুরু: আত্মানং বিদ্ধি! চললো নিজেকে জানবার সাধনা। আবার সেই পুরানো কাহিনী, বংগ-ভংগ: ১৯০৫:

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী যখন নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরছে, সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকখানি বেদনায় ফেটে চৌচির হয়ে গেল: সর্পিল ক্রুর বহ্নি-শিখার মত উঠ্ছে বিপ্লবের মৃত্যু-আহ্বান ধরিত্রীর অসংখ্য ফাটলে সেই অনুচ্চারিত মরণ আহ্বান যতীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করলে।

১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতিতে যতীন্দ্রনাথের নাম লেখা হলো: বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিপিনপালের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা তাকে বিচলিত করেছিল। দীক্ষা হলো শিকল ছেঁড়ার বহ্ন্যুৎসবে।

* * আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান। আজি পরীক্ষা, জাতীর অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ। দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।

অলক্ষ্যে খল খল হাস্তে ভাগ্যবিধাতা যে খুঁসিয়া বেড়ায়। দুর্মদ ঝড়ের বেগে আকাশ কালো হয়ে আসে

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

১৯০৯ সালের গোড়ার দিকে শ্বেতাংগ পদলেহী পাব্লিক প্রসিকিউটার আশুবাবু বিপ্লবীর গুলিতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তখন হতেই পুলিশের নজর যতীন্দ্রনাথের উপর: মানিকতলার বোমার মামলাও তখন চলেছে।

গুপ্ত বিপ্লবীচক্রের সংগ্রাম তখন পুরা দমেই চলেছে ক্ষণে ক্ষণে বজ্র বিদ্যুতের চকিত ইসারার মত। আরো কতকগুলো ব্যাপারে ফিরিংগীদের সন্দেহ যতীন্দ্রনাথ উপরে এসে পড়ে। ১৯০৮-১৯০৯ সালের মধ্যে কতকগুলো ডাকাতি হয় এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ সব লুণ্ঠন ব্যাপারে বিপ্লবীচক্রের হাত ছিল বলেই অনুমান। শিবপুরের ডাকাতি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের মামা কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তার মুহুরী নিবারণকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৯ই নভেম্বর নন্দলাল বানার্জী নিহত হলো।

বিশ্বাসহন্তা ললিতমোহন চক্রবর্তী ১৯০৯ সালের ৯ই নভেম্বর এক স্বীকারোক্তি দেয়: ঐ স্বীকৃতিতে সে গুপ্তসমিতির ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে, এবং বলে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সমিতির একজন নেতা। এই স্বীকারোক্তির ফলে মৌলভী সামসুল আলম 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' নামে এক বিরাট মামলা তৈরী করে। কিন্তু মৌলভীর আশা পূর্ণ না হতেই অকস্মাৎ ১৯১০, ২৪শে জানুয়ারী তার মাথার উপরে অমোঘ মৃত্যুদণ্ড নেমে এল। মৌলভীর মৃত্যুদণ্ড দানকারী বীরেন দত্তগুপ্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়লো।

কেন তুমি একাজ করলে? বীরেনকে প্রশ্ন করা হলো। যা তোমাদের ইচ্ছা আমাকে নিয়ে করতে পার, আমি কিছুই বলব না।

২৭শে জানুয়ারী যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হলেন যতীন বাবু, অধুনা আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সুরেশ মজুমদার, যতীন্দ্রনাথের মামা ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তার মুহুরী নিবারণ মজুমদার। বিচারে বীরেন দাশগুপ্তর মৃত্যুদণ্ড হয়।

নির্ভীক যুবক একটি কথাও বললে না, আত্মপক্ষ সমর্থন করে: তার কোন অভিযোগই নেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসীর দিন স্থির হ'য়ে গেল কিন্তু···

চক্রী শ্বেতাংগ জাত! তাদের চক্রান্তের বুঝি তুলনা হয় না।

বেলোয়ারী চুড়ি, কাচের বাসন ও পুতুল ঝাঁকা ভর্তি করে একদা ফিরিংগীরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সুবে বাংলার মাটিতে পা ফেলেছিল।

বেলোয়ারী পাত্রের রঙিন সুরার সংগে তারা যে কি বিষ মিশিয়ে ধরলে, কানে কানে গোপনে কি পরামর্শই যে দিলে দিনের পর দিন, রাজতক্ত পর্যন্ত সেই বিষের কালিমায় কালো হ'য়ে ভেংগে গুড়িয়ে গেল: সিপাহশালার সেই বিষ আকণ্ঠ পান করে সংক্রামিত করে গেল তার দুর্নিবার ক্রিয়া বহুজনের মধ্যে।

তারই ক্রিয়ায় বীর বিপ্লবী বীরেনও মুহ্যমান হয়েছিল মুহূর্তের জন্য।

জেলের মধ্যে গোয়েন্দা কুকুরের দল ঘন ঘন যাতায়াত করছে, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠ্‌তে পারে না। অবশেষে এক জঘন্য চাল চালল তারা, এক মাত্র ফিরিংগীদের দ্বারাই হয়ত সেটা ছিল সম্ভব। বিপ্লবীচক্রের কাগজ এক সংখ্যা যুগান্তর এনে বীরেনকে দেখান হলো। আসলে কিন্তু কাগজখানা একেবারে সম্পূর্ণ নকল, ফিরিংগীদের নিজেদের ছাপা।

দেখ হে ছোকরা, তোমাদেরই দলের লোক তোমার বিরুদ্ধে তোমাদেরই বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তরে কি লিখেছে। 'বীরেন কাপুরুষ! নেতা কর্তৃক নিয়োজিত হইলেও সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারে নাই। বিনা কারণে গুলি ছুড়িয়া ধরা দিয়াছে এবং দলকে দমাইবার জন্যই ধরা দিয়াছে।' যে অসমসাহসী বীর একটি মাত্র প্রতিবাদও না করে, আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা পর্যন্ত না করে অবিচলিত সুমহান চিত্তে ফাঁসির দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে, অভিমানে তার হৃদয় ভরে উঠে।

হায় বিপ্লবী, মান অভিমান যে তোমার জন্য নয়, তাকী তুমি জানতে না এ জগতের যাবতীয় সব-কিছু অম্লান হাসিমুখে জীবন হ'তে বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির লাগি যে প্রতিজ্ঞা তুমি নিয়েছিলে, তুমি একবারও বুঝলে না, নিছক অভিমানের বশবর্তী হয়ে তা'হ'তে তুমি ক্ষণেকের জন্য চ্যুত হলে কপাল জোড়া অক্ষয় অনির্বাণ রক্ততিলকের পাশে একটি ছোট্ট কালির বিন্দু এসে পড়ল। অম্লান কুসুমে কীট দংশন করলে।

দেখুন আপনি যতীন বাবুকে বাঁচালেন, আর সেই যতীন বাবু নেতা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে এই ভাবে অপবাদ দিলেন। বটেই ত! যতীনদা কি জানেন না যে আমি কাপুরুষ নই!

অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বের হলো, এক স্বীকৃতি। কিন্তু সে লজ্জার কলংক কালিমা মুছে দিয়ে বীর হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িটি গলায় তুলে নিল ২১শে ফেব্রুয়ারী। আকাশে তখন উষার সোনালী আলোর রক্ত পরশ লেগেছে। বীরেনের নির্ভীক আত্মদানে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য-রক্ত হাসিতে জানিয়ে গেল শহীদ বীরেনের সাক্ষী রইলাম আমি ২১শের অংশুমালী!

অভিমানে অন্ধ হতভাগ্য জানলে না পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ কতখানি ভালবাসতেন তাকে। আগাগোড়া সবটাই ফিরিংগীদের কারসাজী।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সময়ই সরকার জানতে পারে: যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ উদ্যমের প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতা। তারই উপরে ন্যস্ত ছিল নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর ও খুলনার সকল ভার। ননীগোপাল সেনগুপ্ত ২৪ পরগণার নেতা। ইন্দ্রনাথ ছিলেন অস্ত্রাদির যোগানদার।

তবু এত করেও এবং দীর্ঘকাল ধরে যতীন্দ্রনাথকে কারাগারে আটকে রেখে মামলা চালিয়েও তাকে অভিযুক্ত করা গেল না। যতীন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন।

বাঘা যতীনকে বাঘে ছুঁয়েছে, আর বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। অতএব সরকারী চাকুরী ছাড়তে হলো তাকে। এতদিনে বুঝি বিপ্লবীর কর্মের সত্যিকারের সুযোগ এলো।

তিনি একটা মহাসত্য উপলব্ধি করেছিলেন: পরাধীন ভারতকে আবার মুক্ত ও স্বাধীন করতে হলে সর্বাগ্রে যে-বস্তুটির প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এক মহা-শক্তিশালী এবং ব্যাপক সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। এবং তার জন্য প্রয়োজন বাংলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট বিপ্লবী চক্রগুলিকে এক সূত্রে নিয়ে আসা। আর প্রয়োজন ইংরাজ বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা ও সাহায্য।

নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

যারা তার সংস্পর্শে এলো, বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তারাও মাথা নত করলে। কোথায় মিলবে খাঁটি কর্মী? দেশের লাগি কে দেবে প্রাণ!

কে আছো বীর এগিয়ে এস, খড়্গ ধর, কৃপাণ লও। মায়ের চরণে গ্রহণ করো প্রতিজ্ঞা! হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ অবনী মুখার্জীর মধ্যে দেখা পেলেন অত্যুৎসাহী এক তরুণ কর্মীর।

তাকে তিনি দলে টেনে আনলেন এবং পরামর্শ করে তাকে বিদেশে পাঠালেন বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে। অবনী জাপানে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন, কিন্তু নিরাশ হলেন না। গেলেন জার্মানীতে।

এদিকে তখন পাশ্চাত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে যুদ্ধের ঘনঘটা: প্রলয় ডমরু উঠ্‌ছে বেজে থেকে থেকে। নাগিনীরা নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে।

১৯১৪ সাল: দুই সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ হয়েছে সুরু। আর এদিকে শস্যশ্যামলা বাংলার সহরের গলিতে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে অত্যাচারীরা। ঠিক এমনি সময়ে সরকার পক্ষের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বার্লিন ভারতীয় বিপ্লবী 'চক্রের' অন্যতম সদস্য জিতেন লাহিড়ী নিরাপদে কলকাতায় এসে পৌছালেন। যতীন্দ্রনাথের সংগে জিতেন লাহিড়ীর দেখা হলো, অনেক শলা-পরামর্শ হলো, শেষে 'বিষ্ণু এণ্ড কম্পানী' নামে এক কাল্পনিক কোম্পানীর এজেণ্ট হয়ে অবনী মুখার্জী জাপানে গেলেন।

বিশেষ কোন ফল হলো না প্রচারেও, অবশেষে তার দেখা হয়ে গেল চীনের রাষ্ট্রগুরু, চীনের মুক্তিদাতা পথপ্রদর্শক ডাঃ সুনিয়াৎসেনের সংগে। সুনিয়াৎসেন তাকে দিলেন সাহস ও উৎসাহ এবং সেই সংগে দিলেন ৫০টি পিস্তল, কার্তুজ ও বহু টাকা। কিন্তু রাসবিহারী বসুর সংগে সাক্ষাৎ না করে দেশে ফিরে আসবার হুকুম ছিল না, তাই ঐ জিনিষগুলোও আর কোন দিনও দেশে পৌছাল না এসে।

হায়! অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

কারণ রাসবিহারী বসুর সংগে সাক্ষাৎ করে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে ভারতে আসবার পথেই অবনী সিংগাপুরে গ্রেপ্তার হলেন, এবং সেইখানেই তার বিচার শেষ করে, সিংগাপুরেই অবনীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

দেশকে আবার মুক্ত করবার স্বপ্ন নিয়ে, দেশপ্রেমিক দেশের জন্যই দেশ হ'তে বহু দূরে পাকান একটি দড়ির ফাঁসে দেশের প্রতি তার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে অঞ্জলি পুরে নিঃশেষে প্রাণটুকু দিয়ে গেল হাসতে হাসতে। বিপ্লবী চিরজীবী হউক! বিদ্রোহী ভারত! তোমার চরণে আবার নোয়াই মাথা! আর এদিকে ১৯১৪ সনের আগষ্টের এক সন্ধ্যা:

সংবাদপত্রে সে দিন বড়জোর খবর: হকাররা চিৎকার করছে: টাটকা খবর বাবু, টাটকা খবর: পড়ে দেখুন!

বিখ্যাত অস্ত্রবিক্রেতা রডা কম্পানী হ'তে ৫০টি মশার পিস্তল ও ৪৬০০০ রাউণ্ড গুলি কেমন করে না জানি চুরি হয়ে গিয়েছে। ফিরিংগীর দল কেঁপে উঠে: শিকারী কুকুরগুলো হন্যে হ'য়ে সহর তোলপার করে ঘোরে। করুক তারা তোলপাড় সমস্ত সহর। এতক্ষণে ঐ পিস্তল ও গুলিগুলো বাংলার

বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের মধ্যে বণ্টন হয়ে গিয়েছে। মৈমনসিং, বরিশাল সর্বত্র!

১৯১৫ সাল: ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ঐ সালটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। কারণ ঐ বৎসরেই কলকাতায় থানা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের শেনদৃষ্টি এড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী নেতাদের এক জরুরী গুপ্ত বৈঠক হয়।

ঐ বৈঠকেই জার্মানদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ভারতব্যাপী এক বিরাট সশস্ত্র ব্যাপক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়। সবাই একমত! পরাধীনতার এ অসহ গ্লানি আর সহ্য হয় না। হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু! স্থির হলো নিকট হ'তে দূর দূরান্তে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হবে: ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, শ্যাম, ব্যাংকক্, বাটাভিয়া, পোল্যাণ্ড, সাংহাই, সিংগাপুর ও জাভা সর্বত্র যোগাযোগ থাকবে।

আরো থাকবে, সানফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফোর্নিয়া ও বার্লিনের সংগে। সর্ববাদিসম্মতক্রমে নেতা হলেন যতীন্দ্রনাথ। এ তারই পরিকল্পনা।

কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই প্রচুর অর্থ! ভিক্ষায় পেট ভরবে না। চাঁদা দিয়ে দেশের লোকও সাহায্য করবে না। অতএব ডাকাতি করে জোর করে লুন্ঠন করে আনতে হবে। প্রস্তুত এ প্রস্তাবে তোমরা! সর্বকণ্ঠে ধ্বনিত হলো: প্রস্তুত! সুরু হলো লুন্ঠন।

১২ই জানুয়ারী গার্ডেনরীচে: বার্ড এণ্ড কোম্পানীর ১৮,০০০৲ টাকা লুঠ।

২২শে ফেব্রুয়ারী, বেলেঘাটায় ৪০০০০৲ লুঠ। পুলিশ ও গোয়েন্দারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে: মাদারীপুরে যে সব যুবকদের সরকারের লোকেরা সন্দেহ করত, তাদের গতিবিধির 'পরে লক্ষ্য রাখবার জন্ত গোয়েন্দা দারোগা সুরেশ মুখার্জী নির্দিষ্ট হয়।

কিন্তু হতভাগ্যের দিন শেষ হয়ে এসেছিল: ২০নং ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে বিপ্লবীদের যাতায়াত আছে ওই জানতে পারে সর্বপ্রথম। তার আশে-পাশে লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোরাফেরা সুরু করে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠে। এবার বুঝি বরাত খুলল। এমন সময় ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে সুরেশের জীবনান্ত হলো। প্রমোশন ও পুরস্কারের বুকভরা আশা নিয়ে সুরেশ মুখার্জী এ পৃথিবীর মাটি

হ'তে বিদায় নিল। বুকের রক্ত দিয়ে করলে হতভাগ্য তার লোভ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মাদারীপুরের বিপ্লবীচক্রের প্রাণ ছিল চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন ও নীরেন। অসম-সাহসী তিনটি তরুণ। যতীন্দ্রনাথের এরা ছিল নিত্যসংগী। কলকাতা, পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চল। সরু একটি প্রায়ান্ধকার নির্জন গলি: তার মধ্যে পুরাতন আমলের দোতালা একটি বাড়ী: নম্বরটা ৭৩। মানুষের গতায়াত এদিকটায় বড় একটা নেই।

ফণীভূষণ রায় নামে এক ভদ্রলোক বাড়ীখানা ভাড়া নিয়ে আছেন।

ফণীভূষণ অত্যন্ত সাদাসিধে ও নির্বিরোধি লোক, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর শুক্রবার সেদিন।

কলকাতা সহরে শীতটা তখনও যেন একেবারে যায়নি, যাই যাই করছে।

সকাল বেলা: একটি লোক নিঃশব্দে এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে নির্জন গলিপথে ৭৩নং বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল: গোমস্তা মশাই আছেন! ও গোমস্তা মশাই! ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে চিৎকার সুরু করে।

পাশের বাড়ী হ'তে কে একজন প্রশ্ন করলেন: কাকে চান মশাই?

এটাইত ৭৩নং বাড়ী? এখানে গোমস্তা মশাই থাকেন বলতে পারেন?

জানিনা, বাড়ীর মধ্যে লোক আছে, ভিতরে গিয়ে খোঁজ করুন।

লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করে সরাসর দ্বিতলে উঠে গেল। সামনেই একটা ঘর: কয়েকজন তরুণ ও একজন মধ্যবয়সী লোক ঘরের মেঝেতে বসে পিস্তল সাফ করছে। লোকটি যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে দাঁড়ান: কে?

সংগে সংগে আগন্তুক বলে উঠে স্মিতভাবে: আরে কেও যতীন বাবু না?

হাঁ যতীন বাবুই। বাঘা যতীন। শার্দুলের গহ্বরে পা দিয়েছো মূর্খ!

বজ্রগম্ভীরস্বরে বাঘা যতীনের নির্দেশ শোনা যায়: Shoot!

মুখের আদেশ শেষ না হতেই, আগন্তুক একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে: দোহাই বাবা! মেরোনা বাবা! আমি একেবারে তাহলে খুন হয়ে যাবো বাবা! কিন্তু সকাতর মিনতিতে কোন ফল হলো না। অমোঘ কঠোর আগ্নেয়াস্ত্র বজ্রগর্জনে হুংকার দিয়ে উঠ্‌ল: ক্রম্! বিদ্যুতের মত অগ্নি-ঝলক। বারুদ ধোঁয়া: একটা আর্ত করুণ চিৎকার ও ভারী দেহ পতনের শব্দ। হতভাগ্যের নাম নীরদপ্রকাশ হালদার, চাঁদনীতে টেলরিংয়ের কাজ করত।

চিত্তপ্রিয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য তখন নীরদের কণ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গিয়েছে।

He is dead ! আর দেরী নয় চটপট্ সরে পড়। রক্তাপ্লুত মৃতদেহ (?) ঘরের মেঝেতে পুড়ে রইলো। বাঘা যতীন ঘর ছেড়ে পালাল।

কিন্তু হিসাবের একটু ভুল হয়েছিল, শয়তান নীরোদ সত্যিই মরেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে আসে। কোনমতে রক্তাপ্লুত দেহে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েঃ একটি ছু'টি করে পাড়ার লোক নীরদের চিৎকারে আশে পাশে এসে জড়ো হয়।

নীরদকে ওরাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়ঃ মৃত্যুর পূর্বে নীরদ যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতির নাম বলে গেল। মৃত্যু শিয়রেও শয়তানের শয়তানী গেল না।

পুলিশ ও গোয়েন্দাদের টনক নড়ে উঠেঃ খোঁজ! খোঁজ রব পড়ে যায়।

চারিদিকে সুরু হয় খানাতল্লাসী। কিন্তু কোথায় সেই বাঘা যতীন! হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেছে কর্পূরের মতই।

আড়াই হাজার টাকা! ফিরিংগীরা ঘোষণা করলে বাঘা যতীনের মাথা যদি কেউ এনে দিতে পারে, তবে নগদ আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার দিবে! চিত্তপ্রিয় নীরদকে গুলিবিদ্ধ করবার পর, যতীন্দ্রনাথ যখন পাথুরিয়াঘাটা লেনের বাড়ী হ'তে পালিয়ে আসেন, তিনি জানতেন নীরোদ তখনও একেবারে মরেনি, কিন্তু নিতান্ত করুণাপরবশ হতেই তিনি নীরদকে একবারে শেষ করে আসেননি, এলেই ভাল করতেন, তাহ'লে অন্ততঃ দেশদ্রোহীর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নির্বাক হয়ে যেত। ২৮শে ফেব্রুয়ারী চিত্তপ্রিয়র গুলিতে সুরেশ গোয়েন্দার মৃত্যুর পর, যতীন্দ্রনাথ গার্ডেনরীচের ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত নরেন ভট্টাচার্য্য কে (পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র রায়) মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন।

যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় নরেন ভট্টাচার্য জামিনে পেয়ে দেশান্তরিত হলেন আত্মগোপন করে।

নরেন ভট্টাচার্য ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ডাকাতির অভিযোগে ধৃত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ ছু'জন সত্যিকারের বিপ্লবী কর্মীকে হারানঃ নরেনের পক্ষে জামীনে খালাস পেয়ে আত্মগোপন করে আর দেশে থাকা সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই বোধ হয় যতীন্দ্রনাথ যাদুগোপাল মুখার্জী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

সংগে গোপনে পরামর্শ করে C. Martin এই ছদ্মনাম দিয়ে তাকে বাটাভিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

এপ্রিলের শেষাশেষি নরেন মার্টিনের ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় এসে সেখানকার জার্মাণ কন্সালের সংগে গিয়ে দেখা করলেন।

জার্মাণ কনসাল নরেনকে নিয়ে গিয়ে থিওডোর হেলফ্রিক নামে এক জার্মাণের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় থিওডোর একদিন নরেনকে বললেন: S. S. Mavarick জাহাজখানা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়ে গেছে তুমি বোধ হয় জান না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্যই মাভারিকে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে পাঠান হয়েছে: জাহাজটা শীঘ্রই করাচীতে গিয়ে পৌছাবে

নরেন বললে: জাহাজটা করাচীতে না গিয়ে তোমরা এমন ব্যবস্থা করতে পার না যে একেবারে জাহাজটা বাংলাদেশে গিয়ে পৌছায়।

নরেনের অনুরোধে থিওডোর সম্মত হলেন এবং জার্মাণ কনসালকে ধরে সেই ব্যবস্থা করলেন: জাহাজটা করাচীতে না গিয়ে বাংলাদেশেই যাবে।

বাংলার বিপ্লবীচক্রে সংবাদ পৌছাল মাভারিক জাহাজে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে। বিপ্লবীচক্রের অন্যতম সভ্য হরিকুমার চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে 'হ্যারি এণ্ড সনস্' নাম দিয়ে একটি ফার্ম খোলা হলো। ঠিক হলো 'হ্যারি এণ্ড সনস্' অস্ত্রগুলো খালাস করে নেবে। সমস্ত আয়োজন সেরে নরেন ১৯১৫ জুন মাসের মাঝামাঝি আবার বাটাভিয়া থেকে ভারতে ফিরে এলেন। বিপ্লবীচক্রের জরুরী পরামর্শ সভা বসল: ডাকাতি করে অর্থের জোগাড় হয়েছে, অস্ত্রও এসে পড়ছে! প্রধান দু'টো অভাব মিটল, এবারে ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব অভ্যুত্থান। ঠিক হলো সুন্দরবনের কাছাকাছি রায়মঙ্গলে এসে জাহাজ নোঙর করবে, সেখান হ'তে অস্ত্রগুলো জাহাজ হ'তে নামিয়ে নেওয়া হবে।

যদুগোপাল ও অতুল ঘোষ চলে গেলেন রায়মঙ্গলে: জাহাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আলোর ব্যবস্থাও হলো। ব্যাগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে যাদু-গোপাল ও অতুল নদীপথের দিকে তাকিয়ে আছেন: জাহাজ আসছে। এদেশের প্রধান প্রধান সেতুগুলো ধ্বংস করে, প্রধান তিনটি রেল পথকেই অচল করে দিতে হবে।

যতীন্দ্রনাথের 'পরে ভার পড়ে বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথটিকে অচল করবার। ভোলানাথ গেল চক্রধরপুরে। সে করবে বেংগল নাগপুর রেলপথটিকে অচল।

পূর্ববাংলায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দল গেল : নরেন চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীর 'পরে দেওয়া হলো সেদিককার ভার!

নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলি কলকাতার আশপাশে থেকে অস্ত্রশস্ত্র সব দখল করে নিয়ে। ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে কলকাতাকে ধ্বংস করবে।

১লা জুলাই প্রথম ক্ষেপে অস্ত্রশস্ত্র নামানর কথা। আরো একটি পরিকল্পনা ছিল। মাভারিক জাহাজটি আণি লার্সেন নামক আর একটি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ভারতগামী জাহাজের সংগে মিলিত হবে। কিন্তু এতবড় ফিরিংগী শক্তির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বংগালী বিপ্লবীদের সে প্রচেষ্টা নিয়তির একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে মাভারিক ভারতে এসে পৌছাতেই পারলে না : জাভায় আটক হলো ২২শে জুলাই। নির্জন নদীতটে বসে এরা যখন আশায় আশায় দিন গুনছে, জাহাজ তখন পথিমধ্যে আটকা পড়ে গতিহীন হয়ে আছে।

বিপ্লবীদের আশার স্বপ্ন এইভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল!

মাভারিকের ব্যর্থতার পরও জার্মাণ কনসাল জেনারেল আরও তিনটি জাহাজ ভর্তি করে ভারতে অস্ত্র গোলা বারুদ প্রেরণের চেষ্টা করেন : তাদের মধ্যে একটি কথা ছিল বালেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় ও এসে নোঙর ফেলবার, অন্য দু'টি যাবে গোয়া ও রায়মঙ্গলে।

কিন্তু নরেন ভট্টাচার্য বললেন : বর্তমানে রায়মঙ্গলে অস্ত্রভর্তি জাহাজ পাঠানো যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ গোয়েন্দা পুলিশরা সন্দেহ করেছে। তার চাইতে সাংহাই হ'তে বরাবর একটা ষ্টীমারে করে 'হাতিয়া'য় অস্ত্র ও গোলা বারুদ পাঠানো হোক।

শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হলো। ডিসেম্বরের শেষভাগে ষ্টীমার হাতিয়ায় পৌছানর কথা। মার্টিন (নরেন)-এর সংগে যে অবনী মুখার্জী বাটাভিয়ার গিয়েছিল, তাকে আবার সাংহাইতে পাঠান হলো, এবং ঠিক হয় সে-ই সাংহাই হ'তে অস্ত্রভর্তি হাতিয়াগামী ষ্টীমারটায় চেপে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি সিংগাপুরেই গ্রেপ্তার হলেন।

তিনখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের একখানা আন্দামানে যাবে ঠিক ছিল : নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজটি আন্দামানের কাছাকাছি এলো : কিন্তু ব্রিটিশ রণতরী এচ,

এম্, এস্ কর্ণওয়ালের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে জাহাজটি নিদারুণ একটি গোলার ঘায়ে জলমগ্ন হলো।

একটি জাহাজ নাকি নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুদিন পরে ভারতের দিকে আসে, এবং সুন্দরবনের কাছাকাছি এসে কারো দেখা না পেয়ে আবার চলে যায় উল্টোপথে।

এইভাবে ভাগ্যবিড়ম্বনায় নানা কারণে 'ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাংগদের জয় সূচিত হয়।

মুষ্টিমেয় বাংগালী বিপ্লবীদের এই ব্যপক বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বলতে গেলে উমিচাঁদ প্রভৃতির বংশধর এক বাংগালীরই বিশ্বাসঘাতকতায়ঃ কুমুদনাথ মুখার্জী।

ব্যাপক বিপ্লব অভ্যুত্থানের ব্যর্থতাকে পশ্চাতে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই বালেশ্বরেঃ নব হলদিঘাটের দিকেঃ বুড়ীবালামের তীরে। ঐ চলেছে আমাদের বাঘা যতীন, সংগে আরো চারিটি তরুণঃ চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্রনাথ ও যতীশচন্দ্রঃ পশ্চাতে আসছে রক্তলোভী নেকড়ের দল।

বাঘের পশ্চাতে ফেউ লেগেছে। যতীন্দ্রনাথ তখনও জানেন না জাহাজে করে জার্মাণদের দ্বারা অস্ত্র প্রেরণের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বালেশ্বরে একটি মনোহারী দোকানঃ ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম্।

দোকানে নানা ছোটখাটো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বিক্রয় ছাড়াও, কাটা-কাপড় বিক্রি ও ঘড়ি মেরামত হয়। প্রথমে যতীন্দ্রনাথ ঐখানেই এসে উঠলেনঃ কিন্তু বুঝলেন এখানে বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয়, তাই আবার হাঁটাপথে ময়ূরভঞ্জের জংগলের দিকে চলা হলো সুরু।

বালেশ্বর থেকে ২০ মাইল দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম কাপ্তিপোদা।

সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাত্রীরা আবার আরো বারমাইল এগিয়ে আর একটি গ্রাম তালহিদায় এসে উঠ্লেন। সকলে একত্রে এক জায়গায় থাকা উচিত হবে না ভেবে, চিত্তপ্রিয় ও যতীন তালদিহায় ছোট্ট একটা দোকান খুলে বসল, যতীন্দ্রনাথ নীরেন ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে ক্যাপ্তিপোদায় গিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে ওরা বালেশ্বরে গিয়ে সংবাদ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহই করে আনতেন। বালেশ্বর থেকে তালহিদা মাত্র ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

গুপ্তচরের মারফৎ বাঘা যতীনের সদলবলে কাপ্তিপোদা ও তালহিদায় অবস্থানের কথা ফিরিংগী কর্তাদের কাণে গিয়ে পৌছাল অতি গোপনে।

সংগে সংগে পুলিশের সংবাদ বিভাগের বড়কর্তা, আই, জি, ডেনহাম ও তার দুইজন ডেপুটি কমিশনার টে গার্ট ও চার্লসকে সংগে নিয়ে সোজা-একেবারে বালেশ্বরের জেলা ম্যোজিষ্ট্রেট কিলবীর বাংলোতে এসে উঠলে: কয়েকজন সাংঘাতিক বিপ্লবী এদিকে আত্মগোপন করে আছে, আমরা তাদের সন্ধান পেয়ে গ্রেপ্তার করতে আসছি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সই করে দাও।

ম্যোজিষ্ট্রেট কিল্‌বী চতুর লোক: সে ভাবলে কেন নেপোয় মারে দই, সদলবলে তিনি একদিন বালেশ্বরের 'ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম'য়ে গিয়ে খানাতল্লাসী করলে, দু'একটা কাপ্তিপোদা সংক্রান্ত কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

পরের দিনই কিলবী গেল 'কাপ্তিপোদায়' সেখানেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না বটে, তবে জানা গেল এদেরই দলের কয়েকজনে মিলে 'তালদিহায়' একটা দোকান করে চালাচ্ছে। আর বিশেষ ঘাটাঘাটি না করে কিলবী বালেশ্বরে ফিরে এল।

উদ্দেশ্য পুলিশের সাহায্যে বালেশ্বরে ও অন্যান্য নিকটবর্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে করে ঐ সব পথে কেউ না গা-ঢাকা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কিলবী যখন ৬ই সন্ধ্যায় কাপ্তিপোদায় পৌছায়, যতীন্দ্রনাথ তখন সেখানেই ছিলেন, ঐ রাত্রেই তিনি কাপ্তিপোদা ছেড়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু চিত্তপ্রিয় যতীশকে ফেলে তিনি যাবেন না, তাই উল্টোপথে হেঁটে চলে গেলেন তালদিহায়। দুর্গম পাহাড় ও জংগলের মধ্য দিয়ে সরু পথ। বিপদ-সঙ্কুল।

সংগীদের নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ঐ পথ ধরেই এগিয়ে চললেন বালেশ্বরের দিকে!

এগিয়ে চলে বিপ্লবীর দল: ৭ই গেল ৮ই গেল, দিবারাত্র ওরা হেঁটে চলেছে ত' চলেছেই। দুর্গম পথ, ক্ষতবিক্ষত চরণ। বালেশ্বরের নিকটবর্তী কোন রেলষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতেই হবে।

ক্ষুধায় অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ দুর্গম পথ হেঁটে হেঁটে সকলই ক্লান্ত অবসন্ন।

৯ই: সকাল আটটা কি নয়টার সময় বিপ্লবীরা পাঁচজন এসে পৌছায় বুড়ীবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুরে। ভাদ্রমাস: বর্ষাস্ফীতা নদী উন্মত্ত কলরোলে বহে চলেছে। আবর্তের পর আবর্ত রচিত হচ্ছে, ক্রমে ভাদ্রের সূর্য প্রখর হ'তে প্রখরতর হয়ে উঠছে। ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠতালু প্রায় শুষ্ক: চলচ্ছক্তিহীন!

কিন্তু এখন নদী কেমন করে পার হওয়া যায়? ভরা বর্ষার এই উন্মত্ত নদী ত' সাঁতরিয়া পার হওয়া যাবে না।

অনেক অনুসন্ধান করেও নদীতীরে পারাপারের জন্য একটি নাও ত' দেখা গেল না, হঠাৎ একজনের নজরে পড়ল ওপারে একটি নৌকা নিয়ে কে একজন লোক মাছ ধরছে নদীর জলে। যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন: ওহে শুনছো! ও কর্তা, আমাদের তোমার নৌকায় করে নদীটা পার ক'রে দেবে গো! পথশ্রান্ত বিপ্লবী আজ নদীপারে এসে ডাকছে: পার করে দেবে গো!

যে লোকটা নদীতে মাছ ধরছিল তার নাম সানি সাহু। সে জবাব দেয়: পারব না,—'নাই পারি হোই জিবা'। ওহে শুনছো, আমরা সরকারী লোক, পার করে দাও।

আমার নৌকা খেয়া পার করবার জন্য নয়, এতলোক নৌকায় নিলে নাও ডুবে যাবে। আমাদের না পার করে দাও, অন্ততঃ আমাদের সংগের এই বোঝাগুলো পার করে দাও, আমরা না হয় সাঁতরেই নদী পার হবো। হবে না বাবু! হবে না, আরো একটু দক্ষিণে যান সেখানে খালি নৌকা পাবেন, তাদের বললেই পার করে দেবে। অগত্যা ওরা আরো দক্ষিণে এগিয়ে যায়, সত্যিই সেখানে নৌকা পাওয়া গেল: তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করায় তারা পার করে দিল। ক্ষুধায় তখন বত্রিশ নাড়ী চোঁ চোঁ করছে, হাত-পা কাঁপছে গুরু পরিশ্রমে দীর্ঘ অনাহারের ক্লান্তি অবসন্নতায়।

ওহে মাঝি, তোমাদের কাছে ভাত আছে? আমাদের চারটি করে ভাত দিতে পার? আজ্ঞে কর্তা, ভাত ত' নেই। পয়সা দেবো, ভাত রেঁধে দাও। ছিঃ, ওকথা বলবেন না, আপনারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, আপনাদের আমরা ভাত রেঁধে দিলে যে আমাদেরই পাপ হবে। মু ছোট জাত অছি, মু হাতেরে পানি খাই পারিবে না।

পুলিশ ও গোয়েন্দারা যে বালেশ্বরের চতুর্দিকে কয়েকজন বিপ্লবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আশেপাশের লোকেরা অনেকেই সে কথা শুনেছিল। আরো শুনেছিল কোন বাবুদের যদি সন্দেহযুক্তভাবে এমনি চলাফেরা করতে কেউ দেখে, পুলিশে সংবাদ দিলে পুরস্কার মিলবে। সানির মনে এদের দেখে কেমন একটা সন্দেহ জাগে।

দুষ্ট প্রলোভন দরিদ্রের ভাংগা খড়খড়ি পথে উকিঝুঁকি দেয়: ও লোভা

এপারে ওদের কাছে চলে এল : বাবু আপনরা কোঁটি ঘিবে ? কোথা হ'তে আসছেন ! আমরা ষ্টেশনে যাবো।

তবে আপনারা ষ্টেশনের দিকে না গিয়ে, জংগলের দিকে যাচ্ছেন কেন ? বাঁধ ধরে বরাবর এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন সেখানে এসে ভিড় করেছে, সানি তাদের চুপি চুপি ওদের 'পরে লক্ষ্য রাখতে বলে সোজা দফাদারকে সংবাদ দিতে চলে গেল।

পরিশ্রান্ত বিপ্লবীদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই, তারা গিয়ে একটি ছায়াশীতল বৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য তখন বসেছে। এদিকে ক্রমেই দু'চার জন করে লোকের ভিড় জমে উঠ্‌ছে, এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা ভাল নয়, ওরা উঠে আবার চলতে সুরু করে। লোকগুলো ওদের পিছু নেই, উপায়ন্তর না দেখে ওরা একটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই ভয় পেয়ে সব পালাল।

দামুদা গ্রামে আসতে মাতব্বর গোছের কয়েকজন গ্রামবাসী ওদের অগ্রসরে বাধা দেয়, : চোর অছি, ধর ; ছাড় না। মনোরঞ্জন তখন গুলি চালায়, একজন মারা যায় গুলিবিদ্ধ হ'য়ে, বাকী সব পালায় এবং কয়েকজন ছুটে যায় সহরে সংবাদ দিতে।

ওরা আবার এগিয়ে চলে : সামনেই একটা ক্ষেত। ইতিমধ্যে চিন্তামণি সাহু নামে একজন দারোগা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়।

কিন্তু বিপ্লবীরা দলে ভারি বলে অগ্রসর হ'তে সাহস পায় না। গ্রামবাসীরা তখনও ওদের পিছু পিছু চলেছে। ময়ূরভঞ্জের রাস্তা পার হয়ে এবারে ওরা সামনে একটা খাল দেখতে পেল : পিস্তল ও টোঁটাগুলো ঝোলার সংগে মাথায় বেঁধে সকলে খাল পার হয়ে গেল সাঁতরে। ওরা খাল পার হ'য়ে চস্‌কন্দ গ্রামের দিকে এগুচ্ছে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ওরা দেখলে : একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা : শুষ্ক একটা পুষ্করিণী, সম্মুখে উলু-টিপির বাঁধের মত। পুষ্করিণীর পাড় ঢালু ও নীচে পুষ্করিণীর খাদ ; তার চতুর্দিক জংগলে ঘেরা।

এসো, এইখানে আপাততঃ আশ্রয় নেওয়া যাক, যতীন্দ্রনাথ সকলকে বললেন।

বাঁধের উপরে উঠে দাঁড়ালে চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। ভাদ্রের মধ্যাহ্নের খরতাপে নীল আকাশ ঝলসে যাচ্ছে।

চারিপার্শ্বস্থ জংগলে মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মাঝে মাছে কম্পন তুলছে।

গুরুপরিশ্রমে সবাই ঘর্মাক্ত কলেবর : অবসন্নদেহ, শ্রান্ত পদযুগল।

মাঝে মাঝে জংগলের মধ্য হ'তে দু'একটা বুনো পাখীর শ্রান্ত কিচির

মিচির শব্দ মধ্যাহ্ন-তপ্ত হাওয়ায় ভেসে আসে। যদি সম্মুখযুদ্ধ করতেই হয়, তবে যুদ্ধের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান, জংগলের ব্যারিকেড্ চতুষ্পার্শে! একবার যখন গ্রামের লোকেরা তাদের এদিকে আসবার কথা টের পেয়েছে, যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী। ঢালু খাদ: চারিদিকে খাড়া পাড়। পরিশ্রান্ত বিপ্লবীদের বিশ্রাম দিয়ে আমরা সহরে যাই এই ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্য। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট যতীন্দ্রের খোঁজে বিরাট সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে তখন খুব কাছাকাছি এক অঞ্চলে ওঁৎ পেতে বসে আছেন।

বালেশ্বরের পুলিশ সাহেবের কাছেও সংবাদ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবী স্বয়ং সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ও সার্জেণ্ট রাদারফোর্ডকে সংগে নিয়ে চলল মোটরে চেপে। মোটরগুলো ধুলো উড়িয়ে বুড়িবালাম নদীর সুন্দরীঘাটে এসে পৌঁছাল।

সব এক সংগে একদিকে যাবো না, কিলবী বলে: আমি যাই মেদিনীপুরের রাস্তার দিকে, তুমি যাও ময়ূরভঞ্জের রাস্তার দিকে। এক জায়গায় গিয়ে আমরা মিলিত হবো। ইনেসপেক্টর খসনবিস আমার সংগে থাকুন।

ক্রমে উভয় দল এক জায়গায় এসে মিলিত হলো: এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন প্রস্তুত হও। ব্যাঘ্রের হুঙ্কার শোনা গেল।

১৮৫৭র স্মৃতি অস্পষ্ট! রণকৌশলী তাঁতিয়া, নানাসাহেব! চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই ১৮৫৭ যুদ্ধস্নাত রক্তাক্ত ভারতের দিনগুলো। পংগু বাংগালী: পণ্টন নয়!···

দীর্ঘ আটান্ন বৎসর পরে আবার রণ-দামামা বেজে উঠ্ছে কি!

রক্তে দেয় দোলা। সূর্য মাথার 'পরে হেলে পড়েছে, জংগলে পত্রমর্মর: মন্থর বায়ুর আনাগোনা।

১৯১৫র ৯ই সেপ্টেম্বর।

কোথায় স্মৃতি! খুলে দাও আবার বিস্মরণ-লোকের বদ্ধদুয়ার। আমরা এগিয়ে চলি।

বাংলাদেশ! আমার শস্যশ্যামলা জননী বঙ্গভূমি, তোমার চরণে নোয়াই মাথা।

কত যুগ যুগান্ত চলে গেল, এই সেই বাংলাদেশ, যেখানে পেয়েছি আমরা

পলাশী প্রান্তরে মোহনলাল হ'তে সুরু করে কত কত বীর যোদ্ধা, যারা দেশের জন্ম জন্মভূমির জন্ম অবহেলে হাসিমুখে দিয়ে গেল প্রাণ, তাদেরই বংশধর এই বাঘা যতীন, নীরেন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন। বিদ্রোহী বাংগালী।

* * *

কিন্তু যতীশ অসুস্থ! বাঘা যতীনের কপালে পড়ে চিন্তার রেখা।

চিত্তপ্রিয় ও নীরেন বলে: যতীদা, সকলে একসংগে মরা হবে না। আমরা এখানে রইলাম। আপনার অমূল্য জীবন। আপনি পালিয়ে যান।

বিপ্লবীর চোখেও কি সেদিন অশ্রু দেখা দিয়েছিল: না ভাই, তা হয় না। যতীশ অসুস্থ! তাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি কোথাওত' যেতে পারি না। ভুলে যাও ওসব কথা। ভীরুর মত আজ আমরা এখানে ধরা দেব না। আমাদের কাছে অস্ত্র আছে, মরতে যদি হয়ই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেই মরবো। মৃত্যু ত' একদিন আছেই। তবে এই সুবর্ণ-সুযোগ কেন ছেড়ে দেবো? যুদ্ধে মৃত্যু ত' বীরেরই কাম্য। তোমরা একখানা কাপড় উড়িয়ে ওদের জানিয়ে দাও; আমরা এখানেই আছি এবং যুদ্ধের জন্ম আমরাও প্রস্তুত। দুম্ দুম্···গুড়ুম! প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভংগ হলো! যুদ্ধং দেহি!

দূর আকাশের অলক্ষ্যচারী দেবতারা সেদিন রণ-দামামা বাজিয়ে-ছিলেন কিনা জানি না। তবে পৃথিবীর হাওয়ায় জংগলের পত্রমর্মর তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কিলবী দূরপাল্লার বন্দুক ছুড়েছিল, সে ভেবেছিল প্রতিপক্ষের পিস্তলের গুলি এতদূর কিছুতেই আসবে না। তারা আত্মসমর্পনে বাধ্য হবে।

কিন্তু তার সে ভুল ভাংগতে দেরী হলো না বিপ্লবীদের প্রত্যুত্তরে গুলি নিক্ষেপে। এগিয়ে আসছে দুই দল অল্পে অল্পে রাদারফোর্ড ও কিলবীর দল। ওদিক হ'তে মাঝে মাঝে গুলি ছুটে আসছে। ক্রমে উভয় পক্ষের ব্যবধান রইলো মাত্র পাঁচশ হাত।

শরতের সূর্য শেষ দেখা দিয়ে পশ্চিম আকাশকে লাল রংয়ে রাঙিয়ে দিয়ে পৃথিবী হ'তে বুঝি সেদিনের মত বিদায় নিচ্ছে। দিনান্তের শেষ আলোয় ওদিকে পঞ্চবীরের চলেছে শেষ সংগ্রাম। মুহুর্মুহু গুলি ছুটছে দু'পক্ষ হ'তে।

পুলিশ কমিশনার ভেবেছিল, মাত্র কয়টি ভেতো বাংগালী যুবক, কতটুকুই বা তাদের শক্তি, কিবা অস্ত্র আছে তাদের সংগে, কতক্ষণই বা যুঝবে তারা এই পুলিশবাহিনীর সংগে। বণিকের ছদ্মবেশে একদিন যখন এই শ্বেতাংগরা

এদেশে এসেছিল, বাংগালীরাই এদের অস্ত্রগুলি পথে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিল, আজ সেই বাংগালীই তাদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর। জাতির পাপস্খলন এরা আজ করবেই : মৃত্যু আসে আসুক!

ক্রমে বেলা আরো গড়িয়ে আসে : পরিখার মধ্যে জল নেই, আহার্য নেই, গোলা বারুদও প্রায় ফুরিয়ে এলো। তবু তারা যুদ্ধ করে চলেছে : মৃত্যু-ভয়হীন, মুক্তিপাগল কয়টি বীর বাংগালী সন্তানের অবিশ্রান্ত গুলির সামনে ব্রিটিশের সুশিক্ষিত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও বুঝি দাঁড়াতে পারছে না। একটু একটু করে পিছু হটে।

* * *

বালেশ্বরের যুদ্ধ : Balasore Trench Fight। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় একটি পৃষ্ঠা। জাতির মহাকাব্য!

* * *

নির্মম নিয়তি! তুমি আসন্নকালে মহাবীর কর্ণের রথচক্র পৃথিবীকে দিয়ে গ্রাস করিয়েছিলে। ছদ্মবেশে কবচ ও কুণ্ডল হরণ করিয়েছিলে, আজ তোমারই অলক্ষ্য ইংগীতে আবার একটি বুলেট এসে সহসা অতর্কিতে ভেদ করলো চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ।

ঝলকে ঝলকে উঠে এলো তাজা লাল রক্ত।

চো'খের পরে ঘনিয়ে আসে জীবনের শেষ অন্ধকার।

পৃথিবীর আলোও শেষ হয়ে এলো : আসছে তমিস্রা!...

তৃষ্ণার্ত ধরণী! মাটির মায়ের রক্ত-তৃষ্ণা কি আজিও মিটল না মা তোর।

একটু জল : মৃত্যুপথ-যাত্রীর মুমূর্ষু ক্ষীণ কণ্ঠে শেষ কাতরোক্তি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছে, তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী জলাশয়ে। কোন জলপাত্র নেই, পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়ে নিয়ে এলেন, অনন্তপথের যাত্রীর শেষতৃষ্ণার বারি। সহসা একটা গুলি এসে যতীন্দ্রনাথের উরুদেশ বিদ্ধ করলে।

মনোরঞ্জন ও নীরেন যেন আজ মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, তারা গুলির পর গুলি ছুড়তে থাকে। আর কেন ভাই! ক্ষীণকণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ নীরেন ও মনোরঞ্জনকে বললেন : যুদ্ধ বন্ধ কর।

নিশান উড়িয়ে দাও।

কিন্তু যতীদা!...

না ভাই! নেতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হ'য়ে আসে: যুদ্ধ বন্ধ কর!

নেহাৎ অনিচ্ছার সংগেই নীরেন ও মনোরঞ্জন নেতার আদেশ শির পেতে নেয়।

দু'খানা সাদা কাপড় কম্পিত হস্তে তুলে তারা উড়াতে সুরু করে: আত্মসমর্পণ করছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট কিলবী এতক্ষণে কাছে এলো ওদের। আহত রক্তাক্ত বীর শার্দুল তৃষ্ণায় কাতর।

একপাশে রক্তরাঙা চিত্তপ্রিয়ের প্রাণহীন দেহখানি পড়ে আছে। যতীশও আহত। পাশে দাঁড়িয়ে নীরেন ও মনোরঞ্জন।

শ্বেতাংগদের চোখেও আজ জল: টুপিতে করে স্বয়ং নিজে গিয়ে জল এনে আহতদের পান করায়, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ জলগ্রহণ করেন না।

মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্বেতাংগ কিলবী বাংগালী বীরের দিকে চেয়েছিল, ভাবছিল হয়ত এমনি ব্যাঘ্র আর কত আছে বাংলাদেশে, বাংগালিদের মধ্যে!

সাহেব তখুনি তিনখানা খাটিয়া এনে মৃত চিত্তপ্রিয় ও আহত যতীন্দ্রনাথ ও যতীশকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

আমি আর চিত্তপ্রিয়ই গুলি করেছি। এরা তিনজন সম্পূর্ণ নির্দোষ! এরা আমাদের সংগে এসেছিল মাত্র। সমস্ত দায়িত্ব আমার ও আমার লেফ্‌টেনেণ্ট চিত্তপ্রিয়র। আপনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি, দেখবেন এই দু'টি বালকের প্রতি যেন কোন অবিচার না করা হয়। এরা সত্যিই নির্দোষ, এ সব-কিছুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। Whatever was done, I am responsible!

শেষের সময় ঘনিয়ে আসছে, তবু স্নেহ ও কর্তব্যবোধ যেন চরণ আঁকড়িয়ে ধরে। যদি ওরা বাঁচে! হায়রে দুরাশা!

যারা রাজ্য-বিস্তারের লোভে জঘন্যতম ও ঘৃণ্যতম কাজেও কখনো দ্বিধাবোধ করেনি, যাদের দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরের রাজত্ব করবার প্রতিটি দিন অত্যাচার ও অবিচারে কলংকিত, তাদের কাছে কেন এ ভিক্ষা! এই কি বিপ্লবীর ভালবাসা?

কোথায় রইলো পড়ে আত্মীয় পরিজন, স্ত্রীপুত্র স্নেহের দুলাল! মনে রইলো শুধু তাদেরই কথা, তাদেরই শুভাশুভ, যারা মৃত্যুযজ্ঞে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল!…

ভারতের নব হলদিঘাট বুড়ীবালামের তীরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে: এমনি করেই একদিন শেষ হয়েছিল পলাশী প্রান্তরের সংগ্রাম, ১৮৫৭র সংগ্রাম: জংগলের উপর দিয়ে ঘনিয়ে এলো কালো পক্ষ বিস্তার করে কালরাত্রির অন্ধকার। পত্রমর্মরে সকরুণ বিলাপ ধ্বনি! বুড়িবালামের জলকল্লোলে অশ্রুত কান্নার ধ্বনি। যতীন্দ্রনাথের এতবড় বিপ্লব-প্রচেষ্টা কি সত্যি ব্যর্থ হয়ে গেল?

যুগে যুগে দেশে দেশে বিপ্লবীরা অম্লান হাসিমুখে মৃত্যু, ব্যর্থতা, দুঃখ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই তাদের পথ রচনা করে গেছে।

এই মাটির পৃথিবীর বুকে তাদের রক্তক্ষত চরণচিহ্নে রেখে গেছে যুগ যুগান্তের জন্ম সঞ্চিত করে যে পথরেখা, সে ত কোনদিনই মুছে যাবার নয়।

পৃথিবীর ধুলায় সে রক্তক্ষত চরণ-চিহ্নগুলি কোন দিনই হারিয়ে যাবে না।

মাটির দেহ একদিন আবার একদিন মাটিতেই যাবে মিশিয়ে, কিন্তু জলন্ত পাবকশিখা-রূপিণী স্মৃতির অক্ষয়পটে লিখা থাকবে চিরদিন, চিরকাল।

এই পৃথিবীর অগণিত মৃত্যু-মিছিলের মধ্যে তাদের 'মৃত্যু' জীবন-স্বপ্নকেই স্মরণ করিয়ে দেবে বার বার।

ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় অনেক তরুণ কিশোর যুবকদের মুখ উঁকি দিয়ে গেছে: অকস্মাৎ উল্কার মত তারা জলে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে আবার।

যাদের কেউ কোনদিন চিনত না, মৃত্যু তাদের চিনিয়ে দিয়ে গেছে।

See that no injustice is done to these two boys !...

নীরেন, মনোরঞ্জন।

নিঃশব্দে গোপনে একদিন এসে তারা বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখিয়েছিল: দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দিতে নিয়েছিল প্রতিজ্ঞা!

নীরেন ও মনোরঞ্জন ওরা দু'জনে সম্পর্কে ভাই।

খয়েরতালায় বাড়ী।

ললিত দাসগুপ্ত নীরেনের বাবা, মাদারীপুরে কবিরাজী করতেন, শান্তশিষ্ট লোকটি।

আর মনোরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রফুল্লবাবু মাষ্টারী করতেন, মাদারীপুরে।

নদীর ধারে ছোট্ট শহর: আড়িয়াল খাঁ বর্ষাকালে রুদ্রমূর্তি ধরে, ভেংগে নেয় মাটি, ভয়ংকর সে রূপ।

সেই ভয়ংকর নদীর পাশে ওরা দু'টিতে মানুষ হয়েছে।

রুদ্রের সঙ্গে তাই ওদের পরিচয় শিশুকাল হতেই !

অশান্ত, দুর্বার, চঞ্চল, বেপরোয়া দুজনেই : খেলা, সাঁতার, কুস্তী প্রভৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শী।

নীরেনের দিকে চাইতে চোখ ফিরান যেত না : ফর্সা ধব্‌ধবে গায়ের রং, কুঞ্চিত ঘন কেশদাম, দীর্ঘ সরল চেহারা : সরল ঋজু নাসা : যেন উদ্ধত দীপ্ত অগ্নি-শিখা, খাপমুক্ত তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

*   *   *   *

হাসপাতাল : আহত যতীন্দ্রনাথকে খাটিয়ায় বহন করে চিকিৎসার জন্য শ্বেতাংগরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু কার চিকিৎসা !……

বালেশ্বরের সমর প্রাংগণ হতে আহত বীর শার্দুলকে বালেশ্বরের হাসপাতালে নিয়ে এলো।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ভারতব্যাপী মুক্তিযজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর আজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আহত, রক্তাক্ত।

রুধিরে ভিজে গিয়েছে বসন, ক্লান্ত আঁখির পাতায় নেমে আসে বুঝি শেষ ঘুম।

বালেশ্বরের হাসপাতালের একটি কক্ষ : বাইরে সশস্ত্র পুলিশ। অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি যেন ঢেকে গেছে।

অমারাত্রির বুকে আজিও নিভে যায়নি অবিনশ্বর সেই ক্ষীণ দীপশিখাটুকু।

একটু জল ! ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ বলেন।

পাশেই শ্বেতাংগ পুলিশ অফিসার মিঃ টেগার্ট দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি গ্লাসভর্তি জল এনে দেয় : Mr Mookherjee water please.

শ্বেতাংগ কণ্ঠস্বর শুনে তাকায় যতীন্দ্রনাথ : No thanks ! আমি যার রক্ত দেখতে [illegible], তার দেওয়া জলে আমার তৃষ্ণা মিটাতে চাই নে।

শ্বেতাংগ টেগার্ট স্তব্ধ হয়ে যায়; কি অবিমিশ্র ঘৃণা ! মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও জীবনের শেষ তৃষ্ণাকে প্রত্যাখ্যান !

সময় শেষ হয়ে এসেছিল : রাত্রি প্রভাতের সংগে সংগে প্রায় ক্লান্ত রক্তাক্ত শেষ নিশ্বাস নেয় :

মহাবীর চির নিদ্রাভিভূত! ঘুমাও বীর, ঘুমাও! কেউ তোমরা ভাংগিয়ো না ওর ঘুম।

* * *

কলকাতায় ব্যারিষ্টার জে. এন. রায়ের সংগে মিঃ টেগার্টের দেখা: মিঃ রায় বলেন: অনেকে বলে যতীন্দ্রনাথ নাকি মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন আজিও। একথা কি সত্য?

শ্বেতাংগ মাথা নাড়ে:, No! Unfortunately he is dead!

শ্বেতাংগের কণ্ঠও কেঁপে উঠে।

দুর্ভাগ্যের কথা বলছেন কেন?

I had to do my duties but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench. (আমার কর্তব্য করতে হয়েছিল, তাহলেও তার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে! তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন।)

* * *

বালেশ্বর সংগ্রামের বিচার সুরু হলো ইংরাজের আদালতে। শ্বেতাংগের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। আসামী তিন জন: মনোরঞ্জন, নীরেন ও অসুস্থ যতীশ।

১৯১৫, ১৬ই অক্টোবর বিচার প্রহসন শেষ হলো: দেশকে ভালবাসার অপরাধ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অপরাধে (!) মনোরঞ্জন ও নরেনের প্রতি হলো মৃত্যু দণ্ডাদেশ, যতীশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

* * *

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক মনোরঞ্জন। সামনে ঝুলছে কালো চর্বিমাখান দড়ি। ম্যাজিষ্ট্রেট: তোমার কিছু বলবার আছে?

ব্রিটিশের অত্যাচার নিবারণকল্পেই আমরা মৃত্যুপথ-যাত্রী। আমাদের মৃত্যুতে ব্রিটিশের অত্যাচার প্রশমিত হউক!

* * *

যতীশের কথাও মনে আছে: দ্বীপান্তরে তার স্বাস্থ্য ভেংগে যায়, এবং পরে মস্তিষ্কের পীড়ায় পরিণত হয়।

রংপুরের উন্মাদাগারে তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের সংগে সংগে বালেশ্বর সংগ্রামের 'পরে যবনিকাপাত হয়।

দীর্ঘ দিনের অত্যাচার ও নিষ্পেষণে যে আগুন জ্বলেছে, তাকে নির্বাপিত করা কি এতই সহজ! বাংলার বাঘা নেতা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের মাত্র চারজন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবক নিয়ে সরকারের সুশিক্ষিত সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দুঃসাহসিক প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের পর ফিরিংগীরা যেন একেবারে লগুড়াহত কুকুরের মত ক্ষেপে উঠ্‌লো।

তারা স্বপ্নেও হয়ত সেদিন ভাবতে পারেনি, যে জাতকে তারা দীর্ঘ দিন ধরে শত নিয়মের শৃংখলে হাত-পা বেধে একেবারে প্রায় পংগু করে ফেলেছে, তারা আবার কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

আইন দিয়ে যে আগ্নেয় অস্ত্রের সংস্পর্শ হতে পর্যন্ত এদের সরিয়ে রেখেছে, সেই আগ্নেয় অস্ত্রই আবার জোগাড় করে মৃত্যুপণে তাদেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরের সংগ্রাম তাদের চেতনার ভিত্তি-মূলকে পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। সুরক্ষিত প্রাসাদের তলে ঘুণ ধরেছে সাবধান!

সুরু হলো আবার নব নব আইন জারী করে অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে প্রবর্তিত হলো 'ভারত রক্ষা আইন' (Defence of India Act). ঐ আইনের বলেই ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে বহু লোক মাত্র সরকারের সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার হ'য়ে কারারুদ্ধ হলো। হলো দ্বীপান্তরিত। প্রত্যহ ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধানে যখন-তখন যত্র-তত্র পুলিশের আবির্ভাব ও নানা অত্যাচার, আত্মগোপনকারীদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি নিগ্রহ ও জোর জুলুম, যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল।

ফিরিংগী শাসকের অর্থে পরিপুষ্ট ঘরভেদী বিভীষণ ও গুপ্তচরে দেশ যেন ছেয়ে গেছে, পথে-ঘাটে, স্কুলে কলেজে সর্বত্র। ছাত্র, শিক্ষক, রাস্তার মোড়ে পান বিড়িওয়ালা, জংশন ষ্টেসনের হোটেলওয়ালা, ছাত্রাবাসের ম্যানেজার টাকা খেয়ে পুলিসে সংবাদ বেচাকেনা করছে অন্ধ গলিপথে। ১৯১৭ সনে নানা ধরনের অত্যাচার যেন চরমে উঠে।

গুপ্ত বিপ্লবী সংঘের সভ্যরা বাংলার এই গরম আবহাওয়ায় বাংলাদেশ ছেড়ে গোপনে গোপনে গিয়ে আসামের গৌহাটীতে জমা হতে সুরু করেছে। অনুশীলন সমিতির অনেক পলাতক সভ্যও সেখানে এসে জমা হয়েছেন। চরম ব্যর্থতার পর আবার চলছে নিভৃতে শক্তির সাধনা। সংগঠনের কাজ চলতে থাকে আসামের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা জুড়ে।

বিপ্লবীদের কেন্দ্র হয় গৌহাটির দু'টো বাড়ীতে। ব্যবসায় ছুঁতা ধরে সব ব্যবসায়ী হয়ে বসেছে।

স্বহস্তে রান্না, সাধারণ বেশভূষা, সাধারণ শয্যা অতি সাধারণ জীবন-যাত্রা।

উপর্যুপরি ব্যর্থতার আঘাতেও যে ওদের বিচলিত করতে পারেনি, বারবার হতাশ হয়েও যে ওরা তখনও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, এবং সেটাই যে বিপ্লবীর ধর্ম, ভারতে খণ্ডে খণ্ডে ছোটবড় বিপ্লব অভ্যুত্থানই বোধ হয় তার একমাত্র ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দুর্যোগ ও বেদনার ঘন-কালোছায়া সুনিবিড় হয়ে উটে, আর সেই ছায়ায় অস্পষ্ট দেখতে পাই এক মৃত্যুমিছিল: পশ্চাতে যারা পড়ে রইলো তাদের জন্য কোন দুঃখ নেই, কোন অশ্রু মোচন নেই। আত্মদানের মধ্য দিয়েই আজ তারা আত্ম-বিশ্বাসের ভিতটা যেন গড়ে তুলেছে। তাই তারা গেয়ে চলেছে হাজারো নিঃশব্দ কণ্ঠে সেই গান, যুগের স্মৃতি পার হয়ে আজিও যে, গানের সুর ঝংকৃত হয়ে চলেছে:

না হইতে মাগো বোধন তোমার,
ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।
জাগো মা রণচণ্ডী, জাগো মা আমার,
আবার পুজিব তব চরণ তট॥

* * প্রতি রাত্রে তারা পালা করে জেগে একজন করে প্রহরা দেয়, বাকী সব সেই সময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেয়।

কোন সামান্যতম সন্দেহের কিছু ঘটলেই সংকেত দেবে, সবাই সতর্ক হয়ে যাবে। আসামের শীত! হু হু করে শীতের হাওয়া বইছে।

শীতের গভীর রাত্রি: চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম. দলের একটি ছেলে সতীশ পাকড়াশী আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে গুলি ভর্তি একটি মশার পিস্তল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে খোলা জানালা-পথে, অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে বসে আছে: রাত্রির অন্ধকার ঝিঁ ঝিঁর অশান্ত করুণ তাকে পীড়িত হচ্ছে।

পাশেই কম্বল মুড়ি দিয়ে পাঁচ ছয় জন গভীর নিদ্রায় অভিভূত!

কি প্রচণ্ড শীত! যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলে।

নিদ্রাহীন চোখের পাতায় কত চেনা অচেনা মুখ ভেসে ভেসে ওঠে! কত ছোট-খাটো সুখ-দুঃখের কাহিনী হয়ত বা।

পিছনে ফেলে আসা অশ্রু হাসি মেশান দিনগুলো!

বিদ্রোহীর দল আমরা! আনন্দমঠের সন্তান দলের মত বিদ্রোহীর দল! বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনবর্গ—সব ছেড়ে আসা এক অপূর্ব জীবন! কাজ কেবল কাজ! রোদ-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে যায়—শীত গ্রীষ্ম দেহের উপর দিয়ে যায় তবু দিনগুলো কিন্তু স্ফূর্তিতেই কাটে। জীবনে অসাদ নেই, ভয় নাই মরণেও।

ভাবতেও বুঝি ভাল লাগে! কত কালত চলে গেল কালের বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে, তবু যেন শুনি বন্ধুর পার্বত্য পথে বহু অশ্বখুরের খট্ খটা খট্ ধ্বনি: দেখি কালো অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে দলপতি শিবাজী সর্বাগ্রে: পশ্চাতে তার সুশিক্ষিত মাউলি সেনা।

রাজপুতানী রাণী পদ্মিনীর জহরব্রতের লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে দেখি সেই রাজপুত বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুপণ অমর স্বাক্ষর।

মেবারের রুক্ষ প্রান্তরে হলদিঘাটে রাণা প্রতাপের রাজপুত সেনাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি। অসি বেজে চলে ঝন্‌ঝন্!...লড়ছে তারা স্বাধীনতার জন্য, দেশমাতৃকার জন্য।

জননী জন্মভূমি!...

সাত সাগরের ঢেউয়ের কলকল্লোলে শুনতে পাই আর্যনারী দল, জেকোবিন দল, সিনফিন ও নিহিলিষ্টদের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু-সংগ্রামের বার্তা!

তবে আমরাই বা সফল হবো না কেন?

হবে, হবে জয়, নাহি ভয়।

'জয়-যাত্রায় বাহির হয়েছি কতকাল আগে মোরা,
যাত্রা হয়নি শেষ
গিরি-মরু বন কত অগণন একে একে হ'ল ঘোরা
বদল হল যে বেশ,
দূর দিগন্ত পারে, বারে বারে চাই
সেদিনের সাথী সঙ্গীরা সব নাই
বুকভরা আশা ছিল যাহাদের
দেখিবে-নূতন দেশ
দুর্গম পথে চলিতে চলিতে
হল তারা নিঃশেষ।

বুকখানা যেন সহসা কেঁপে কেঁপে উঠে দীর্ঘশ্বাসে: অলক্ষ্যে বুঝি দেশের কবির কণ্ঠে শোনা যায়:

স্বপনে যাহারে দেখেছি আমরা
পাব তার উদ্দেশ
কণ্টক ভেদি' হবেই একদা
কুসুমের উন্মেষ।

হাঁ হবে বৈ কি! কবি তোমায় প্রণাম জানাই!

* * রাতের প্রহরী হঠাৎ যেন চমকে উঠে: অকস্মাৎ একটা লোক দ্রুতগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে গেল না? চকিতে সামান্য ক্ষণের জন্য যেন একটা আলোর মৃদু ইসারা জানালার উপর দিয়ে সরে গেল।

চাপা সতর্ক পায়ে সতীশ জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে।

আরো একটা ছায়া মূর্তি চলে গেল, তার পিছনে আরো একটা।

এত শীতেও শরীরের রক্ত যেন তপ্ত হয়ে উঠে: চোখের পলক পড়ে না: অন্ধকারে শয়তানের। ছায়া মূর্তি ওৎ পেতে আছে ক্ষুধিত নেকড়ের মত এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে: আসছে এগিয়ে নিঃশব্দে ধারালো নখ বিস্তার করে: উঠুন, আপনারা, পর পর তিনটে লোককে দেখলাম, সন্দেহ জনক ভাবে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে, সতীশ বলে।

একজন প্রশ্ন করে: স্বপ্ন দেখনি ত!

হাঁ, স্বপ্নই বটে।

তবু সকলে যে যার আগ্নেয় অস্ত্র মুষ্টিবদ্ধ করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে।

শীতের রাত্রি নিঃশেষিত প্রায়: পূর্ব তোরণে আলোর ইসারা অস্পষ্ট কুহেলিকাজালকে ছিন্ন করেছে: সূর্য-সারথির আসার সময় হলো বুঝি: সপ্ত অশ্বের হ্রেষারব।

জাগ অমৃতের পুত্র, কে কোথায় আছো, আজিকার এই রাঙা প্রভাতকে আহ্বান জানাও। দিকে দিকে তোল শুভ-শংখনাদ! বল উদাত্ত মিলিত কণ্ঠে: অমৃতের পুত্র মোরা, অমৃত-সন্ধানী।

কুহেলিকার মায়াজাল ছিন্ন হয়ে গেল, এমন সময় বন্দুকের শব্দ... দুম্ দুম্...!

কারুই আর বুঝতে বাকী থাকে না, অদূরবর্তী বাড়ীটায় যে কয়জন বিপ্লবী

বাস করে এ আক্রমণটা তাদেরই উপর, এবং এ বাড়ীটাও শীঘ্রই পুলিশের লোকেরা আক্রমণ করবে।

ভোরের আলো আরো একটু স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তেই দেখা গেল অসমিয়া বন্দুকধারী পুলিশ বাহিনী বাড়ীটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমাদেরই দেশের পথ আজ তোমাদেরই কাছে রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে ওরা সংগীন উঁচিয়ে। রাজপথে যখন প্রবেশ নিষেধ, অন্যপথ বেছে নিতে হবে: চলার গতি রোধ করে কে?

দুরন্ত বন্যার গতি আসে ওদের চরণে। হাতে গুলিভর্তি পিস্তল, কিন্তু কোন ভয় নেই, একযোগে সকলে বের হয়ে প্রভাতী কুয়াশার অবগুণ্ঠন ঠেলে।

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারবার হে!...লংঘিতে হবে যাত্রীরা হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার বিপ্লবী!

দুম্...দুম...দুড় ম। : পিস্তল গর্জে উঠে: প্রত্যুত্তর দেয় অসমিয়া পুলিশের বন্দুক।

দুলিছে তরুণী। ফুঁসিছে নাগিনী।

উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের মধ্যেই পথ করে বিপ্লবীরা কামাখ্যা পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়।

জংগলাকীর্ণ পাহাড়: ঘরছাড়া বিপ্লবীর দল সব সেখানে এসে মিলিত হয়। ক্রমে সূর্য মাথার 'পরে উঠে: অগ্নতপ্ত রৌদ্রে আকাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে।

আহার্য নেই, নেই তৃষ্ণার জল। পাহাড়ের চতুষ্পার্শে ঘিরে ফেলেছে ফিরিংগীর বন্দুকধারী পুলিশ বাহিনী।

শুধু তাই নয়, ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ধারে, গৌহাটি, আমীনগাঁও, কামাখ্যা, পাণ্ডুঘাট রেলষ্টেশনেও সশস্ত্র পুলিশ শিকারী কুকুরের মত ওৎ পেতে আছে।

এত করেও কয়েকজন বিপ্লীর গতি ওরা রোধ করতে পারে না।

রোদ পড়ে আসে: বেলা শেষের ম্লান আলোয় পৃথিবী ম্লান হয়ে এল। ইতিমধ্যে একজন গিয়ে কিছু খাবার সংগ্রহ করে এনেছে। ক্ষুধার্তের দল, সবে আহার্য মুখের সামনে তুলতে যাবে, অকস্মাৎ দুম্ দুম্ দুড়্ ম...বন্দুকের আওয়াজ।

ওরা চেয়ে দেখলে, পাহাড়ের নীচে পশ্চিম দিকে অসংখ্য বন্দুকধারী পুলিশ: পরন্ত রোদের রাঙা আলোয় বেয়োনেটগুলো যেন মৃত্যুঝিলিক হানছে: সর্প জিহ্বা হিল্ হিল্ করছে। Ready! প্রস্তুত! সেনাপতির আদেশ ধ্বনিত হয়।

পড়ে রইলো ক্ষুধার আহার, বীর সৈনিকের দল উঠে দাঁড়ায় যে যার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞায়।

প্রথমে ওরা পাহাড়ের উপর হ'তে ঢিল পাট্‌কেল নীচে এদের দিকে ছুঁড়তে সুরু করে: নীচ হ'তে প্রত্যুত্তর আসে বন্দুকের ঘন গর্জনে: দুম্‌···দুম্‌!··· দুড়ুম! সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ছায়া ফেলছে: ঘন কালো।

নীচ হ'তে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসে: এই অবসরে নিঃশব্দে ওরা উপত্যকায় নেমে এসে আবার উপরে উঠ্‌তে সুরু করল।

দূর, অনেক দূরের পথ! দুর্গম পথ! কণ্টক ভেদি হবে কুসুমের উন্মেষ!

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন।

উন্মুক্ত প্রকৃতি! দুর্দান্ত শীতে পাহাড়ের জংগলে নিদ্রাহীন দ্বিতীয় রাত্রি প্রভাত হলো।

ক্রমে বেলা বাড়তে থাকে, গত কালকের সঞ্চিত শেষ খাদ্যাংশটুকুও শেষ হয়ে যায়। পাহাড়ের ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মিটায়।

এমন সময় অকস্মাৎ নতুন পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাব! সুরু হলো গুলিবর্ষণ।

এরাও প্রত্যুত্তর জানায় পিস্তল মুখে। কিন্তু ব্যবধান বেশী, এদের গুলি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছায় না। এরা নীচে উপত্যকায়, পুলিশবাহিনী পাহাড়ের শীর্ষ দেশে।

ক্রমে গুলি বর্ষণ করতে করতে সশস্ত্র পুলিশের দল নীচে এদের দিকে অগ্রসর হয়ে আসে। Hands up! Surrender! আত্মসমর্পণ করো!

বিপ্লবীদের গুলি প্রায় নিঃশেষ দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধ'রে আজ ও গতকাল দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করে।

এতক্ষণ এদের গুলির মুখে পুলিশের দল অগ্রসর হ'তে সাহস পায়নি, কিন্তু এখন ওরা টের পেয়ে গেছে: এদের গোলাগুলি ফুরিয়ে এসেছে।

সম্মুখ-সমর: গুলি নেই, কিন্তু আছে এখনো দেহে শক্তি!

শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি সুরু হয়।

* * * একে একে সকলেই লৌহ বলয়ে বাধা পড়ে।

কিন্তু এই ফাঁকেই দু'জনে কখন চলে গেছে ছুটে নাগালের বাইরে। শিকারী কুকুরের দল ছুটলো তাদের অনুসন্ধানে,: কিন্তু পারলে না ধরতে।

কে সেই দু'টি দুঃসাহসী তরুণ। নলিনী বাকচী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, জংগলের শীর্ষে শীর্ষে ধূসর আবহাওয়া।

ওরা দু'জনে ছুটছে সেই ঘনায়মান অস্পষ্ট আঁধারে দুর্ভেদ্য জংগলের মধ্য

দিয়ে : কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত চরণ, দু'দিনের অনাহার, অনিদ্রা, ক্লান্তি ও অবসন্নতা, তবু ভ্রুক্ষেপ নেই, ছুটছেই ছুটছে!

ক্রমে রাতের অন্ধকারে সব কালো হয়ে এলো : বন্যপশুর সতর্ক পদসঞ্চার খস্‌খস্‌ শব্দ তোলে শীতের ঝরা পাতার 'পরে : শীতের বন্য হাওয়া। ক্লান্তিতে চরণের গতি শিথিল হয়ে আসে। বিশ্রাম!

গৃহে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা নয়, মাথার 'পরে কোন আচ্ছাদন নয় : তারকাখচিত চন্দ্রাতপ তলে, শিশির-ঝরা অনাবৃত রজনীর অন্ধকারে : বন্য হিংস্র পশুর নখরের তলে, শুষ্ক পত্র-কণ্টক শয্যায় ওরা গা এলিয়ে দিল।

এসো নিদ্রা : দু'চোখের পাতায় সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে যাও। রূপ-কথার পরীকন্যা চামর দোলাও! আমরা ঘুমাই!

ধরিত্রী মায়ের লক্ষ হাতে স্নেহের পরশ। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

কণ্টক-ক্ষত দেহ ও পদযুগল, রক্ত চুইয়ে পড়ে।

ভোর বেলা নিদ্রা ভাংগতেই আবার চলা সুরু।

দূরে আরো দূরে, ফিরিংগীর লৌহ-বলয়ের সীমানার বাইরে যেতে হবে।

এগিয়ে চল বীর! এগিয়ে চল!

সামনেই একটা ছোট্ট পল্লীগ্রাম দেখা যাচ্ছে না! হাঁ তাইত!

নিজেদের অসমিয়া বলে পরিচয় দিয়ে সামান্য গুড় ও চিড়া ওরা সংগ্রহ করে। তাই দিয়ে নিদারুণ ক্ষুধার কিছুটা উপশম করে।

সোজা পথে নয়, পাহাড়ী জংগলের পথ ধরেই আবার ওরা হাঁটা সুরু করে।

রাত্রে আবার পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

বিশ্বের ঘরের দুয়ার রুদ্ধ বলেই কি প্রকৃতি আজ জংগলের দুয়ার খুলে দিল ওদের সম্মুখে!

আরো একটা দিন কেটে গেল : চলেছে দু'জনে চলেছেই : সম্মুখে পথ, পায়ে চলার গতি অবিরাম, বিশ্রামহীন, অফুরন্ত সামনে...আরো সামনে।

একটা দু'টা করে পাঁচ পাঁচটা দিন কেটে গেল।

শেষে এক রেলষ্টেশনে পৌছে লামডিংয়ের টিকিট কেটে দুই যাত্রী ট্রেণে উঠে বসল।

ল্যামডিং থেকে শ্রীহট্ট, সেখান হ'তে গৌহাটিকে পশ্চাতে ফেলে বিহারের পথে। কিন্তু প্রবোধ বিহার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে না : ধরা পড়ল বাংলা দেশেই।

অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢাকা কলতাবাজারের এক বাসায় এসে এক রাত্রি শেষে পুলিশের সংগে সম্মুখযুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দেয়।

আহত মৃত্যুপথ-যাত্রী নলিনীর শেষ কথা একটি পুলিশকে : আমাকে বিরক্ত করবেন না। শান্তিতে মরতে দিন্! Let me die peacefully!

এই শহীদের মৃত্যুর সংগে সংগেই দীর্ঘ দশবৎসর ধরে ভারতে বিপ্লব-সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে যবনিকা পাত হলো। বালেশ্বর ও গৌহাটির স্মৃতিকে পশ্চাতে ফেলে এবারে আমরা আসব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে : ইংরাজ শাসিত ভারতে, নব অত্যাচারের কাহিনীর গোড়ার কথায় ফিরে যাই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে।

* * 'কোমাগাটামারু'র শোচনীয় ব্যর্থতা সব চাইতে বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে পাঞ্জাবেই। বিদেশে যে সব শিখরা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই সংবাদ পেয়ে ভারতে ফিরে আসতে সুরু করে। অবশ্য ধূর্ত শ্বেতাংগ সরকার এরকম যে একটা কিছু ঘটবে, তা পূর্বাহ্নেই বুঝতে পেরে, ঐ সব বিদেশ প্রত্যাগত শিখরা যাতে ভারতে না প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য এক আইন জারী করে : ফলে বহু শিখ ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সংগে সংগে গ্রেপ্তার হয়।

১৯১৪-১৮ যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে প্রায় আট হাজার শিখ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার শিখকে আইনের জোরে শ্বেতাংগ প্রভুরা কারাগারে প্রেরণ বা অন্তরীণ করে ফেলে। ক্রমে অসন্তোষের ধোঁয়া বিষবাষ্পের মত জমা হতে থাকে। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে সেই প্রধূমিত বহ্নি লেলিহান হ'য়ে উঠে। পাঞ্জাবে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিল।

১৬ই অক্টোবর ফিরোজপুর লুধিয়ানা লাইনের চৌকীমান ষ্টেশন লুণ্ঠিত হলো।

২৭শে নভেম্বর প্রকাশ্যে বিপ্লবীদের সংগে পুলিশ বাহিনীর ফিরোজপুর জিলায় এক সংঘর্ষ হ'য়ে গেল।

এই সব সংঘর্ষে যারা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে ভাই পরমানন্দ, রাসবিহারী বসু, পিংলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আর একজন শিখ বিপ্লবী : কর্তার সিং সারাভা, জনে জনে পাঞ্জাবের সর্বত্র তখন বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন; সেনানীর ছদ্মবেশে সৈন্য শিবিরেও তার গতিবিধি ছিল। কিন্তু সে কথা আগেই বলেছি।

* * *

১৯১৫ঃ ওয়াহাবী আন্দোলনের পর আবার আর একবার ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমানদের অভ্যুত্থানদ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনে পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য চেষ্টা হয়েছিল।

ঐ উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সনে মৌলানা ওবায়েদুল্লা সিন্ধী আরো তিনজন সঙ্গীসহ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে যান।

তাদের ভারত হ'তে চিরতরে ইংরাজকে বিতাড়ন করবার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি কাবুলে উপনীত তুর্ক-জার্মাণ মিশনের সংগে দেখা করে গোপনে পরামর্শ সুরু করেন।

তাদের ঐ পরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার প্রচেষ্টায় হেজাজের তুর্কী সামরিক গভর্ণর গালিব পাশাও গোপনে তাদের সংগে হাত মিলান।

ওবায়েদুল্লা ফিরিংগী শাসনের উচ্ছেদের পর ভারতে যে অস্থায়ী সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে রাষ্ট্রপতি করবেন স্থির করেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ১৯১৪ সনের শেষাশেষি ভারত ত্যাগ করে ইউরোপে যান এবং ইতালী, সুইট্জারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়ান। জেনেভার এলে সেখানে বিখ্যাত গদর বিপ্লবী নেতা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা হয়।

সেখান থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ গেলেন জার্মাণীতে, সেখানে কাইজারের সংগে আলাপের তার সুযোগ ঘটে।

তুর্ক-জার্মাণ মিশনের জার্মাণ সদস্যরা ১৯১৬ সালে আফগানিস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেও, সেই সময় আফগানিস্থানে যে সব ভারতীয় বিপ্লবীরা ছিলেন, তারা বিপ্লবের প্রস্তুতি একইভাবে চালাতে থাকেন, এবং সেই সম্পর্কে বিপ্লবীদের পরস্পরের মধ্যে যে সব চিঠিপত্র চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, সহসা তার কতকগুলো ব্রিটিশদের হাতে কেমন করে না জানি পড়ে গেল।

ঐ চিঠিগুলোর একটা বিশেষত্ব ছিলঃ রেশমীর কাপড়ের টুকরোর গাঁয়ে লেখা হতোঃ তাই সমগ্র আন্দোলনটি রেশমী ষড়যন্ত্র বলে খ্যাত।

১৯১৬ সালের জুন মাসে হঠাৎ ঐ আন্দোলনের মধ্যমণি মক্কার শেরিফ স্বয়ং তুর্কীদের দল ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মত ফিরিংগীদের দলে গিয়ে ভিড়ল। এবং ফলে সমগ্র আন্দোলনটি একটি মাত্র মীরজাফরের হীন বিশ্বাসঘাতকতায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

তুমি আমি ও আরো দশজন শিক্ষা পেয়েছি এবং আমাদের মাষ্টার মশাইরা ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপার অক্ষরে মোটা মোটা বই ছেপে, এবং আমাদের গাঁটের টাকা খরচ করিয়ে সেই সব বই কিনিয়ে, এবং নিয়মিত অধ্যাপন করিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন : দু'টি ভারতের কথা—বৃটিশ ভারত (British India) এবং ভারতীয় ভারত (Indian India)। আরো একটু খুলে বলা যাক্, বৃটিশ ভারত ব্যতীত ভারতবর্ষের আর যে অংশ আছে তা হচ্ছে [illegible] ভারতবর্ষ : অর্থাৎ কিনা সব হ—য—ব—র—ল খেতাবধারী ভারতীয় স্বাধীন (?) রাজাদের রাজ্য। তার ভাবার্থ এই : ওই সব ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যের শাসনকার্যে বৃটিশরাজ কোনই হস্তক্ষেপ করে না! কিন্তু এতটুকুও যাদের বুদ্ধি বা বোধশক্তি আছে, তাদের নিশ্চয়ই বুঝতে এতটুকু কষ্টও হবে না, আসলে ওর ভাবার্থটি কি!…

সবই সেই চিরন্তন পুতুলনাচের ইতিকথা! যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই সব 'ভারতীয় ভারতে'র সম্মানিত অধিবাসীদের একজন নয়, তথাপি 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হই, তখন কাশ্মীরের মহামান্য মহারাজকে 'Son of the soil' অর্থাৎ এই দেশেরই ছেলে বলে ফেলি। অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীতের রক্তাক্ত পাতাগুলো ওল্টালে চোখে পড়ে, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই সত্যেনের জয়গানে মুখরিত রক্তিম ভারতের আকাশ বাতাস। কানাই বৃটিশ রাজসাক্ষীকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন : কিন্তু কই তার জন্য কেউই তাকে Son of the soil বলে সেদিন ক্ষমা করেনি।

বস্তুতঃ এটাই হলো 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। ঐসব তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যসমূহের মহামান্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের (রেসিডেন্ট) সামান্য অংগুলি হেলনে যে সব স্বাধীন রাজন্যবর্গের বুক কেঁপে উঠে থর থর করে, অর্থহীন ভুয়া কতকগুলো আবোল-তাবোল গালভরা ব্রিটিশের দেওয়া খেতাবের লোভে যারা অসংখ্য দরিদ্র অসহায় প্রজার রক্ত শুষে, অর্থ ব্যয় করে, অবসর আলস্যে মেদবৃদ্ধি ও শ্মশ্রুচর্চা করে, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুর কৃপালাভের আশায় ব্রিটিশের সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অজস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়ে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে, যারা একদিন হঠাৎ বেশী খেয়ে মরে যায়, তারা আসলে যে কতদূর স্বাধীন সে কথা তারাও যেমন জানত, আমারাও হয়ত জানতাম বা জেনেও না জানার ভাণ করেছি।

চতুর চক্রী ফিরিংগীর জাত সন্দেহ নেই, নচেৎ মুষ্টিমেয় লোক এসে এই এত বড় একটা মহাদেশের সংখ্যাতীত জনসাধারণের চোখে এমনি করে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে বুকের 'পরে চেপে বসে থাকতে পারত!

একটা কথা তারা স্বীকার করেছে বহু পূর্বেই, এই দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে: যদি আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে কতকগুলো জিলাতে বিভক্ত করতাম, তাহলে আমাদের ভারত সাম্রাজ্য ৫০ বৎসরও টিকতো না। কিন্তু তানা করে কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সৃষ্টি যারা, যাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নেই, আমাদের সাম্রাজ্যেরই যারা কেবল হাতিয়ার, সারা দেশটাকে আমরা দাবিয়ে রেখেছি এবং রাখবোও আমাদের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যতদিন অব্যাহত থাকবে।

এই উক্তি করেছিল লর্ড ক্যানিং এবং ভারতব্যাপী সিপাহী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার 'পরেই সুকঠোর ভিত্তি করে।

মজা এই যে, ঐসব তথাকথিত স্বাধীন রাজসমূহের মালিকদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ আদালত এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কৃপার 'পরে যে নির্ভর করেছে এবং ব্রিটিশ শক্তি আঠার শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের প্রথমাংশের সংগ্রামে এদের সাহায্য না করলে যে এদের অনেকেরই অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেত, এই অবধারিত সত্য কথাটাই হতভাগ্যের দল কোনদিনই বুঝতে পারেনি।

ঐসব সামন্ততান্ত্রিক তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যগুলো সারা ভারতে ছড়িয়ে থেকে চিরদিন নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এক পক্ষে বলতে গেলে ব্রিটিশ সরকারের রক্ষা-কবচ ছিল ত এরাই। শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত পোষা গৃহপালিত দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতময় ছড়িয়ে থাকার দরুনই ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ করে দূর করে দেওয়া কষ্টকর হয়েছে। তবু দেশীয় রাজ্যের প্রজারা চিরদাসত্বই তাদের দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্য বলে মেনে নিতে চায়নি। ইতিহাস চিরদিন একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, ১৮৫৭র বিদ্রোহে যেমন দেশীয় রাজ্যের কিয়দংশ মৃত্যুপণে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার তাদেরই মধ্যে অনেকেই সব চাইতে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এবং ফলতঃ তা-ই সেই বিরাট অভ্যুত্থানের সকল প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দেবার অন্যতম কারণ। অথচ দেশীয় রাজ্যের প্রজারা দারিদ্র্য ও দুঃখের যে মাশুল দিয়েছে তাও ত' নগণ্য নয়।

শ্রীমন্ত নানা, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন নেতারা ১৮৫৭র ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রক্তদান করে অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

মজার ব্যাপার এই যে, হায়দরাবাদের শাসক সিপাহী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই কথাটুকু কেবল ইতিহাসে বেঁচে রইলো। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের তথাকথিত ভদ্রলোক রাজনীতি যখন 'আবেদন-নিবেদনের' পালা শেষ করেনি, দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রজা আন্দোলন তখনই কোন কোন স্থানে জঙ্গীরূপ গ্রহণ করেছে। প্রজা আন্দোলন বলতে আমরা বিশেষ অর্থে যা বুঝি' সেই কথাতেই আসছি। কোন একটি আন্দোলনের পূর্ণ তাৎপর্য সংগ্রহ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেদিনকার প্রজা আন্দোলন, সেটা ছিল সংগ্রহের বা প্রস্তুতির যুগ। যদিও বাইরে থেকে সেই আন্দোলনের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি, কিন্তু সেই আগামী ভবিষ্যৎ রূপেরই বিকাশের জন্য মাল-মশলার সংগ্রহ চলছিল। এবং তারও অনেক পরে দীর্ঘ দিনের ঐ প্রস্তুতি যখন অখণ্ড রূপ একটা ধারণ করতে চলেছে, আমরা তাকে চিনলাম, বললাম প্রজা আন্দোলন।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীই হলো সাম্রাজ্যবাদের চরম বিকাশ মুহূর্ত।

তারপর সুরু হলো ভাংগন! বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে অভিশাপ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বিরোধ তা সুপষ্ট ভাবে ফুটে উঠ্‌তে লাগল সর্বত্র, যার আংশিক রূপ আমরা দেখ্‌লাম ১৯১৪-১৮র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে এবং ঐ যুদ্ধ-বিরতির মাত্র কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতায় তাকেই আবার আমরা আরো প্রকটরূপে প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু তবু বলবো ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আপাত-বিরোধিতাতেই আমাদের একমাত্র উৎফুল্ল হবার কারণ নয়। কারণ একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না, যে জনগণের সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান-আন্দোলনই একমাত্র এ পথের প্রতিশ্রুতি।

ভারতে ব্রিটিশের শান্তশিষ্ট গৃহপালিত মেদবহুল অলস প্রকৃতির হীনবীর্য দেশীয় রাজ্যের তথাকথিত স্বাধীন রাজাদের হতভাগ্য প্রজার দল তখনও নিয়ম-তান্ত্রিক ভাবে সংঘবদ্ধ হ'তে শেখেনি। কিন্তু তাই বলে একান্ত অসহায় ভাবে ভাগ্যের হাতেও নিজেদের সমর্পণ করেনি। এইটাই ছিল সবার বড় কথা।

১৯০৮ সালে ত্রিবাংকুরের বর্তমান রাজবংশ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সুরু হওয়ার পর থেকেই ক্রমে শক্তিশালী (?) হয়ে উঠে। অর্থাৎ পরদেশী, রাজ-শক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে তাদের শক্তির তলে আশ্রয় পায়।

১৯০৮ সালের বিদ্রোহে বিপ্লবী নেতা ভেলু থাম্পি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অকস্মাৎ ত্রিবাংকুরের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালোছায়া ঘন হ'য়ে আসে! সশস্ত্র কৃষাণেরা ভেলু থাম্পির নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদ সহসা আক্রমণ করে অধিকার করে

নেয়। কিন্তু এ বিজয় স্থায়ী হলো না। পরাক্রান্ত ফিরিংগী শক্তির চাপে সোনার পেয়ালা ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। বিদ্রোহ দমিত হলো! ভেলু থাম্পিও বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের যথার্থ ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য, কারণ ভারতে ইতিহাস বলতে যা আমরা পাই, তা হচ্ছে বিদেশী লেখক রচিত সম্পদশালী শাসকের একতরফা ঐশ্বর্যবন্দনা, মনভোলান মাত্র।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে যখন চারিদিকে বিপ্লবের বজ্রবিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে যাচ্ছে, ফিরিংগীরাজ শশব্যস্ত ও তটস্থ হয়ে পড়েছে সেদিনকার সে অভ্যুত্থানের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকেই কণ্ঠ টিপে মারবার জন্য। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বহু আইন জারী করে বহু ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তবু দেখা গেল নির্মম কঠোর দমননীতির ব্যাপক প্রয়োগ সত্বেও আন্দোলন আরো জোরালো ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছে। দিশেহারা সশংকিত ফিরিংগীরাজ তখন বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ এবং উহা সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশে সরকারের হাতে কি কি ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক সেই সম্পর্কে সুপারিশ করবার জন্য ১৯১৭ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ভারত সরকার লণ্ডনস্থ হাইকোর্টের কিংস্‌ চেম্বাস ডিভিশনের জজ মিঃ জাষ্টিস্‌ রাউলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করলে। ঐ কমিটির রিপোর্টই 'রাউলাট' কমিটির রিপোর্ট নামে কুখ্যাত।

১৯১৮, ১৫ই এপ্রিল কমিটি তাদের মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করলে। কমিটি বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমনের জন্য সুপারিশ করে: কোন বক্তি প্রকাশ বা প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ হেফাজতে কোন নিষিদ্ধ (?) কাগজপত্র রাখলে তাকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি লাভের পর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা; জুরী বা এসেসরের সাহায্য ছাড়াও তিনজন জজ নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চের সমক্ষে রাজদ্রোহাত্মক মামলার বিচার; এবং বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাসস্থানের এলাকা নির্দেশ ও পুলিশের নিকট নিয়মিত হাজিরা দানের নির্দেশ দেওয়া যাবে, এবং সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার ও পরোয়ানাসহ খানাতল্লাসও করা যাবে। বন্দীদের কয়েদখানা ছাড়াও অন্যত্র আটক রাখা যাবে প্রভৃতি কতকগুলো নতুন ফাঁদ পাতা হলো।

পাঁচ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রকোপে এতদিন ফিরিংগী শাসকের দল নানাভাবে অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়েও যখন দেখলে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিংগকে নির্বাপিত করতে পারছে না, তখন তারা মনস্থ করে 'ভারত রক্ষা আইনে'র স্থলে এবারে বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে অরাজকতা নাম দিয়ে সকল প্রচেষ্টার মূল উৎপাটনের জন্য রাউলট কমিটির সুপারিশে একটি স্থায়ী ব্যাপক আইনের ফাঁদ পাততে হবে। ঐ কুখ্যাত আইনটি, 'রাউলট আইন' নামে সর্বজনবিদিত।

আসলে ঐ কুখ্যাত আইনের পাশবিক নাগপাশে ফেলে, কয়েকজন মুক্তিযজ্ঞের বীর সৈনিককে নিষ্পেষিত করবার ছলে লক্ষ কোটি ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার মুক্তির আন্দোলনকে খর্ব ও সংকুচিত করবার প্রচেষ্টাই হলো এই আইন প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। প্রভুদের সামান্য মাত্র সন্দেহের প্যাঁচে ফেলে, গ্রেপ্তার, অন্ধ কারাকক্ষে নির্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃংখলা-ভংগকারী বলে ঘোষণা ও সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এই আইনের বিষয়-বস্তু।

পদদলিত জর্জরিত জনগণের কণ্ঠ চিরে আর্তনাদ জাগল: বন্ধ কর এ আইন। এ অন্যায়। এ হ'তে পারে না। চারিদিকে প্রতিবাদ!

কিন্তু খাদ্য খাদক যেখানে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, সেখানে এই ক্ষীণ প্রতিবাদের মূল্য কতটুকু!

বন্যার মুখে স্রোতের তৃণখণ্ডের মতই প্রতিবাদের যা কিছু ভেসে গেল। ব্রিটিশ সিংহের উচ্চহাসির অট্টরোলে চাপা পড়ে গেল শত শত বুভুক্ষিত জর্জরিত অসহায় ভারতবাসীর ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ-কাকুতি!

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ১৯১৯, ১৮ই মার্চ সত্য সত্যই ঐ কুখ্যাত 'রাউলট আইন'টি পাকাপোক্ত ভাবে স্থায়ী জগদ্দল পাথরের মত জনগণের বুকে চাপিয়ে দেওয়া হলো।

প্রতিবাদ জানিয়ে, তদানীন্তন ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল সদস্য পদে ইস্তাফা দিলেন।

ভারতের ঐ সব দুর্যোগের মধ্যে, ভারতের ভাগ্যাকাশে ঠিক ঐ সময় শুকতারার মত একটি আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে এলেন, উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, অহিংসা ও প্রেমের অবতার মহাত্মা গান্ধী। কম্বুকণ্ঠে ১৯১৯ এর ১লা মার্চ তিনি বলেছিলেন : যদি সরকার ঐ কুখ্যাত আইন পাশ করে তা'হলে তার প্রতিবাদে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করবেন।

আইন বিধিবদ্ধ হলো : সত্যাগ্রহী মহাত্মা ৩০শে মার্চ জনগণের এক মিলিত সভায় ঘোষণা করলেন : ৬ই এপ্রিল হবে সর্বত্র 'হরতাল'।

আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবাসী তাঁর এ আহ্বানে সমগ্র প্রাণ দিয়ে সাড়া দিল : হরতাল। সরকার ক্ষেপে উঠ্‌লো : দিল্লী নগরীতে তাদের বন্দুক হ'তে গুলি বর্ষিত হল, অসহযোগী অহিংস সাধকদের 'পরে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত দেশ-মাতৃকার শ্রদ্ধাঞ্জলিকে, রক্ত, আর্তনাদ ও ধোঁয়া-বারুদের পৈশাচিকতায় কণ্ঠ চিপে ধরা হলো।

ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলুকে ৯ই এপ্রিল পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল কারাগারে। অমৃতসহরে হরতাল।

রেলষ্টেশনের দিকে আগত সমবেত জনতার পরে লাঠিয়াল পুলিশের দল লাঠি চালাল। এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে গুলিবর্ষণ করলে দু'দুবার। এত অত্যাচার ও নিষ্ঠুর পীড়ন কার সহ্য হয়, লগুড়াহত পশুর মত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে : বন্যার বাঁধ ভেংগেছে! কলোরোলে উন্মত্ত স্রোতে ছুটে আসছে।

দাউ দাউ করে অসন্তোষের আগুনে সরকারী ব্যাংক ও অফিস পুড়ছে।

পাঞ্জাবের পথের ধূলায় বহুকাল পরে আবার শ্বেতাংগের তপ্ত শোনিত রক্ত-আলিম্পন পড়ে।

পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত সরকার ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করলে : মার্শাল ল।

সহরের সর্বত্র মোতায়েন হলো সশস্ত্র সৈনিক : তাদের পরিচালক ও সহরের শান্তিরক্ষক হলো : জেনারেল ডায়ার।

জেনারেল ডেয়ার।

জেনারেল ডায়ার!

জেনারেল ডায়ার!

(১৯১৪—১৮) র সাম্রাজ্যলোভী পাশ্চাত্য দেশগুলোর হিংসানলে ভারত-

বাসী ধনে প্রাণে রাজার সাহায্য করেছে, আত্মোৎসর্গ করেছে, জানতে ত' কারও সে কথা বাকী ছিল না সেদিন এবং আজিও।

ভারতবাসী সৈন্য দিয়ে রাজাকে তুষ্ট করেছিল: কিন্তু সেই সৈন্য সগ্রংহের ব্যাপারে রাজাকে শ্বেতাংগ রাজপুরুষের দল কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দীন-দুঃখী-দরিদ্র জনসাধরণের প্রতি যে অত্যাচার চালিয়েছিল ইতিহাস তার জবানীতে চিরদিন সাক্ষ্য দেবে।

যে পাঞ্জাব একদা ভারতীয় বহু জাতির মধ্যে শৌর্যে বীর্যে অপরাপর অনেক জাতির শ্রদ্ধা ও আদর্শের গৌরব পেয়েছিল, তাদের সেদিনকার অপমান, বিনাশ ও তাচ্ছিল্যের কথা দুঃখই জানায় মনে আজিও, কিন্তু নিরুপায়।

যুদ্ধ থেমে গেলে ভারতবাসীরা যখন বার বার সরকারের কাছে মিনতি জানাল: তাদের নেতাদের অন্তরীণ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। মিঃ মণ্টেগু প্রচার করলে: সকল সমস্যার শীঘ্রই একটা মিটমাট হবে। শুধু তাই নয়, ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য ভারতবাসীদিগকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনই দেওয়া। ভারতবাসী তখন ভাবছে এবারে 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' সুরু করবে, কিন্তু মিঃ মণ্টেগু ভারতে এসে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং দেশীয় নেতাদের সংগে পরামর্শ করে আনী বেসাণ্টকে মুক্তি দেবে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সমুচিত বিচারও করবে বলে স্থির করে!

জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস জানাল: Declaration of rightsয়ের দাবী তার প্রত্যুত্তর এলো রাউলাট আইন।

সেদিনকার ভারতীয় জনগণের বিক্ষোভের কি ঐ একটি মাত্র কারণই ছিল: না।

অসহায় ভারতবাসীরা ভেবেছিল, যুদ্ধের পর তাদের আথিক অবস্থা একটু হয়ত ভাল হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল যত দিন যাচ্ছে ততই মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে দৈনন্দিনের অতি আবশ্যকীয় জিনিষগুলো ক্রমেই মহার্ঘ হয়ে উঠ্ছে। চারিদিকে 'ধর্মঘট' সুরু হলো।

এদিকে কর্তৃপক্ষ অসহায় প্রজাদের অভিযোগে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে নানা জোর জুলুম সুরু করে দেয়।

ডাক্তার কিচ্‌লুর সেই তীব্র প্রতিবাদ আজিও ভারতবাসী ভোলেনি: We will be even prepared to sacrifice personal over national interest. Be ready te act according to your conscience,

though this may send you to jail or bring an order of internment on you!

আমরা এখন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে দেশের জন্য, জনসাধারণের জন্য আমাদের দেহের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত নিয়োগ করবো।

৯ই এপ্রিল অমৃতসহরে এক উৎসব হয়, ঐ দিন হিন্দু মুসলমানেরা মস্ত এক মিছিল বের করে, অথচ সেই দিনই ডাঃ কিচ্‌লু ও সত্যপালকে শ্বেতাংগ প্রভুরা গ্রেপ্তার করলে।

নেতাদের মুক্তি চাই! উন্মত্ত জনস্রোত চলেছে কমিশনারের বাংলোর দিকে।
সামনেই হলগেট্‌ ব্রীজ: পথ রুখেছে সবাকার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী: হল্ট্‌!
কিন্তু তরংগ রোধিবে কে? ভাংগার দেবতার বাঁশী রুদ্রতালে বাজে ঐ।
চল এগিয়ে চল: মৃত্যুকে নাহি ভয়।
দুম্‌ দুম দুড়ুম! শ্বেতাংগের বন্দুক গর্জে উঠে: সাবধান! মৃত্যু!
রক্তে হলগেট্‌ ব্রীজ ভেসে যায়। কত প্রাণ নিঃশেষ হয়।

একজন শ্বেতাংগ নাকি ঐ দৃশ্য দেখে বলেছিল: **Its a spectacle unknown to Indians in Indian soil!**

আহত ক্ষতবিক্ষতদের আত্মীত স্বজনরাও ছুটে এল: হাসপাতাল থেকে এলো এম্বুলেন্স গাড়ী, আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান হবে।

অসংখ্য আহতদের নিয়ে এম্বুলেন্সগুলো হাসপাতালে এসে প্রবেশ করছে।

ডেপুটি স্থপারিন্‌টেনডেণ্ট্‌ শ্বেতাংগ মিঃ প্লোমার বললে: Go back! ফিরে যাও! কালা আদমীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খোলা হয়নি।

ভারতীয়দের প্রতি সেদিনকার সে দুর্নীতি ও পাশবিকতা দু'একজন শ্বেতাংগকেও বিচলিত করেছিল।

মিঃ বি. জি. হর্ণিমান ত' স্পষ্টই বলেছিল: **The fact is established that however indefensible the conduct of the mob, the disturbances were initially provoked by the stupidity and wanton violence of the authorities.**

জনসাধারণ যতই উত্তেজিত হ'য়ে উঠুক না কেন, তাতেও এমন পৈশাচিকতা ঘটতে পারে না। সরকারের খেয়াল ও নির্বুদ্ধিতার জন্যই সব কিছু দায়ি।

হাঁ, কি বলছিলাম: জেনারেল ডায়ার! ভারতের পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাসে রাজার দেওয়া যত অত্যাচার ও অন্যায়, জুলুম ও

নিশৃংসতা ঘটেছে: জেনারেল ডায়ারের কীর্তি বোধ করি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণতম!

ইংরেজ প্রভু ঘটা করে কলকাতার সদর রাস্তায় আমাদের অন্ধকূপ হত্যার অবিশ্বাস্য দুর্নীতির সাক্ষ্য খাড়া করেছিল এক প্রস্তরস্তম্ভ গড়ে তুলে: অথচ অমৃত-সহরে 'জালিনওয়ালাবাগ' ময়দানে তাদের স্বহস্ত রচিত শত শত নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবণিতার কবরখানা রচনার জন্য বিলাতের সুশিক্ষিত স্বাধীন জনগণ জালিনওয়ালাবাগের কবর রচয়িতা জেনারেল ডায়ারকে পুরস্কারে সম্মানিত করতে এতটুকু সংকোচও বোধ করেনি। এই কি বিলাতী শিক্ষা!

যে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, সমগ্র শ্বেতজাতকে কলংক মুক্ত করতে, প্রয়োজন ছিল জেনারেল ডায়ারের ফাঁসি: সে কিনা পেল পুষ্পমাল্য!

ভারতে রাজ্য চালাবার অজুহাতে ফিরিঙ্গীদের বহু দুষ্কৃতির ও পাপানুষ্ঠানের কথা ভারতবাসীর মনে চিরদিনের জন্য রক্তাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু 'জালিনওয়ালাবাগের' রক্তাক্ত স্মৃতি বুঝি সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।

১৭ই এপ্রিল: ১লা বৈশাখ, হিন্দুদের নব বৎসর।

প্রতিবৎসর ঐদিন বহু দূর পথ হ'তে পল্লীবাসীরা সহরের উৎসবে যোগদান করতে আসে চিরদিন। সেবারেও এসেছে অনেকে। হংসরাজ নামে এক ব্যক্তি চারিদিকে ঘোষণা করে দেয় যে এবারে নববর্ষ উৎসবে অমৃতসহরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন উকিল, কানাইয়ালাল দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন।

সর্বত্র সে সংবাদ ছড়িয়ে যায়: দলে দলে আবালবৃদ্ধবণিতাশিশু, 'জালিনওয়ালাবাগ' ময়দানে এসে জড়ো হয়।

এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রায় ২৩।২৪ হাজার লোক 'জালিনওয়ালাবাগে' এসে উপস্থিত। জালিনওয়ালাবাগ! পাঞ্জাবের তীর্থ! অমৃতসহরের রক্তাক্ত পুণ্যভূমি!

জালিনওয়ালাবাগ, চারিদিকে সুউচ্চ কঠিন প্রাচীর ঘেরা বড় একটা মাঠ।

বাগের মধ্যে মাত্র তিনটি গাছ ও একটি ভগ্ন সমাধি-মন্দির ছাড়া লক্ষ্য করবার আর বিশেষ তেমন কিছুই নেই।

বাগে প্রবেশের একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ এবং তাছাড়া ৪।৫টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক। ঐসব ক্ষুদ্র ফাঁকের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে হয়ত একজন লোক ভিতরে প্রবেশ

করতে পারে। অগণিত নিরীহ জনতাকে 'জালিনওয়ালাবাগের' প্রাচীর বেষ্টিত ময়দানে রেখে আর একবার হংসরাজের খোঁজ নেওয়া যাক।

তখনকার শ্বেতাংগ সরকারের গোপন নথিপত্রের মধ্যে গুপ্তচর হংসরাজের নামটা খুব ভাল করেই লেখা ছিল: শ্বেতাংগ সরকারের দপ্তরে প্রবেশের অনেকগুলো গোপন অন্ধকার গলিপথ ছিল, সেই গলিপথে চলাচল করতো কতকগুলো কুৎসিত শয়তান কুকুর: কয়েক খণ্ড গোমাংসের লোভে কুকুরগুলো পদলেহন করে কৃত কৃতার্থ হতো। রাজ্যের যেখানে যত গোপন তথ্যের প্রয়োজন হ'তো ঐ কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হতো। হংসরাজ ছিল অমনিই একটি। অমৃতসহরের ষড়যন্ত্র মাম্‌লার এপ্রুভার ছিল হংসরাজ।

আসলে হাজার হাজার নিরীহ আবালবৃদ্ধবণিতাশিশুকে ১৩ই এপ্রিল জালিনওয়ালাবাগের ময়দানে সমবেত করাটা হংসরাজেরই একটা চক্রান্ত। কানাইয়ালাল ক্ষুণাক্ষরেও জানতেন না যে তাঁকে সভাপতি হতে হবে বা বক্তৃতা দিতে হবে। সভার কাজ আরম্ভ হলো: ভোঁ...ও...ভোঁ একটা একটা ক্রুদ্ধ শব্দ শোনা গেল মাথার উপরে, জনতা মাথা তুলে দেখ্‌লো একখানা উড়ো জাহাজ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

গেঁয়ো জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে, মক্ষিকা-গুঞ্জনের মত একটা অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। শয়তান হংরাজ আশ্বাস দেয়, ভাই সব, ভাবনা নেই তোমরা স্রধু স্থির হ'য়ে থাকো।

আরো দুই শয়তানও সেখানে উপস্থিত ছিল হংসরাজের সংগে, সকলের মধ্যে মৃদু চাপা কণ্ঠে কানাকানি স্নরু হয়। জনতার মধ্যে দেখা দেয় আতংক।

তিন বৎসরের শিশু হ'তে আশি বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সে সভায় এসেছে।

পিতা পুত্রকে নিয়ে, বড় ভাই ছোট ভাইকে নিয়ে, দাদামশাই নাতীকে নিয়ে কত সহস্র লোক যে এসেছে! এমন সময় ঘটলো জেনারেল ডায়ারের আবির্ভাব!

সংগে তার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন খুকরীধারী গুর্খা সৈন্য এবং একটা কামানের গাড়ী!

বেলা তখন পাঁচটা!

বিদায় গোধূলি: পশ্চিমাকাশকে রক্ত রঙিন করে ১৩ই এপ্রিলের সূর্য জানাচ্ছে অস্ত ইংগীত।

১৭৫৭র পলাশী প্রান্তরে যে রক্তোৎসব স্নরু হয়েছিল ফিরিংগীর বন্দুকের

গুলিতে তার কি অবসান নেই : ১৯১৯-য়েও কি সেই রক্ত-নদীর ধারা এমনি করেই বয়ে চলবে উত্তর ভারতের মাটি সিক্ত করে

ধমনীর রক্তস্রোত বন্ধ হ'য়ে যায়, কর্ণ বধির হয়ে যায়, প্রাণ-স্পন্দন যায় থেমে।

বাতাস আর বহে না : পাখীর কলগীতি বন্ধ হ'য়ে গেল, শুধু ভেসে আসে এক অনাগত হাজারো কণ্ঠের মৃত্যু-আর্তনাদ !

একটি মাত্র পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে : ফিরিংগীর অনলবর্ষী কামান।

Fire ! Shoot !

শয়তানের বজ্রকণ্ঠ হুংকার দিয়ে উঠে : চালাও গুলি।

আকাশে কি সেদিন বজ্র ছিল না : পৃথিবী কি কম্পন ভুলে গিয়েছিল :

দুম্ দুম্...দুড়ুম্...দুড়ুম্...দুড়ুম্ !...দুম্ !...

গুলি বৃষ্টি সুরু হয়েছে : কর্ণ বধির।

সহস্র সহস্র, নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার করুণ আর্তনাদে আকাশ ধরণীতল মুহূর্তে কেঁপে উঠে।...

দীর্ঘ দশ মিনিট ধরে অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ চলে : রক্তে, মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদে, ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে জালিনওয়ালাবাগ যেন নরকখানা হয়ে উঠ্‌ল।

একটি গুলি যতক্ষণ ওদের পুঁজিতে ছিল, ওরা থামেনি।

যেদিকে বেশী লোকের ভিড়, কামানের মুখ সেদিকেই ঘুরিয়ে গুলি বর্ষণ চলে।

শ্বেতাংগ মিঃ বি. জি. হর্ণিমান বলেছিল : General Dyer proceeded with an armed force to the Jallenwalla Bagh and opend fire without warning on a large mass meeting of a wholly peaceful character, shooting down in cold blod without a word of warning, two thousands of them lying dead and wounded on the ground.

সেদিনকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একটা তদন্ত নাকি হয়েছিল : এবং তদন্তের সময় শ্বেত রাক্ষস, হিংস্র শয়তান ডায়ার নাকি লর্ড হাণ্টারের নিকট বলেছিল যদি বড় মেসিন কামানগুলো বাগের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার এতটুকু সুবিধাও থাকত তবে সেই বড় মেসিন কামান নিয়ে গিয়ে ঐ কালো নিগ্রোগুলোকে গুলি করে মারতেও আমি সেদিন পশ্চাৎপদ হতাম না।

১৬৫০টি গুলি ডায়ার জনতার 'পরে নির্বিবাদে বর্ষণ করে।

বিলাতের সুধীসমাজ কি জেনারেল ডায়ারকে অভিনন্দন জানাবার সময়

তাদেরই দেশীয় একজন লোক হৃণিমানের উক্তিটুকু শোনেনি, বা ডায়ারের তদন্তভাষণ শোনেনি।

সভ্যতা ও কৃষ্টির গর্ব করে ইংরাজ: ভারতের শাসন ইতিহাসে কি তারা একথাগুলো লিখে রেখেছে কোনদিন! অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ ভারতবাসীকে নাকি ফিরিংগীরা এসে নব চেতনা দিয়েছে, চেতনাই বটে: জুতোর তলায় মাড়িয়ে রক্তবমনের চেতনা। নরপশু জেনারেল ডায়ার গুলি চালিয়ে সগর্বে চলে গেল। আর পশ্চাতে পড়ে রইলো প্রায় দুই হাজার হতাহত আবালবৃদ্ধবণিতা।

'জালিনওয়ালাবাগের' মাটিতে বইছে তপ্ত রক্ত-স্রোত: অসহায় আহতের মৃত্যু-আর্তনাদ।

বহুবার বহু প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমরা ১৭৫৭র পলাশী প্রান্তরের অনুষ্ঠিত মহাপাপের: দিয়েছি বহু প্রাণ দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর ধরে হাসিমুখে। মুঠো মুঠো দিয়েছি রক্তজবার অঞ্জলি।

কিন্তু জালিনওয়ালাবাগে ১৩ই এপ্রিল যেন জাতির মহারক্ত-তর্পণ হলো।

সে ভয়ংকর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বুঝি তুলনা নেই: সে কি নিদারুণ পাশবিকতা। যেদিকে অসহায় জনতা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটে যাচ্ছে, সেদিকেই গুলি ছোটে, যারা সংকীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়ে বাইরে আসতে পেরেছিল তাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি: তাদেরও গুলি করে মারা হয়। যারা রক্তাক্ত আহত হয়ে করুণ আর্তনাদ করছে, মরণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে, তাদের পরে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে গুলি চালাতে সৈন্যেরা দ্বিধাবোধ করেনি এতটুকু। এমনকি, যে হতভাগ্যরা গুলির আঘাতে রক্তস্রাবে হতচৈতন্য, সেই অসহায় হতচৈতন্যদের ধারালো সংগীণের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণান্ত ঘটান হয়।

রাক্ষসের প্রতিমূর্তি জেনারেল ডায়ার ও কয়জন ইংরেজ নাকি বলেছিল: হলগেট ব্রীজে যেদিন উন্মত্ত জনতার পথ রোধ করা হয় এবং গুলি ও লাঠি চালিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় সেদিন ফেরার পথে ওরা কয়েকটি দালান, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, দু'টো ব্যাংক লুট করে, ভারতীয় খৃষ্টানদের গীর্জা আক্রমণ করে, তাতে অগ্নি-সংযোগ করে এবং কয়েকটি শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক মিস্ সেরউড নামে এক ইংরাজ মহিলাকে আক্রমণ ক'রে যথেষ্ট প্রহার ক'রে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়, অবিশ্যি একথাও সত্যি, কিন্তু কেন। তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল বলেই না! তাছাড়া সেদিন শ্বেতাংগের দল ভুলে গেলেও আমরা জানি এবং ভুলিনি, ভারতীয়

কয়জন ভদ্রলোক, রাস্তার পরে মিস্ সেরউডকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলে তাদের কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

ঐ ব্যাপারে শ্বেতাংগ ডায়ার বলেছিল গর্ব করে: for every one European life one thousand Indians would be sacrificed.

এক একজন ফিরিংগীর জীবনের মূল্য ১০০০ হাজার হতভাগ্য ভারতীয় জীবনের তুল্য।

আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলেছে শ্বেতাংগদের মধ্যে: বোমা ফেলে সমস্ত সহরটাকে উড়িয়ে দাও।

একথা দূর দেশান্তর হ'তে আগত সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজ ঠিকই বলেছো। সাগরজলে নাও ভাসিয়ে বণিকের চোরা বেশে এসে সেলাম ঠুকে নজরাণা দিয়ে বাদশাহী হুকুমনামা নিয়েছিলে কিনা, তাই নীচতা, শঠতা, জালিয়াতী ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে আমাদের জন্মভূমিকে অধিকার করে নিয়ে, আমাদেরই শ্রমের ফল, এবং আমাদেরই মুখের ক্ষুধার গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে, আমাদের নিজেদের ঘরবাড়ী ভিটে মাটি, সব উচ্ছেদ করে আজ তোমাদের জীবন আমাদের দেশে মূল্যবান বই কি! আমাদের চাইতেও হাজার গুণে মূল্যবান।

নিশ্চয়ই: for every one European life one thousand Indians would be sacrifieed.

একটি ফিরিংগীর জীবনের মূল্য শোধ করতে হবে হাজার ভারতবাসীর জীবন দিয়ে। ১৯১৯য়ের সমগ্র পাঞ্জাব রক্তাক্ষরে তারই সাক্ষী দেবে চিরকাল।

রক্তাক্ত অমৃতসহরের 'পরে চাঁদ উঠ্ছে: জালিনওয়ালাবাগের কবরখানায় সে চাঁদের আলো পড়েছে কি!

চারিদিকে স্তূপাকার মৃতদেহের রক্তস্রোতে মাটি ভিজে লাল, আহতের শেষ করুণ আর্তনাদ। সেই করুণ আর্তনাদে রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

১৪ই এপ্রিল: কোতোয়ালীতে স্থানীয় অধিবাসী, মিউনিসিপাল কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট ও সওদাগরদের এক সভা বসেছে।

বক্তা স্বয়ং ফিরিংগী প্রতিনিধি ফিরিংগী কমিশনার: তোমরা যুদ্ধ চাও না শান্তি চাও? Of course we are agreed to both! আমরা উভয়েতেই রাজী। গভর্ণমেণ্ট মহাশক্তিশালী। সরকার জার্মান-যুদ্ধে জয়লাভ

করেছে। জেনারেল ডায়ারের হাতে আমি সহরের সমস্ত ভার দিয়েছি, আমার আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই—তার আদেশ মান্য করেই এখন তোমাদের চলতে হবে।

হঠাৎ এমন সময় দেখা গেল, জেনারেল ডায়ার, মিঃ মাইলস্ আইরভিং, রোহিল, প্লোমার সকলে তাদের অন্যান্য সংগীদের নিয়ে সভাস্থলে এসে ঢুকছে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে।

ডায়ার এবারে বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ায়: মৃত্যু চাও না শান্তি চাও? আমাদের হুকুম হরতাল এখুনি বন্ধ করতে হবে। যদি শান্তি চাও ত' দোকান-পাট সব খোল। নতুবা আমরা জানি কেমন করে বন্দুকের গুলিতে দোকান খোলাতে হয়। আমার কাছে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রও যা, এই অমৃতসহরও তাই! বল—যুদ্ধ চাও! Otherwise show me the ring-leaders—the scoundrels! I will shoot them!

নিশ্চয়ইত, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র যা, অমৃতসহরও তাই। এতে আর ভুল কি!

এবারে ফিরিংগী আইরভিংয়ের বক্তৃতা: ইংরাজদের হত্যা করে তোমরা বড় অন্যায় করেছো। এর প্রতিশোধ তোমাদের প্রত্যেকের উপর এবং তোমাদের সন্তানদের 'পরে নেওয়া হবে। 'জালিনওয়ালাবাগের' পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পরও কর্তাদের আক্রোশ তাহলে মেটেনি! মার্শাল ল জারী হয়েছে অমৃতসহরের 'পরে। শুধুই তাই নয়:

১। মিস্ সেরউড্কে যে রাস্তার 'পরে দুর্বৃত্তরা প্রহার করেছিল, ফিরিংগী কর্তারা বিশেষ করে সেই স্থানটিই 'এ্যারেনার' মত বেছে নিল, তাদের মতে যারা অপরাধী তাদের সেখানে এনে প্রকাশ্যে পৈশাচিকভাবে বেত্রাঘাত করবার জন্য। যারা সেখান দিয়ে যাতায়াত করবে তাদের বুকে হেঁটে পশুর মত যেতে হবে।

২। প্রত্যেক ভারতবাসীকেই ফিরিংগী কর্তাদের ইচ্ছা ও খেয়ালানুযায়ী কায়দায় সেলাম ঠুকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৩। সামান্যতম কারণেও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হতো।

৪। আইন ব্যবসায়ীদের জোর করে স্পেশাল কনেষ্টবলের কাজ দেওয়া হলো এবং তাদের টেনে এনে রাস্তায় কুলীর মত খাটান হতো।

৫। যেখানে খুশী সেখানে যাকে তাকে সামান্যতম সন্দেহের বসে আটক করা ও বেত্রাঘাত করা হতো!

সর্বোপরি বিচারের জন্ত একটি স্পেশাল আদালত খোলা হয়েছিল: সেখানে শ্বেতাংগ আইনের দোহাই দিয়ে বিচারের নামে যথেচ্ছ কুৎসিত ও পৈশাচিক অত্যাচার চললো।

একদিন বা দু'দিন নয়, দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ কাল, অসহায় নিরস্ত্র সহরবাসীর 'পরে যে পৈশাচিক অত্যাচার করা হয়েছিল, কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে তার নজির মিলেছে কিনা জানিনা, একমাত্র সুসভ্য ইংরাজের ভারত শাসনের ইতিহাসের পাতায় ছাড়া।

শিয়াল কুকুরেরও চলে ফিরে বেড়াবার, খাবার, ঘেউ ঘেউ শব্দ করবার স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ—ভারতীয়দের তাও ছিল না সেদিন।

ফিরিংগীরাত বলবেই না, এবং আমাদেরও সেদিন কণ্ঠ টিপে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আজ বলবো। আজ শুনতে হবে সবাইকে:

একশত পঞ্চাশ গজ যে সরু প্রায়ান্ধকার সংকীর্ণ একটি গলিপথ, সেই গলি-পথের দু'পাশের অধিবাসীদের কোথায়ও যেতে হলে বুকে হেঁটে যেতে হতো।

লর্ড হাণ্টার যখন জেনারেল ডায়ারকে জিজ্ঞাসা করে: ঐ জায়গার অধি-বাসীদের বাইরে কোথাও যেতে হলে কেন এমন কঠোর আইনে বাধ্য করা হয়?

ডায়ার জবাব দেয়: তারা ত ইচ্ছা করলেই নির্দিষ্ট সময়ের পর বুকে না হেঁটেও যেতে পারত।

ভোর ৬টা হ'তে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কেবল ঐ আইন বলবৎ থাকতো।

কিন্তু শয়তান জেনারেল ডায়ার বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল, ঐ আইনটির সংগে আরো একটি আইনও সে জুড়ে দিতে ভুল করেনি: রাত্রি ১০টার পর কেউ রাস্তায় বের হলে তাকে গুলি করে মারা হবে।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী, সম্মানিত, বালক, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ কাউকেই সেই আইনের কবল হ'তে রেহাই দেওয়া হয়নি।

পঞ্চান্ন বৎসরের এক অন্ধ বৃদ্ধ কাহানচাঁদকে পর্যন্ত বুকে হাঁটতে বাধ্য করা হয়।

তারপর পাশবিক ভাবে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা:—দোষী নির্দোষের কথা নয়, সন্দেহ হয়েছে ব্যাস্! লাগাও বেত!

বেত্রাঘাতের একটি দৃশ্য: ছয়জন বালককে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। সুন্দর সিং তাদের মধ্যে একজন চতুর্থ বেত মারার পরই হতভাগ্য বালক অজ্ঞান হয়ে পড়ে, মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার চৈতন্ত ফিরিয়ে এনে আবার সুরু হয়

বেত্রাঘাত। আবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই ভাবে বার বার অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও ৩০টি বেত্রাঘাত করবার পর পশু-জিঘাংসা শান্ত হয়। হতভাগ্য তখন রক্তাক্ত অচৈতন্য!

সামরিক আইনের প্যাঁচে গ্রেপ্তার যারা হয়, তাদের মধ্যে অনেককেই বন্যপশুর মত ৭ ফুট উঁচু লোহার খাঁচায় তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য যে কোন অত্যাচার, জোর-জবরদস্তী ও জুলুম করতেও তাদের বাধে নি। ঐ সব অত্যাচারেও যে কত নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা নেই।

অমৃতসহর সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট: The massacre in the Jalleanwala Bagh was an act of inhumanity and vengence, unwarranted by anything that then existed or has since transpired; on General Dyer's own showing the introduction of martial law in Amritasar was not justified by any local causes and that its prolongation was a wanton abuse of authority, and its administration unworthy of civilised Government.

শুধুই কি পাঞ্জাবের অমৃতসহর: তার্ণ-তরণ, লাহোর, কাসুর, পত্তি ও খেমকরণ, গুজরানওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, নীজামাবাদ, আকলগড়, রামনগর, হাফিজাবাদ, সাঙ্গলাপাহাড়, মোমান, মানিয়ান্‌ওয়ালা, নওয়ান পিণ্ড, চুহারকাণা, সেখুপুরা, লায়েলপুর, গুজরাট, জালালপুর, জাগুন, মালাকারাল: সর্বত্র সেই পাশবিক অত্যাচারের রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে: রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত করেছে বহু শত অসহায় নিরীহ জনসাধারণকে, ধনে প্রাণে তারা নির্যাতিত হয়েছে।

দু'একটি দৃশ্য শুধু এর মধ্যে তুলে ধরি, চোখের সামনে: **লাহোর:** পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর, 'রাউলট বিলের' প্রতিবাদে যখন সমগ্র ভারতে প্রতিবাদ উঠেছে, সেদিন চুপ করে থাকেনি।

১০ই এপ্রিল লাহোরবাসী শুনতে পেলে গান্ধীজীকে অমৃতসহরে সরকার পক্ষ আসতে দেবে না হুকুমজারী করে বম্বেতে তাঁকে অন্তরীণ করা হয়েছে।

সর্বত্র দেখা দিল হরতাল: সরকার পক্ষ রাগে ফুলতে থাকে।

একদল লোক গান্ধীজীর মুক্তি প্রার্থনা করে, গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ বাধা দেবার চেষ্টা করে, পরে তাতে কৃতকার্য না হয়ে গুলি চালায়।

পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী এই অকারণ গুলির সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ ব্রডওয়েকে অনুরোধ জানান: এমনি করে গুলি চালিয়ে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেবেন না। আমাকে একটু সময় দিন, আমি ওদের বুঝিয়ে ঠিক করবো।

কিন্তু অস্থির-প্রকৃতি শ্বেতাংগ কমিশনার জনতা ফিরে যাওয়ায় দেরী হচ্ছে দেখে আবার আদেশ দেয় গুলি চালাবার।

বহুলোক হতাহত হয়। হরতাল চলছে লাহোরে, শ্বেতাংগরা বললে: বন্ধ কর হরতাল।

পণ্ডিতজী এক সভা ডেকে সহরবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় শ্বেতাংগরা বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে এসে হাজির।

পণ্ডিতজীর অনুরোধে লোকের মন শান্ত হয়ে আসছিল, এবং যখন তারা সভাভংগে বাড়ীর পথে রওনা হয়েছে, তখন হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠে: দুম্... দুম্...দুড়ুম্!...

মৃত ও আহতের আর্তনাদে বাতাস ভরে গেল: বইলো রক্তস্রোত!

৫ই এপ্রিল ১৯১৯ হ'তে ২৯শে মে পর্যন্ত জনসন ছিল লাহোরের শাসনকর্তা।

সে এক আদেশ জারী করে, সন্ধ্যার পর কেউ রাস্তায় বের হলে তাকে গুলি করা হবে। সহরবাসীর লাহোর ছেড়ে কোথায়ও যাওয়া চলবে না।

ভারতবাসী দু'জন পাশাপাশি চললেও নাকি বে-আইনী। ফিরিংগী দেখলে রাস্তা না ছেড়ে দেওয়াটা শান্তিভঙ্গের পরিচায়ক।

সামারি কোর্ট স্থাপন করে নানা অত্যাচার অবাধে চলতে থাকে বিচারের নামে। কেউ অপরাধী সন্দেহ হলে তাকে একটা কাষ্ঠ-ফলকের সংগে দুই হাত ঊর্ধ্বদিকে পৃথক পৃথক ভাবে এবং দুই পা ঐ ভাবে বেঁধে নিদারুণ বেত্রাঘাত করা হতো!

সাধারণ নগরবাসী হ'তে সুরু করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমন কি স্কুলের নাবালকদেরও সে চরম শাস্তি হ'তে রেহাই দেয়নি তারা।

হর্ণিমান বলেছিল: Colonel Johnson showed not only an intensity but a malignant efficiency in devising means for the terrorisation of the population, which if not always as cool-blooded was as ingenious and refined in the cruelty of method as any displayed by his competitors.

ফিরিংগী জনসন যে কেবল মাত্র একজন পাকা লোকই ছিল তা নয়, পরন্তু নিরীহ লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবারও তার অশেষ প্রকার শয়তানী কূটবুদ্ধিও ছিল। তার চেয়ে নিষ্ঠুর ফিরিঙ্গী কর্মচারী তখন আর কেউ ছিল না।

কাসুর ঃ এখানকার নিরীহ অধিবাসীদের ভাগ্য অর্পিত ছিল কর্ণেল ম্যাক্রের ও তার সহকারী ক্যাপ্টেন ডোভেটেন্য়ের 'পরে। তারা এমন ভীষণ অত্যাচার কাসুরে করেছিল যা ভাবতেও শিউরে উঠ্‌তে হয়।

অনেকের অন্তঃপুরে সামরিক আইনের বলে প্রবেশ করে জোর করে খানা-তল্লাসী করেছে, স্ত্রী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষ সকলকে ষ্টেশনে আনিয়ে প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে নির্বসনা করে আকণ্ঠ তৃষ্ণায় একবিন্দু জল পর্যন্ত না দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। স্ত্রীলোকের শ্লীলতা রাজপথের জনসাধারণের চোখের সামনে অপমানে জর্জরিত করে পৈশাচিক অট্টহাসি হেসেছে।

প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করিয়ে নির্বিবাদে দোষী নির্দোষ না বিচার করে ৪৮ জনকে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করেছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর চেষ্টায় শেষপর্যন্ত ঐরূপ অমানুষিক ভাবে নির্দোষদের ফাঁসি দেওয়া বন্ধ হয়।

গুজরানওয়ালা ঃ এখানে নির্বিবাদে পাইকারী হত্যালীলা চলেছে শ্বেতাংগদের নির্দেশে, অথচ প্রথমে শ্বেতাংগরাই, গো-বধ করে ও মসজিদে শূকরের মাংস ছড়িয়ে দিয়ে ধর্মানুরক্ত ভারতবাসীর ধর্মের 'পরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে।

দলে দলে হিন্দু মুসলমান ষ্টেশনের দিকে চলে, ওয়াজিরাবাদের একখানা ট্রেন সে সময় আসে, সেই ট্রেনের একজন যাত্রী ওদের বলে: ১৩ই এপ্রিল ভীষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে অমৃতসহরের জালিনওয়ালাবাগে।

জনতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে: তারা কাঁচা ব্রিজের দিকে ছোটে। পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট্ গুলি ছুড়তে সুরু করল জনতার 'পরে সেই সময়।

ছ'দিন পরে যখন শহর কতকটা শান্ত হয়ে এসেছে, সেখানে এলো কর্নেল ওব্রায়েন। আবার সুরু হলো নতুন করে হত্যা-উৎসব: এরোপ্লেন এনে নির্বিবাদে সহর বাসীর 'পরে বোমা ফেলা চলতে লাগল। কত নিরীহ লোক যে বোমার আঘাতে হতাহত হলো তার সংখ্যা নেই।

মেজর কারবারির কীর্তিও কম নয়। এ তার নিজের মুখেরই সদম্ভ উক্তি: আমি বহুশত মেসিনকামানের গোলা সহরের উপর ছুড়েছি। প্রায় ২০০ শত কৃষককে একটা মাঠের মধ্যে একত্র দেখে আমি বোমা নিক্ষেপ করেছি। যখন

দল ভংগ র'য়ে ওয়া এদিক ওদিক প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তখন ২০০ শত ফিট উপর থেকে তাদের উপর গুলি ছুড়ে ছুড়ে গ্রাম পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কে দোষী, কে নির্দোষ তা বেছে আমি গুলি করিনি। গ্রাম হ'তে ফিরে এসে আমি সহরের সর্বত্র গুলি চালিয়েছি।

এর উপর ছিল সামরিক আইন : আটটার পর কেউ ঘরের বার হলে তাকে তখুনি গুলি করে মারা হতো। সম্রান্তবংশীয় লোকের দ্বারা বাজারের পচা ড্রেন সাফ করিয়ে নেওয়া হয়েছে পর্যন্ত।

ওয়াজিরাবাদ : ১৫ই হরতাল পালন করা হয়, আর ১৬ই দুরাত্মা ওব্রায়েনের সেখানে আবির্ভাব হয়। ১৮ই একটি প্রকাশ্য দরবারে ওব্রায়েনে তার মুখোস খোলে : শোন্ মূর্খ! তোরা বুঝি মনে করিস যে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হ'য়ে গেছে। শোন্ ক্যাপার দল, তোদের মাথা খারাপ হয়েছে, তোদের চিকিৎসার জন্য উত্তম ব্যবস্থা হাজির।

ভাবছি শক্তিগর্বে উন্মাদ কুকুর সত্যি কে হয়েছিল : শ্বেতাংগ ওব্রায়েন না ওয়াজিরাবাদের নিরীহ জনসাধারণ!

ওব্রায়েনের প্রেতাত্মা শূন্যলোকে আজিও ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না জানি না, কিন্তু তার সেই দম্ভোক্তি আজিও কি আমরা কেউ ভুলতে পেরেছি : তোদের জানা আছে যে, গভর্ণমেণ্ট যে কোন লোকের সম্পত্তি ইচ্ছা করলেই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

হাঁ, ১৭৫৭র সুরু হ'তে দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরের ভারতে শ্বেতাংগ প্রজা-পালনের ইতিহাসে ঐ ধরনের বহু কীর্তির সত্যিই যে, অভাব নেই।

: তোদের ঘড় বাড়ী ধূলিসাৎ করে ফেলতে পারে গভর্ণমেণ্ট, বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে, এমন ব্যবস্থাও আছে।

অত্যাচারের পাষাণ রথ ঘর্ ঘর্ শব্দে চলে : লোকের মাথার পাগড়ী খুলে সেটা সেই লোকের গলায় বেঁধে, পাগড়ীর অন্য দিকটা ঘোড়ার জিনের সংগে বেঁধে ঘোড়-দৌড় করান হচ্ছে।

সেলাম করবার সময় রাজপুরুষ বা গোরা সৈন্য, যেই হোক না কেন, সেই সাদা মুখওয়ালা ব্যক্তি যদি সেই সেলাম লক্ষ্য না করে, তবে সেই সেলাম-ওয়ালাকে সাদা মুখওয়ালা ব্যক্তির জুতো চুম্বন করতে হবে।

স্থানীয় লোকদের ব্যবহার্য খাট-তক্তপোষ সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমস্ত নগরবাসীকে থানায় নিয়ে গিয়ে, শিশু, বালক ও গুণ্ডা, শয়তান প্রকৃতির লোকদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী দিইয়ে অমানুষিক উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা করা হয়েছে। ওড্বায়েন বলেছিল : ঐ মূর্খ কালা আদমীগুলোকে নানারূপ শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তারা নূতন শাসকের কর্তৃত্বাধীনে আছে।

মানিয়ান্ওয়ালা : ছোট একটি গ্রাম, রেল ষ্টেশনের খুব কাছে, ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী কতকগুলো লোক অমৃতসহরের ভীষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা লোক পরম্পরায় শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠে : না হওয়াটাই আশ্চর্য !

যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে, সেই উত্তেজিত হবে, ঐ ভয়ংকর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে। যাহোক উত্তেজিত অবস্থায় যদি তারা ষ্টেশন লুঠ করে ও আগুন ধরিয়ে দিয়েই থাকে তার জন্য দায়ি কারা ?

কিন্তু সেই সামান্য অপরাধের যে শাস্তি বিধান ফিরিংগী করলে, তা শুধু অচিন্তনীয়ই নয়, আদিম পৈশাচিক জগতেও বোধ হয় তার জুড়ি মিলে না।

শ্বেতাংগিনী সেরউড্কে একটু প্রহার করা হয়েছিল বলে হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে অমানুষিক কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছিল। তখন কর্তারা বলেছিলেন : আমরা সব সইতে পারি, কিন্তু মেয়েলোকের 'পরে অত্যাচার সইতে পারি না।

সেদিন ত' কেউ জবাব দেবার ছিল না, তাই ওই শ্বেতাংগের মিথ্যা ভাষণের প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি ; কিন্তু আজ !

ফিরিংগীদের হয়ত সেদিন শক্তি মদগর্বে অন্ধ হয়ে জানা ছিল না যে, ভারতের কালা-আদমীরা সত্যিই কোন যুগে কোন কালে আজ পর্যন্ত মায়ের বা বোনের অপমান সহ্য করতে শেখেনি।

তবু যা ঘটেছে তাদের রাজত্বকালে সে তাদেরই রাজ্যপরিচালনার বিষময় পরিবেশে ! ফিরিংগী বসওয়ার্থ স্মিথ্ মানিয়ানওয়ালাতে যে অমানুষিক জঘন্য কাজ করেছিল, তার উদাহরণ হয়ত একমাত্র তিনিই স্বয়ং।

সামান্য একটু বর্ণনা : এক অত্যাচারিতা ভদ্র-মহিলা গুরুদেবীর প্রত্যক্ষ বর্ণনা : একদিন আট বৎসর বয়স হতে সুরু করে বয়স্ক অতি বৃদ্ধ পর্যন্ত নগরের সমস্ত পুরুষকে ডাকবাংলোয় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তার পর আনা হলো ধরে সমস্ত স্ত্রীলোকদের। জোর করে আমাদের লজ্জাভরণ অবগুণ্ঠন খুলে দিলো। লাইন করে আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর আমাদের হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে, আমাদের সর্বাংগে পৈশাচিকভাবে উপর্যুপরি বেত্রাঘাত সুরু করল।

আমাদের মুখে থুতু দিতে লাগল ও অকথ্য কুৎসিৎ নোংরা ভাষার যত প্রকার অশ্রাব্য গালাগালি দিতে সুরু করল।

এ পৈশাচিক নৃশংস কাহিনীর আর কত বর্ণনা দেবো; যে রক্ত-তাণ্ডবের, মৃত্যু-উৎসবের পৃথিবীর ইতিহাসে হয়ত দ্বিতীয় নজির নেই, শ্বেতাংগের ভারত শাসনের ইতিহাসে তাই লেখা হলো চিরদিনের জন্য।

পাঞ্জাবে মোট চারজন ফিরিংগীর প্রাণহানি ও শ্বেতাংগিনী মিস সেরউড্‌কে প্রহার করা ও সামান্য লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মাশুল হলো:

সরকারী রিপোর্ট: ৩,৮০০ জন লোক হতাহত। আহতের সংখ্যা-নির্ণয় দুঃসাধ্য। ৪,০০০ ব্যক্তির 'পরে নির্মম দণ্ড ও অত্যাচার, এ ছাড়াও ৪,৫০,০০ লক্ষ লোককে অকথ্যভাবে বিব্রত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়; এবং যে সব পাষণ্ড পশুর দল এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সহায়তা দান করেছে, তাদের প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়েছে।

জালিনওয়ালাবাগের রক্ত-নদী হ'ত শেষ বিদায় নেওয়ার আগে আর একবার সদ্য হতভাগিনী বিধবা ভদ্রমহিলা রতন দেবীর কথা স্মরণ করছি: প্রত্যক্ষ-দর্শিনী রতন দেবী: যেদিন জালিনওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন আমি বাড়ীর এক কক্ষে শুয়েছিলাম, জালিনওয়ালাবাগ আমার বাড়ীর খুব নিকটে। হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। অনবরত গুলির শব্দ কানে আসতে থাকায় শয্যা হতে উঠে বসলাম। আমার বড় ভাবনা হলো, আমার স্বামী বাগের সভায় গিয়েছেন। আমি তখন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি দুজন স্ত্রীলোককে সংগে নিয়ে বাগে এসে উপস্থিত হলাম। শত শত মৃতদেহ এখানে সেখানে পড়ে আছে। সে দৃশ্য [illegible] জীবনে কখনো ভুলব না। আমার স্বামীর খোঁজ করতে করতে একটা মস্তবড় মৃতদেহের স্তূপে তাঁকে পেলাম। যতদূর গিয়েছিলাম শুধু মৃতেরই স্তূপ দেখতে পেলাম, রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। একটু পরেই লালা সুন্দরদাসের দুই ছেলে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমি স্বামীর মৃত দেহ বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য তাদের একখানা চৌপায়া এনে দিতে বলি। তারা যখন চলে যায় তাদের সংগে যে দুজন স্ত্রীলোক আমার সংগে বাগে এসেছিলেন তাদেরও পাঠিয়ে দিই। তখন রাত্রি প্রায় আটটা, কোন লোককে পর্যন্ত বাইরে চলাচল করতে দেখছি না। কেননা সামরিক আইন জারী হয়েছিল। কে প্রাণ দেওয়ার জন্য রাস্তায় বের হবে? আমি ওদের প্রত্যাগমনের আশায় বিলম্ব করতে লাগলাম ও চিৎকার করে কাঁদতে সুরু করলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় একজন শিখ ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আমি অনুরোধ জানাই: আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ এই রক্তস্রোতের মধ্য হ'তে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে পারি। তিনি সম্মত হলেন, তখন তিনি আমার স্বামীর মাথার দিকটা ধরলেন আর আমি পা দু'খানি ধরে বহন করে কোন রকমে একটা শুষ্ক ভূমির 'পরে এনে আমার স্বামীর মৃতদেহ রাখলাম।

রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য যখন এলো না, তখন আমি উঠে আল্লাওখাত্রার দিকে চললাম, মনে করেছিলাম, যে ঠাকুরদ্বার থেকে কোন ছাত্রকে আমার সাহায্যের জন্য নিয়ে আসব! কতকদূর গিয়েছি, হঠাৎ কে একজন কোন একটা বাড়ীর জানালার নিকট হতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অত রাত্রে আমি একাকী কোথায় যাচ্ছি।

আমার মৃত স্বামীকে বাগ থেকে বহন করে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন লোকের দরকার: জবাব দিলাম।

আমি একজন আহত লোককে শুশ্রূষা করছি, তাছাড়া রাত্রি এখন আটটা বেজে গেছে, এখনত কেউই বাড়ীর বাইরে যাবে না: তিনি বললেন।

আমি আবার অগ্রসর হলাম, কিছুদূর অগ্রসর হ'তে আবার আর একজন লোক আমাকে আগের মত প্রশ্ন করলে। আমি তাকেও পূর্ববৎ বললাম। সেখানেও আমাকে নিরাশ হ'তে হলো। নিরাশ হয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দেখি, এক বৃদ্ধ বসে ধূম পান করছেন। তাঁর কাছে হাত জোড় করে আমার দুঃখের কাহিনী বলার পর তিনি তাঁর পার্শ্বে শায়িত কয়েকজন লোককে বললেন: এই মহিলাটি বিপদে পড়েছেন, একে তোমরা গিয়ে সাহায্য করো।

কিন্তু তারা কেউ কিছুতেই অত রাত্রে আমার সংগে যেতে রাজী হলেন না। বললেন: কে বাবা এত রাত্রে বাইরে বের হ'য়ে গুলি খেয়ে মরবে।

কি আর করা যায়, বিফল-মনোরথ হয়ে আমি আবার বাগে আমার স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলাম।

কুকুর শিয়াল তাড়াবার জন্য হাতে একখানা বংশদণ্ড নিলাম।

অন্ধকার যেন চাপ বেধে বসেছে: একটুও হাওয়া নেই কোথাও।

তিনটি আহত লোককে দেখলাম, মৃত্যু-যন্ত্রণায় তারা ছটফট করছে, একটা মহিষও আহত হ'য়ে মাটির উপর পড়ে ভয়ানক চীৎকার করছে।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হলো।

দেখলাম একটি ১২ বছরের শিশু আহত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মৃত্যুপথের পথিক বালকটি কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে : মা, তুমি আমায় ফেলে যেও না।

না বাবা, আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ ফেলে কোথায়ও যাবো না।

আমার কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী বালকটির মুখখানি যেন আশায় একটু প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। আহা! কার বাছারে! কি সুন্দর মুখখানা!

আমি তাকে আমার গায়ের কাপড়খানি খুলে দিতে চাইলাম, কিন্তু সে শুধু একটু জল চাইলে : একটু জল দাও মা! বড় পিপাসা!

হায়রে অদৃষ্ট! এই মৃত্যুকবরে জল কোথায় পাবো! তার মুখে একটু জল দিতেও পারলাম না।

ক্রমে রাত্রি বেড়ে চলেছে : চারিদিকে স্তূপীকৃত অসংখ্য শবদেহ, মৃত্যুকাতর যন্ত্রণায় চারিদিককার বাতাস যেন বিষিয়ে উঠছে।

রাত্রি দু'টো : একজন আহত জাঠ তার পা'টা উঁচু করে ধরবার জন্য আমাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, দেখলাম হতভাগ্য আহত হ'য়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলে আছে। যেভাবে বলছিল সেইভাবে আমি পা'টা তুলে ধরলাম।

তারপর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আর কারো সংগে আমার দেখা বা কথাবার্তা হয়নি।

ক্রমে ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে : বেলা প্রায় ছয়টার সময় লালা সুন্দর দাস ও তার পুত্ররা চৌপায়া নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো, তাদের সাহায্যে আমার স্বামীর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

সারাটা রাত্রি সেই ভীষণ শশ্মানে কেটে গেল আমার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে।

সে সময় আমার যে কিরূপ অবস্থা হয়েছিল, তা আমি নিজেই বর্ণনা করতে অক্ষম।

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত শবদেহ, কেউ চিৎ কেউ উপুড়, কেউ কাৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। সেই সব মৃতদেহের মধ্যে অসংখ্য অবোধ শিশুর মৃতদেহও ছিল।

সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন এক প্রবল ঝড়ে ওলট-পালট করে রেখে গিয়েছে।

কোথায় সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই—সবাই কাল-নিদ্রায় অভিভূত!

মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শুধু শুনতে পেয়েছি : সমস্তটা রাত্রি আমি কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি।............

'জালিনওয়ালাবাগে'র অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর স্যার মাইকেল ওডায়ার, বড় লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের অনুমতি নিয়ে ১৮০৪ সালের এক জরজীর্ণ আইনের জোরে পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসহরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরানওয়ালা ও অন্যান্য কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে ও ২৪শে এপ্রিল সামরিক আইন জারী করে। মার্শাল ল।

ঐ আইন রেলওয়ে জমি ছাড়া অন্যত্র ১১ই জুন ও এখানেও ২৫শে অগষ্ট পর্যন্ত বহাল থাকে।

এই আইন জারীর প্রতিবাদে তদানীন্তন শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার শংকরণনায়ার পদত্যাগ করলেন।

নিজেদের কুকীর্তি যে বেশী দিন চাপা দেওয়া যাবে না, এ মহাসত্যটী ফিরিংগীরা সেদিন হয়ত খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল, তাই তারা আইনের বলে দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠ রোধ করে। মহামতি সি, এফ, এণ্ড্রুজ পীড়িতের আর্তনাদে স্থির থাকতে না পেরে, পাঞ্জাবে ছুটে গেলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। পণ্ডিত মদনমোহনকে পাঞ্জাব প্রদেশে গমনে বাধা দিল সয়তান সরকার।

দেশের মহাকবি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল, তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে।

মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই শত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি............

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, repealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized Governments, barring some conspicuous exception, recent and remote. Considering that such treatment has baen meted out to a population, dis-

armed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, for less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons.

অথচ মজা এই যে, আমাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে জেনেও দেঁা-আশলা সংবাদপত্রগুলো (যারা আমাদের দেশের লোকের কৃপায় তাদের তহবিল ভরিয়ে তুলেছে) কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের প্রশংসায়ই করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের রক্তক্ষরা বেদনাকে কৌতুক করেই প্রকাশ করেছে, যার ফলে কর্তৃপক্ষ সামান্যতম প্রতীকারের বা বিচারের প্রয়োজনও বোধ করেনি আমাদের আর্ত চিৎকারের।

আমাদের কণ্ঠ ত' রুদ্ধই : -

তাই কবি-হৃদয় মথিত করে শত সহস্র লাঞ্ছিত জর্জরিত নরনারীর আর্ত করুণ কণ্ঠ যেন ভাষান্বিত হয়ে উঠে :

Knowing that our appeals have been in vain and the passion of vengence is building the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting it's physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror.

শ্বেতাংগের দেওয়া একমাত্র সম্মান বিশ্বকবিকে ১৯১৫ : ওরা জুন 'স্যার' উপাধি আজ আর বিজয়-মাল্য নয় : কণ্টক-ক্ষতে হয়ে উঠেছে রুধিরাপ্লুত! [illegible] হয়েছে বিষধর কালনাগ : কণ্ঠকে আজ বেষ্টন করছে বিষের জ্বালায়।

তাই কবি ছিঁড়ে ফেলে দেন, পরদেশীর দেওয়া পুষ্প-মাল্য পরাধীনতার অবিমিশ্র ঘৃণা ও আত্মগ্লানিতে :

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King.

মহাত্মা গান্ধীও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তাঁর 'কাইজার-ই-হিন্দ্' পদবী ত্যাগ করে।

জালিনওয়ালাবাগের নির্মম অত্যুগ্র আঘাত যেন সহসা সমগ্র ভারতের মর্ম-মূলে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মতই সুতীব্রভাবে হানলো দ্বিতীয় আঘাত্ : অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গান্ধীজীর নিকট হ'তে এলো আহ্বান।

শাসক-গোষ্ঠির সকল কিছুর সংগেই অসহযোগের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু এদেশের মহাকবি গান্ধীজীর এ আহ্বান ও নেতি কর্মপন্থাকে যেন ঠিক হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না : Let us forget the Punjab affairs—but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order.

: অপমান ও অন্যায়ের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমরা য়ুরোপকে তাহা ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছি; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আমরা আপনাকেই ক্ষুদ্র করিতেছি। আমরা যেন আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলি, কলহ বা জব্দ করিবার প্রবৃত্তি হইতে ক্ষুদ্রতার দ্বারা ক্ষুদ্রতার জবাব না দিই। আমাদের চরম নৈতিক প্রতিবাদ যখন স্বাভাবিকভাবে অসহযোগ আকারে দেখা দিবে,

তখন ইহা মহিমা-মণ্ডিত হইবে, তখন ইহা সত্য হইবে; কিন্তু ইহা যখন ভিক্ষারই রূপান্তর, তখন ইহা বর্জনীয়।

* * *

এখনো মাঝে মাঝে তাই মাষ্টারের মনে হয়, বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিংগের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবার যে স্বপ্ন তারা, বিপ্লবীরা, দেখেছিল—তাকি শুধুই স্বপ্ন!

সত্যিই কি সেই স্বপ্নের মূলে ছিল না কোন মহাসত্য!

যে অন্তর্বেদনায় একদা তারা আত্মীয়-স্বজন গৃহ ছেড়ে, স্নেহ ভালবাসা মায়ার সকল কিছুর বন্ধন অক্লেশে ছিঁড়ে ফেলে মুক্তি-যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছিল, সে কেবলমাত্র ভাবেরই কী বাষ্পে ঠাসা ফানুস!

তা নয়ত কি! আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে। বিপ্লব-যুগের অগ্নি-সাধক স্থষ্টিধর সান্ন্যাল: আজ কি তার সকল প্রয়োজনের শেষ হয়ে গেল!

কেন অন্তরে আজ তার এই নিঃস্ব রিক্ততা!

এ শুধু আজ নয়, কিছুদিন হ'তেই ঘুরে ফিরে কেবলই যেন এই কথাটাই তার মনে হয়।

সত্যিকারের সেদিন তারা—বিপ্লবীরা, কি চেয়েছিল: কোন্ মহাসত্যের লাগি তারা সেদিন অবহেলে ফিরিংগীদের ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়ে গেল একের পর এক!

তারা—বিপ্লবীরা, জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অসংখ্য সভ্যবৃন্দ ও নেতারা যে এই দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে গেল, সেকি ১৯৪৭য়ের এই স্বাধীনতার জন্যই!

এই কি তাদের চিরপ্রার্থিতবিপ্লবের রূপ?

তবে দেশের লোকের মুখে অন্ন নেই কেন? কেন নেই লজ্জা নিবারণের পরিমিত বস্ত্রখণ্ড, নেই কেন মাথা গুজবার মত সামান্য ঠাঁই? না না, এ ত' তারা চায়নি: তবে!···

* * * *

* * * আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের সর্বত্র জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিচলিত বিক্ষুব্ধ। কাজেই একটা লোক দেখান তদন্ত ছাড়া আর বোধ হয় ফিরিংগীদের দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। হলোও তদন্ত: সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত।

২৫শে মার্চ বেসরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, স্বাক্ষর করলেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল হক্ ও আব্বাস

তাম্রেবজী। দীর্ঘকাল পরে তদন্তে নেমে তারা পাঞ্জাবে তেমন কোন বিদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পাননি। তবে ঐ পাশবিক অত্যাচারের জন্য তারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে লর্ড চেমসফোর্ড, স্যার মাইকেল ও'ডায়ার ও জেনারেল ডায়ার থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে দায়ি করলেন।

সরকারী নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট (যে সমিতি গড়া হয়েছিল অধিকাংশ ফিরিংগীদের নিয়েই) সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে মত প্রকাশ করে অত্যাচারী কর্মচারীদের মৃদু ভৎর্সনা করলেন: ছিঃ! তোমাদের কিন্তু এতটা বোকামী করা উচিত হয়নি। ফলে জনমত ক্রমে অধিকতর তীব্র হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

অতঃপর সাগরপারে হাউস অফ্‌ কমন্সেও ৮ই জুলাই তারিখে পাঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হলো। মহামান্য ভারত-সচিব সুবিখ্যাত মিঃ মণ্টেগু ডায়ারের গুলি চালনার কথা উল্লেখ করে সখেদে বললে: Oh! it is nothing but a grave error of judgment.

ভারতের প্রবাসী ইংরাজ মহিলারা বীরশ্রেষ্ঠ ডায়ারের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে চাঁদা তুলে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিল তাকে।

পরাধীন দেশবাসী সব দেখলে, সব শুনলে: কিন্তু ১৯১৯য়ের এপ্রিলে জেনারেল ডায়ার যে লেলিহ আগুন জেলে ভারতের মাটিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল, তার প্রতিবাদ এলো অগ্নি ঝলকে দীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে, পাঞ্জাবের এক তরুণ কিশোর উধম সিংয়ের হস্তধৃত পিস্তলের মুখে ১৯৩৬ সালে।

জালিনওয়ালাবাগের মাটির তলায় হাজারো দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুত হাহাকারের শেষ রক্ত-তর্পণ হলো ১৯৩৬ সালে উধম সিংয়ের হাতে লণ্ডনে জেনারেল ডায়ারের মৃত্যুতে।

যে রক্তপাত ডায়ার দীর্ঘ আঠার বৎসর আগে সুদূর পাঞ্জাবের মাটিতে করে এসেছিল, তা যে সেদিনও শুকিয়ে যায়নি, মৃত্যু মুহূর্তে হয়ত সেকথা সে জানতে পেরেছিল।

* * *

ভারত কি বিদ্রোহীই রবে চিরদিন!

শান্তির বাণী কি কোন কালেই এখানে উচ্চারিত হবে না।

নীলাঞ্জনের মত বিদ্রোহীদের অদেহী আত্মা কি কোন দিনই তাদের পথ খুঁজে পাবে না।

দু'জনে একসংগে ধরা পড়ে বহরমপুর জেলে গেল : মাষ্টার ও নীলাঞ্জন। গোয়েন্দা শিকারী কুকুরের দল তাদের পিছু পিছু তাড়া করে ফিরছিল। গোয়ালন্দের এক হোটেলে তারা যখন নিশ্চিন্তে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে, অতর্কিতে পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে : প্রতিরোধের সময় পর্যন্ত পায়নি ওরা। তাছাড়া নীলাঞ্জনের পায়ে একটা দগ্‌দগে ঘা হয়ে, পা ফুলে উঠেছে এবং ভীষণ জ্বরে সে তখন আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় ত' ও একপাও চলতে পারবে না। মাষ্টার ইচ্ছা করলে হয়ত পালাতে পারত, কিন্তু নীলাঞ্জনকে ফেলে পালাতে পারেনি, তাই ধরা দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

অনেকগুলো অভিযোগ ছিল ওদের বিরুদ্ধে : বিচারে দু'জনারই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলো। কালাপানি পারে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য ওদের বহরমপুরের বন্দীশালায় এনে রাখা হয়।

কিন্তু এ বন্ধন, এ শৃংখল অসহনীয়।

ভাদ্রের এক ঘনঘোর রাত্রে আকাশ ভেংগে নেমেছে বৃষ্টি।

এই অবসরে জেল থেকে দু'জনে পালায় : মাষ্টার প্রথমে প্রাচীর টপ্‌কে গেল ; নীলাঞ্জন কোন মতে যখন প্রাচীরের 'পরে উঠেছে, রাতজাগা এক প্রহরীর নজরে সে পড়ে গেল। বন্দুক হ'তে অব্যর্থ অগ্নি-ঝলক ছুটে এল দুড়ুম্‌!···

উঃ! একটা মৃদু যন্ত্রণাকাতর শব্দমাত্র শেষবারের মত বৃষ্টিধারার সংগে মিলিয়ে গেল। তারপর একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ।

চারিদিকে সোরগোল জেগেছে তখন : বাজতে সুরু করেছে কয়েদখানার পাগলা ঘন্টি মুহুর্মুহু!

পিছন পানে ফিরে তাকাবার আর সময় নেই। নেই সময়, দু'ফোঁটা অশ্রু বরিষণের বিলাসের।

যে পশ্চাতে রইলো পড়ে, থাক সে! তার কাজ শেষ হয়েছে।

সৃষ্টিধর বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

পাগলা ঘন্টি তখনও বেজে চলেছে, ঢং···ঢং...ঢং!···

তারপর পথে, ঘাটে, মাঠে, প্রান্তরে, জংগলে ঝড়োহাওয়ার মুখে ছিন্ন পাতার মত সৃষ্টিধর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে,—একবারও কি মনে পড়েনি তার সেই নীলাঞ্জনের কথা।

মনে পড়েছে বৈকি : আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ধরা পড়ে, নীলাঞ্জনের কথা। ফাঁসি হ'য়ে গেল একদিন।

বীরের মতই সে ফাঁসির দড়িতে আত্মদান করে গেল।

সে কথা কি আজ বলবার দিন এসেছে!

স্মৃতিধর দিদি হিরণ্ময়ীর শেষ শয্যার পাশে বসে তাই হয়ত ভাবছে আনমনে।

কেন সত্য এসে দিদির অন্ধদৃষ্টি খুলে দিয়ে যায় না!

দিদি হিরণ্ময়ী কাঁদছে। কাঁদুক! উতলা মধ্যাহ্ন বাতাসে বিস্মৃতির দুয়ার আজ আবার খুলে যদি যায় যাক।

মৃত্যুমিছিলের একটি পাশে এসে আমরা সকলে দাঁড়াই অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধার কৃতাঞ্জলিবদ্ধ প্রণতি নিয়ে।

মৃত্যুবাসরে কত কত প্রদীপ জ্বালিয়ে একে একে যারা খোলা দুয়ার দিয়ে চলে গেল, যাদের মাটির কবরে আবার একদিন দেখা দেবে নব অংকুরোদ্গম, স্মৃতির বিস্মরণী পার হ'য়ে সেই সব মৃত্যুহীনদের হাতে হাত মিলিয়ে আজিও আমরা এগিয়ে চলেছি তেমনি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে নবারুণ এক প্রভাতের তীর্থে: যে তীর্থযাত্রার শেষ প্রান্তে তেত্রিশ কোটি আমাদের আশার আনন্দের ভারত স্বপ্নে ও গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে; যার দ্বারদেশে আজিও আমরা পৌছতে পারলাম না। যে স্বপ্ন আজিও সত্য হ'য়ে ধরা দিল না!

বিদ্রোহী ভারত তারই প্রস্তুতি! তারই আগমনী! এবং সেই অনাগতের স্বপ্নেই ভারত চির-বিদ্রোহী!

—(দ্বিতীয় পর্ব শেষ)—

নীহাররঞ্জনের কয়েকখানি বই

চক্রী

উল্কা

পদ্মিনী

অরণ্য

দুঃস্বপ্ন

কালনাগ

কালকূট

সীমান্তছায়া

রঙের টেক্কা

ছিন্নমস্তার খড়্গ

ময়ূরপঙ্খী নাও

যৌবনের পিছল পথে

মাহবার আগে ও পরে

কিশোরদের কয়েকখানা বই

কালো ভ্রমর

মৃত্যুবান

কিরীটির ডাইরী

শ্রেষ্ঠ রহস্য গল্প

নেকড়ের থাবা

কালো পাঞ্জা

ধূমকেতু